তকলি



শ্রীসত্যরঞ্জন সেন

তকলি

কুন্দর বলবন্ত দেওয়ান কর্ত্তৃক হিন্দি ভাষায় লিখিত
পুস্তকের বঙ্গানুবাদ

শ্রীসত্যরঞ্জন সেন কর্ত্তৃক অনুবাদিত

এস্. কে. পালিত এণ্ড কোং
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট—কলিকাতা—১২

মূল্য—চারি টাকা

কলিকাতা এস্. কে. পালিত এণ্ড কোং হইতে প্রকাশিত ও
৫৭।২ কেশব সেন ষ্ট্রীট হইতে নিউ কমলা প্রেসে মুদ্রিত।

ভূমিকা

এই পুস্তক খানি হিন্দিতে লেখা "তকলি" গ্রন্থের অনুবাদ। মূল পুস্তকের সব কথাই ইহাতে রাখা হইয়াছে। তা ছাড়া কিছু নূতন কথাও জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

আশা করি বনিয়াদী স্কুল সমূহের শিক্ষকগণের পক্ষে এই পুস্তক উপযোগী বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীলাবণ্য লতা চন্দ
হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ
বাংলা শাখা

প্রস্তাবনা

আমি কয়েক বৎসর যাবৎ রোজ আধ ঘণ্টা মৌনভাবে তকলি কাটাইবার ব্রত পালন করিয়া আসিতেছি। এই কথা তো আমি একটি বাক্যেই শেষ করিয়া ফেলিলাম, কিন্তু এই ছোট্ট ব্রতটি আমাকে যেকতটা রক্ষা করিয়াছে, তাহা ভাষার সাহায্যে সাহায্যে বর্ণনা করা মুশকিল।

তকলিতে কর্ম যোগ তো আছেই, ইহা আমাকে বিশেষ ভাবে জ্ঞান-যোগ শিক্ষা দিয়াছে। যাঁহারা ছয় সাত বছরের ছোট ছোট ছেলেদের একাগ্রতা সহকারে তকলি কাটিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমার বাক্যের অর্থ ভালো ভাবে বুঝিতে পারিবেন। তকলির মধ্যে আমি গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় মূর্তিমান দেখিতেছি।

"নূতন শিক্ষা পদ্ধতি" তকলিকে জ্ঞান যোগের দৃষ্টিতে দেখে। জ্ঞান এক বস্তু, আর জ্ঞানযোগ আলাদা বস্তু। নয়া শিক্ষা কেবল জ্ঞানেই সন্তুষ্ট হয় না। সে জ্ঞান যোগ চায়। উহার এই উদ্দেশ্যও তকলিই ভালো ভাবে পূর্ণ করিতে পারে। কিন্তু ইহার জন্য শিক্ষকের দরকার। আর এই সমস্ত শিক্ষকদের তকলির জ্ঞান পুরা মাত্রায় থাকা আবশ্যক। এই রকম জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টাই এই পুস্তকে করা হইয়াছে। আশা আছে ইহা শিক্ষকদের উপযোগী হইবে।

পওনার
১৯-৩-৪০ } বিনোদ

তকলি

বিষয়-সূচী

তকলি

প্রথম অধ্যায়

তকলির বিশেষত্ব

কাপড়ের চাহিদা ঃ—

ভারতবর্ষে জন প্রতি বার্ষিক কাপড়ের চাহিদা গড়ে ১২ গজ। ১৯১৭ হইতে ১৯২৩ পর্য্যন্ত সাত বৎসরের চাহিদা হইতে এই গড় নির্ণীত হইয়াছে। এই সাত বৎসরে গড় চাহিদা ছিল বেশীর পক্ষে ১২·৯ গজ এবং কম পক্ষে ১০ গজ এই হিসাবে একজন লোকের এক বছরে ১২ গজ এক মাসে ১ গজ কাপড় প্রয়োজন। কাহারও কাহারও ইহার চাইতে বেশী কাপড়ের প্রয়োজন হয় বটে; কিন্তু একথা মনে রাখা উচিত যে উপরে বর্ণিত হিসাব গড় চাহিদা। (বর্ত্তমান চাহিদা পর্যাপ্ত নয়।) গান্ধীজীর আদর্শ—২০ বর্গ গজ উহাতে সব চাইতে বেশী বস্ত্র ব্যবহারক ধনী, জমিদার হইতে গরীব ভিখারী, বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রী পুরুষ সব লোকের কাপড়ের চাহিদা ধরা হইয়াছে। ঠাণ্ডা দেশের অধিবাসীর কাপড়ের প্রয়োজন আর ভারতের মতো গরম দেশের লোকের কাপড়ের প্রয়োজন কখনো একই রকমের হইতে পারে না। কাজেই নিজেদের জীবন যাত্রা প্রণালী যুগোপযোগী করিয়া বাড়ানোর সময় অন্যদেশের অন্ধ নকল করা ভারতীয়দের পক্ষে সংগত নয়। কাপড়ের ক্রম-বাড়ন্ত চাহিদা আজকালকার সভ্যতার একটি মাপ কাঠি বলিয়া মনে করা হয় বটে, কিন্তু ইহা ঠিক নয়। আমাদের বাপ-দাদারা ভালো খাবার খাইতেন, অথচ আজকালকার হিসাবে কাপড় অনেক কম পরিতেন। বর্তমানে পাল্লা বদল হইয়াছে। লোকে ভালো খাবার খায় না, কিন্তু নিজের দুর্বল দেহ মিহি পোষাকী কাপড়ে ঢাকে। খাওয়া খরচের তুলনায় কাপড়ের জন্য প্রয়োজনের বেশী খরচ করে। আমাদের বাপ-দাদাদের চাল চলন ঠিক ছিল; কারণ, লোকের সকলের আগে চাই

খাওয়া, তার পরে কাপড়। কিন্তু এই খেয়াল না থাকায় আমাদের কত ক্ষতি হইতেছে, তাহা কাহারও আন্দাজ নাই। জরুরী মনে করিয়া এখানে এবিষয়ে কিছুটা আলোচনা করা গেল বটে, কিন্তু যে কথা বলিতে চাই, তাহা এই যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের কাপড়ের প্রয়োজনের পরিমাণ অল্পই এবং অল্প হওয়া উচিত।

আর কেহ এ কথা মানুন আর নাই মানুন, আমরা কিন্তু হিসাবের খাতিরে মানিয়া লইতেছি যে প্রত্যেক ব্যক্তির বছরে ১২ গজ কাপড় প্রয়োজন। মোটামুটি হিসাবে এক বর্গ গজ সাদা-সিধা কাপড়ের জন্য ১২-১৬ নং এর সূতা ৪ ফেটি লাগে। অর্থাৎ ১২ গজের জন্য সূতার প্রয়োজন ৪৮ ফেটি।

কাপড়ের প্রয়োজন মিটানোর কাজে তকলি ঃ—

একজন সাধারণ লোক যদি মন লাগাইয়া প্রত্যহ একনাগাড়ে দেড় মাস কাল কমপক্ষে ২।৩ ঘণ্টা তকলি কাটে, তবে সে না গুটাইয়া এক ঘণ্টায় ২০০ তার সহজেই কাটিতে পারে। সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়সের বালকের সাধারণ দ্রুতি (Speed) ইহার অধিক অর্থাৎ ১০০ তার মনে করিলে কোন ক্ষতি নাই। এই দ্রুতি আয়ত্ব করিতে রোজ ২।৩ ঘণ্টা হিসাবে তাহার প্রায় ৩।৪ মাস লাগিবে। ২০০ তার নিত্যকর্মী লোকের সাধারণ দ্রুতি। প্রতি ঘণ্টায় ২৫০ তারের দ্রুতিতে কাটা লোকের সংখ্যাও কিছু কম নয়। প্রত্যেক ব্যক্তি রোজ গড়ে ৮৫ তার কাটিলে তাহার বৎসরে ১২ গজ কাপড়ের প্রয়োজন মিটিয়া যায়। এই জন্য তাহার এই কাজে প্রত্যহ আধ ঘণ্টা ব্যয়েরও আবশ্যকতা নাই। প্রত্যেক লোকের বৎসরে ২৪ গজ কাপড়ের প্রয়োজন একথা মানিয়া লইলেও সূতা কাটার জন্য রোজ এক ঘণ্টার বেশী সময় সাধারণ দ্রুতির পক্ষেও দেওয়া দরকার হইবে না। ১৯৩৫ এর ১লা ফেব্রুয়ারীর "হরিজন" হইতে "তকলির সামর্থ্য" নামক দুইটি প্রবন্ধ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি তকলি যে কত কাজ দিতে পারে, ইহা হইতে সে কথা ভালো ভাবে বুঝা যাইবে।

"গত পরশ্ব একটি রাষ্ট্রীয় পাঠশালার (তুমসর, মধ্যপ্রান্ত) শিক্ষক গান্ধীজিকে এক জোড়া ধুতি উপহার দিয়াছেন। এই পাঁচগজ কাপড় মহাত্মাজীর জন্মতিথি উপলক্ষে ঐ পাঠশালার বালকদের কাটা সূতায় তৈরী। ছোট ছোট ছেলেরা তকলিতে কতখানি কাজ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে খোঁজ খবর লইবার উদ্দেশ্যে আমি সেই শিক্ষক মহাশয়কে উহাদের কাজের হিসাব

পাঠাইতে বলিয়াছিলাম। তিনি যে উত্তর পাঠাইয়াছেন, তাহাতে অনেক কথা জানা গেল। এই কাজের জন্য তিনটি তকলি এক টানা ২৪ ঘণ্টা চালু রাখা হইয়াছিল। পর পর দুই দুই ঘণ্টা কাজ করিতে পারে, এরূপ তিন তিনটি বালকের ১২টি দল ছিল। মোট ৩৬টি বালক ৭২ ঘণ্টা কাজ করে। ঘণ্টা পিছু গড়ে প্রায় ১৮০ গজ সূতা কাটা হয়। মোট ১৬০০০ গজ সূতা দিয়া পাঁচ গজ কাপড় প্রস্তুত হয়। স্কুলের খাতায় মোট ৫২টি বালকের নাম ছিল, তার মধ্যে ১৫।১৬টি খুব অল্প বয়সের। এই সব ছেলেরা রোজ ৪০ মিনিট সূতা কাটে, কিন্তু ছোট ছোট ছেলেদের সূতা কাপড় বুননের উপযোগী হয় না। সূতা কাটার যে গড় দ্রুতি আজ পর্যন্ত আয়ত্ত হইয়াছে তাহা হইল প্রতি ঘণ্টায় ১৯২ গজ (১৪৪ তার)।

"উল্লিখিত হিসাব হইতে বুঝা যায় যে, প্রতি ঘণ্টায় ১৮০ গজ গড় দ্রুতি, ভালো তকলি কাটুনীর গড় দ্রুতি অপেক্ষা অনেক কম ; তথাপি একটি সামান্য বালক ৭২ ঘণ্টায় ৫ বর্গ গজ কাপড়ের পক্ষে যথেষ্ট সূতা কাটিয়া দিতেছে। অর্থাৎ এই সাধারণ দ্রুতিতেও এক বছরে ২৫ গজ কাপড় তৈরী হইবে। এই ২৫ বর্গ গজ কাপড় কিন্তু ভারতের প্রত্যেক লোকের বার্ষিক গড় চাহিদার প্রায় দ্বিগুণ। এই ভাবে প্রত্যহ কেবল এক ঘণ্টা তকলি চালাইয়া—অথবা এভাবেও বলিতে পারেন যে, তকলি দিয়া খেলিতে খেলিতে—এক একটি বালক বা বালিকা আপন কাপড়ের পক্ষে যথেষ্ট সূতা কাটিতে পারে। আর দ্বিগুণ দ্রুতিলাভ কারীর তো আধ ঘণ্টার বেশী সময় তকলি-কাটার প্রয়োজনই হইবে না। অথচ একজন নিপুণ শিক্ষকের সাহায্যে অনেক বালকই অল্প সময়ের চেষ্টায় ইহার দ্বিগুণ দ্রুতি আয়ত্ব করিতে পারে। ৬।৭ সপ্তাহের আগের "হরিজনে" প্রদত্ত রত্নাগিরি আশ্রমের তকলি কাটার হিসাব হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, শিক্ষকের সাহায্যে কাজ শিক্ষা করা হইলে সূতা কাটার দ্রুতি ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলে। ছয় সপ্তাহের চেষ্টায় একান্ত ধীর কাটুনী ও নিজের আধ ঘণ্টার দ্রুতি ১২০ হইতে ২২৪ গজ পর্যন্ত ও নিপুন কাটুনী ২২০ গজ হইতে ২৪৮ গজ পর্য্যন্ত বাডাইতে পারে। কেবল মনে সঙ্কল্প রাখা চাই, আর কিছু নয়।

কাপড়ের প্রয়োজন পূর্ণ করার পথে, সত্য কথা বলিতে কি সময়ের অভাব ইহার কারণ নয়। এই কাজের জন্য রোজ দুই এক ঘণ্টা দিতে পারা যায় না, এমন অবস্থা হয়তো খুব কমই ঘটে। অভাব শুধু এই খানে যে, আমরা সঙ্কল্পই

করি না। দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যতীত এই সহজ ব্যাপারটাও সাধিত হইতে পারে না।— এ কথাটি ভাল করিয়া মনে রাখা উচিত।

তকলির বৈশিষ্ট্য ঃ—

সূতা কাটার যন্ত্র দুইটি—চরকা ও তকলি। চরকায় কাজ অবশ্য বেশী হয়, কিন্তু উহার যন্ত্রপাতি অনেকটা জটিল। এই ঝঞ্ঝাটের দরুণ উহার কিছু না কিছু বিগড়ানোর ভয় সর্ব্বদাই থাকে। নিপুণ যন্ত্রবিদই উহা বানাইতে পারে, সাধারণ লোকের পক্ষে উহার প্রস্তুতি সম্ভব নয়। চরকার জন্য জায়গাও বেশী দরকার। তাহা ছাড়া উহার মূল্যও বেশী। নিজের কাপড় নিজে বানানোর পক্ষে উহা একান্ত প্রয়োজনীয়ও নয়। তকলিই আমাদের সব সুতার প্রয়োজন মিটাইয়া দিতে পারে। আবার তকলিতে উল্লিখিত অসুবিধা একটাও নাই। উহা খুব সহজ ও সরল। "মাল ছিঁড়ে গেল, টাকু বাঁকা হয়েছে, হাতল ঢিলে হ'ল, ধুরা নড়ে, চাকা কাঁপে, ঘিরী নড়ে, চলে ভারী, শব্দ হয়—" ইত্যাদি ধরণের অসংখ্য ঝঞ্ঝাট চরকার বেলায় দেখা দেয়। কিন্তু তকলিতে এ সমস্ত মোটেই নাই। যে কেহ বাড়ীর জিনিষপত্র দিয়াই নিজের ঘরে বসিয়া সহজে উহা তৈরি করিতে পারে, উহাতে এক পয়সাও খরচের প্রয়োজন হয় না। কিনিতে হইলেও সামান্য মূল্যে উহা মিলিতে পারে। উহা পকেটে করিয়া সঙ্গে লইয়া চলা যায়। কাজেই, পথিকদেরও খুব কাজ দেয়। ঘরে বা বাইরে, স্কুলে বা সভায়, রেলে বা জাহাজে যেখানেই যান, তকলি আপনার সাথী হইবে। উহাতে আপনার অসুবিধার বদলে সুবিধাও আছে। কাজ না থাকায় আপনি অস্বস্তি বোধ করেন তো, তকলি আপনাকে কাজ যোগাইবে, আর সময় না কাটার ক্লান্তি হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া আপনার মনে আনন্দ সঞ্চার করিবে। চরকার চাইতে তকলির আর একটা বিশেষত্ব এই যে, তকলিতে নানা ভাবে সুতা কাটা চলে, কিন্তু চরকায় তাহা সম্ভব নয়। খাড়া হইয়া কাটুন, বসিয়া কাটুন, বাম হাতে কাটুন, আর ডান হাতেই কাটুন, তকলিতে কোন বাধা নাই। আপনি যদি চলিতে চলিতে কাটিতে চান তকলিতে তাহা সম্ভব। আর ইহা কাটুনির পক্ষে, সরল, আড়ম্বরহীন ও সোরগোল শূন্য। তকলি যতখানি আরাম দিতে পারে, ততখানি চরকা দিতে পারে না। ইহা তকলিরই বৈশিষ্ট্য। উহাকে "শুরু" বলিতেই শুরু আর "বন্ধ" বলিতেই বন্ধ করা যায়। উহার জন্য উদ্‌যোগ আয়োজন করা অথবা

কাজের শেষে সমস্ত গুছাইয়া রাখারও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু চরকা কাটার সময় এই ব্যাপারে কিছু কম সময় দিতে হয় না। কেবল মোটাসোটা সূতা কাটার পক্ষেই তকলি উপযোগী, এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। পৃথিবী-খ্যাত ঢাকাই মসলিনের সূতা কাটার কৌশল তকলি ছাড়া আর কোন্ যন্ত্রে আছে? ছুনিয়ার সব চেয়ে মিহি সূতা তকলিতেই কাটা হইয়াছে। এই ভাবে তকলি শ্রেষ্ঠ কারিগরির একতম যন্ত্র। উহা কাটুনী 'তন-মন-ধন'এর উন্নতি বিধান করে। তকলি চালানোর সময় কাটুনীর আপন হাত-পা, আঙ্গুল ইত্যাদি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বশে রাখা প্রয়োজন হয়। ইহার জন্য মস্তিষ্ক এবং সকল স্নায়ুর সামঞ্জস্য রাখিয়া কাজ করা দরকার। সরলতা, সহজত্ব ও স্বল্প মূল্যতা-হেতু ইহা ছেলে-বুড়া, স্ত্রীপুরুষ, ধনী, দরিদ্র ও শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেরই আকাংক্ষিত বস্তু, কারণ সকল লোকেই উহা চালাইতে পারে। এই কারণে ইহা কোটি কোটি লোকের হাতে আসিতে এবং দেশে একটি বিরাট জাতীয় শক্তি উৎপাদন করিতে পারে।

তকলির এই বিশেষত্বের জন্য গান্ধিজী একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"নিজের কাপড় নিজে তৈরি করিয়া লওয়ার বাণী গ্রামে গ্রামে পৌঁছাইবার সংকল্প যাহারা পোষণ করেন, ভারতবর্ষের সে রূপ কর্ম্মীদের নিকট আমি একটি প্রার্থনা জানাইতে চাই—উহারা যেন সূতা কাটার অন্যতম যন্ত্র তকলির কর্ম্ম-ক্ষমতার প্রতি মনোযোগ দেন। হরিজন পত্রিকা কিছুদিন আগে এই বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে খুব চিন্তা করা আবশ্যক। যদি ঠিক ঠিক মতন চালানো যায়, তবে তকলির কর্মশক্তি চরকার মতোই। এই ব্যাপারটা ওয়ার্ধা সত্যাগ্রহাশ্রমের লোকেরা হাতে কলমে পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। যে ব্যক্তি ছুর্বল নয়, অথচ যে কেবল আপন অবসর সময়ই সূতা কাটার জন্য দিতে পারে, আর সূতা কাটার সাহায্যে মজুরি উপার্জ্জন যাহার উদ্দেশ্য নয়। তাহার নিকট তকলি চরকার পুরা কাজই দিতে পারে। এইজন্য প্রত্যেক কর্মী যেন তকলি চালাইবার নূতন পদ্ধতি শিখিয়া লন এবং চরকার তুলনায় তকলিকেই গ্রামে প্রচার করেন। কিন্তু বৃদ্ধ ও ছুর্বল লোকদের জন্য চরকার আবশ্যকতা থাকিবেই। কারণ, চরকা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী লিভার সহযোগে চালিত তকলি। কাজেই, যে ব্যক্তি দৈহিক ছুর্বলতা হেতু ভার তুলিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে লিভারের সাহায্য যেরূপ প্রয়োজন, সেই রূপ যে ব্যক্তি আপন হাতের বলে তকলিতে যথেষ্ট দ্রুতি দিতে পারে না অথবা

হাত উপর নীচে উঠানোর পরিশ্রমে অসমর্থ, তাহার পক্ষে চরকারই উপযোগী।
(হরিজন, ২২শে মার্চ্চ, ১৯৩৮)

সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ঃ—

বহু পুরাতন আমল হইতে তকলি চলিয়া আসিতেছে। মিসর, গ্রীস, উত্তর ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা ও ভারতবর্ষ ইত্যাদি অনেক দেশের পুরানো ইতিহাসে ও সাহিত্যে বিভিন্ন নামে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। বহু পুরাতন আমলের মাটির বাসনের উপর এবং চিত্রে উহা আঁকা দেখা যায়। স্যার জন মার্শালের "মোহেন্ জো দড়ো ও সিন্ধু-সভ্যতা নামক পুস্তকে নিম্নোক্ত কথাগুলি লেখা আছে। "মোহেন্ জো দড়োতে ঘরে ঘরে যে সূতা কাটা প্রচলিত ছিল খননের ফলে আবিষ্কৃত শত শত তকলির চাক্তিতেই সে কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই ভাবে ইহারও প্রমাণ মিলে যে, গরীবদের মতো সূতা কাটার রেওয়াজ স্বচ্ছল গৃহস্থের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল; কারণ, সস্তা খোলাম কুচির বা ঝিনুকের চাকতি যেমন পাওয়া গিয়াছে, তেমনই মূল্যবান্, চিক্কণ, পরিষ্কার ও চমকদার চীনা মাটির চাকতি ও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ঐ পুস্তকেই এ কথাও বলা হইয়াছে যে, "গরম কাপড়ের জন্য পশম ও সাধারণ কাপড়ের জন্য কার্পাস ব্যবহৃত হইত।"

ইহাতে পরিষ্কার অনুমান করা যায় যে, সেই যুগের লোকের পক্ষে তকলিই ছিল কাপড়ের প্রয়োজন মিটানোর একমাত্র যন্ত্র এবং ছোট বড় সকল লোকেই উহা চালাইত। এই জন্যই ইহা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, তকলি সূতা কাটার একটি অত্যন্ত পুরাতন যন্ত্র।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কেম্পানির জন্য ১৮০০ হইতে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ বুকানন রচিত বিবৃতির উপর ভিত্তি করিয়া মার্টিন লিখিত ইংরেজী গ্রন্থ "আর্লি হিষ্ট্রি অব্ ইণ্ডিয়ায় তকলিতে সূতা কাটার উল্লেখ পুনঃ পুনঃ করা হইয়াছে। পূর্ণিয়া সম্পর্কে তিনি স্বীয় গ্রন্থের তৃতীয় ভাগের ৩২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"বড় বড় ঘরের মহিলারা তকলির সাহায্যে মিহি সূতা কাটেন—আর কোন কাজ করেন না। কালীগঞ্জের আশ পাশের স্ত্রীলোকেরা বাঁশের গাঁটের তলার দিকে কাঁচা মাটির গোলার ভার লাগাইয়া সূতা কাটে।"

---

* বাপুজির তকলি যজ্ঞ ও বিনোবাজীর এ সম্পর্কে রচনা বলী দ্রষ্টব্য।

ডাঃ উর (Ure) নিজের পুস্তকে লিখিয়াছেন—"ঢাকায় এরূপ উত্তম স্থতা কাটা ও বোনা হয় যে, উহার সামনে ইউরোপের কেরামতি ফিকা হইয়া যায়। ঢাকার শিল্প কার্য দেখিয়া একজন নিপুণ কারিগর বলিয়া উঠেন—ইংলণ্ডের সব চাইতে মিহি সূতা অপেক্ষা ও সূক্ষ্মতর সূতা তকলি দিয়া কি ভাবে কাটা হয় এবং পরে কোন্ যন্ত্রে উহা বুনা যায়—কিছুই বুঝিতে পারি না।"

পরে আরেক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন—"ঢাকার সব সূতা তকলিতেই কাটা হইত। প্রায় ১০ ইঞ্চি লম্বা, তুরপুণের মতো মোটা মসৃণ ইস্পাতে মিহি সূতার জন্য টাকু তৈরী হইত। নীচের প্রান্ত হইতে প্রায় এক ইঞ্চি উপরে মাটির একটা গুলি উহাতে লাগানো থাকিত। টাকুর তলায় মাথাটি কড়ি বা কাছিমের ডিমের খোসার উপর ঠেকাইয়া একটু তেরচা করিয়া ধরিয়া সূতা কাটা হইত। খোসাটা যেন নড়িতে না পারে, সেই জন্য উহা কাদা-মাটির গোলার উপর বসাইয়া দেওয়া হইত। বুড়া আঙ্গুল ও অন্যান্য আঙ্গুল গুলির মাঝে তকলি ঘুরানো হইত এবং বাম হাতে ধরা তুলা এভাবে উপরে উঠানো হইত যাহাতে ধাগা বাহির হইয়া সূতা তৈরী হইতে থাকে। একজন নিপুণা কাটুনী এই ভাবে এক তোলা ওজনের (১৮০ গ্রেণ) তুলা হইতে চার মাইলেরও অধিক লম্বা সূতা কাটিতে পারিত।"

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের নিউজিয়ামে ঢাকাই স্থাতার একটি নমুনা রক্ষিত আছে। উহার ওজনের সহিত দৈর্ঘ্যের হিসাব—এক পাউণ্ডে ১১৫ মাইল ২ ফার্লঙ্ ৬০ গজ।

ডাঃ টেইলরের নিকট একটি সূতার নমুনা ছিল—উহার দৈর্ঘ্য ২০০ গজ কিন্তু ওজন মাত্র পাঁচ গ্রেণ।

এ পর্য্যন্ত উপরে যে সমস্ত বর্ণনা দেওয়া হইল, তাহা পুরানো আমলের তকলির ইতিবৃত্ত মাত্র। নিম্নে যে বিবরণ দেওয়া হইতেছে, তাহা বর্তমান যুগের ইউরোপ ও আমেরিকার প্রচলিত তকলির কাহিণী।

"ইতালীয় কৃষক-বধুরা নিজেদের অবসর সময়ে এবং শীতের দিনে সন্ধ্যার সময় নিজেদের ঘরে উনানের পাশে বসিয়া সূতা কাটার কাজ করে। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য উহারা এই কাজ করে না, নিজেদের ও নিজেদের আত্মীয় স্বজনের কাপড়ের জন্য উহারা সূতা কাটে।"

"মেশিনের প্রাবল্য সত্বেও অপরাপর বিষয়ের ন্যায় তকলিও আপন পূর্ব গৌরব ফিরিয়া পাইয়াছে।"

"হাঙ্গারীর পাহাড়ে ও উপত্যকায় চারিদিকের মাঠে খালি পায়ে ঘুরিতে ঘুরিতে সেখানকার স্ত্রীলোকেরা তকলি দিয়া সূতা কাটায় এতই মগ্ন হইয়া পড়ে, মনে হয় যেন উহাদের আঙ্গুলের বিশ্রাম কখনো মিলে না।"

"রুমানিয়ার গোয়ালাদের মেয়েরা দুইটি কাজ করে; উহারা বনে গোচারণ কালীন হাতে সূতা কাটায় নিয়োগ করে আর সন্ধ্যাকালে গরুগুলি ঘরে নিয়া আসে। তকলির প্রচার সর্বত্রই বিদ্যমান।

"ঘোড়ায় চড়িয়া পাহাড়ী রাস্তা পার হইতে হইতে গ্রীক কুমারী আপন হাতে তকলিতে সূতা কাটে, এই ধরণের দৃশ্য অন্য জায়গায় কদাচিৎ দেখা যায়। ঘোড়ার গতির উপর তাহার পূর্ণ আস্থা থাকায় এবং ঘোড়াটি উহার ইশারায় চলে বলিয়া সেই গ্রীক কন্যা দ্বিপ্রহের মূল্যবান্ সময় সূতা কাটার কাজে নিযুক্ত থাকে।"

"পেরু দেশের স্ত্রীলোকেরা নিজেদের ছেলে পিলেদের খাওয়ায় বা আপন আপন ভেড়া চরায়, আবার সঙ্গে সঙ্গে সূতা কাটার কাজও করে; উহাদের হাতের তকলি সর্বদাই ঘুরিতে থাকে। তকলির সাহায্যে তাহারা কাঁচা পশমগোলা হইতে মোটা ধাগা কাটে।"

এই সব বর্ণনায় দেখা যায়, ইউরোপ এবং আমেরিকায়ও গ্রাম্য জীবনে তকলি কতখানি প্রীতি ও আদরের স্থান অধিকার করিয়াছে। ঘোড়ায় চড়িয়া পাহাড় ডিঙাইতে ডিঙাইতে তকলিতে সূতা কাটুনী গ্রীক কুমারী, তকলির গুরুত্বের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

তকলি এমন একটি অপরূপ যন্ত্র যাহার সাহায্যে কাজের ও মনের বিশ্রাম উভয়ই এক সাথে ঘটিয়া থাকে। এই সব ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ তকলি সম্পর্কে বলেন—"তকলি দেখিতে ছোট বটে, কিন্তু উহার অন্তর বিশাল শক্তিতে ভরপুর। বাষ্প ও কলের যুগে মানুষ নিজের ছোট ও পুরাতন বস্তুকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে সর্বদা বিবেচ্য বিষয় এই যে, কলকারখানার আবিষ্কারক বড়, না তকলির আবিষ্কারক বড়। এই বিরাট দেশের কোটি কোটি অধিবাসীর কাপড়ের জন্য আবশ্যকীয় সূতা আমরা তকলির সাহায্যে কাটিতে পারি। সমস্ত লোক যদি তকলিতে সূতা কাটা শুরু করে, তবেই উহা একটি আদরের বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই ভাবে বস্ত্রের সমস্যা সমাধান করার সাথে সাথেই আমরা সমাজে একটি নয়া ফ্যাসনও চালু করিতে পারিব। তকলির ইতিহাস বর্ণনার সাথে

সাথে কার্পাস শিল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে জুড়িয়া দিলে, আশা করি, তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ লিখিত কার্পাস শিল্পের অগ্রগতি নামক প্রবন্ধটীও এখানে উদ্ধৃত করা হইল—

কার্পাস শিল্পের অগ্রগতি।

(শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ)

বাঁচিবার জন্য মানুষের তিনটি মৌলিক বস্তুর প্রয়োজন। যথা—খাদ্য, বস্ত্র আর আবাস। প্রথম দুইটি বস্তুর অর্থাৎ খাদ্য ও বস্ত্রের অভাব আজ এমন ভাবে দেখা দিয়াছে যে, তৃতীয় বস্তুর অর্থাৎ আবাসের কথা ভাবিবার অবসর নাই। কার্পাস হইতে বীজ ছড়াইয়া আমরা তুলা পাই, সেই তুলায় সূতা হয় সেই সূতায় আমাদের দৈনান্দিন জীবনের বস্ত্রাভরণ। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই কার্পাস শিল্পের প্রসার ও প্রভাব কত গভীর তাহাই অতি সংক্ষেপে এখানে আলোচনা করা যাইতেছে।

অনেকেই হয়তো জানেন যে, সুদূর অতীতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ দেশেই চরকার জন্ম হইয়ছিল। বাৎসায়ন বলিয়াছেন—কার্পাস বোন, বস্ত্র বয়ন কর। হিন্দুর আদি আইন প্রণেতা মনুর সময়ে খ্রীঃ পূঃ ৮০০।৭০০তে এদেশে কার্পাস শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই সময় হইতে হিসাব করিলেও দেখা যায়, কম পক্ষে আড়াই হাজার বৎসর হাতেকাটা সূতায় তাঁতির তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রাদি এদেশ বাসীর প্রয়োজন মিটাইত। ১৭৮৩ সালে ইংলণ্ডের লাংকাসায়ারে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কার্পাস সূতায় কাপড় তৈরী হয়। বিলাতি বস্ত্র শিল্পীরা বহুকাল কার্পাস সূতায় কাপড়ের টানা দিতে সমর্থ হয় নাই, সে জন্য পূর্বে টানার সূতায় পশম মিশ্রিত করিত। তারপর কলে অর্থাৎ অশ্বশক্তি চালিত কাপড়ের কারখানা প্রতিষ্ঠা হয়, প্রথম ১৮১৫ সালে বোষ্টন সহরে। ইহার নাম ছিল Boston Manufacturing Company. ভারতে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা ও কলের কাপড়ের প্রসার ক্রমশঃ এদেশের প্রাচীন চরকা ও তাঁতশিল্পকে প্রায় লোপ করিয়া দেয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কার্পাস শিল্পের প্রাচীন জন্মভূমি ভারতবর্ষ। এদেশ হইতে এই শিল্প কি করিয়া দেশ দেশান্তরে প্রসার লাভ করিল, সেই ইতিহাস প্রণিধান যোগ্য।

গ্রীকেরা আলোকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের সময় অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৪০০—৩০০ অব্দে প্রথম কার্পাস শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হয়।

খ্রীঃ পূঃ ৩০০—২০০ অব্দে এশিয়া মাইনরের মধ্য দিয়া ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে কার্পাস শিল্পের প্রথম অভিযান হয়।

খ্রীঃ পূঃ ৭০ অব্দে রোমানরা কার্পাসের তাঁবু, সামিয়ানা ইত্যাদি ব্যবহার করিতে শেখে। প্লিনীর রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ঐ সময় ইজিপ্টের উত্তরাঞ্চলে কার্পাসের চাষ হইত এবং কার্পাস স্থতায় একমাত্র পুরোহিতদের বস্ত্রাদি তৈরী হইত।

১০০—২০০ খ্রীঃ অব্দে ইউরোপীয় ভূখণ্ডের এলিস (Elis) নামক স্থানে সর্ব্বপ্রথম কার্পাসের চাষ হয়। কার্পাস স্থতায় মেয়েদের মাথায় কেশ ঢাকিবার জাল প্রস্তুত হইত।

এরিয়ানের (Arrian) বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ২০০—৩০০ খ্রীঃ অব্দে ভারতীয় মসলিন ও ক্যালিকো লোহিত সাগরের তীরবর্তী আরব বন্দর আডুলেতে (Adule) জাহাজে করিয়া চালান দেওয়া হইত।

৬০০—৭০০ খ্রীঃ-এ কার্পাস চাষ প্রথম চীন দেশে প্রবর্ত্তিত হয়। চীনারা তখন শুধু কার্পাসের গাছ ও ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যই ইহার চাষ করিত।

৭৯৫ সালে এক ভগ্ন জাহাজের ভারতীয় নাবিকদের মারফতে কার্পাস প্রথম জাপানের ভূমিতে আশ্রয় লয়। ইহার চাষ কিন্তু বেশী দিন চলে নাই।

৯১২—৯১৬ সালে স্পেনে তৃতীয় আবদুর রহমানের রাজত্বকালে কার্পাস শিল্প প্রবর্তিত হয়। ঐ সময় আরব শাসনাধীন সিসিলি দ্বীপেও কার্পাসের চাষ হইত।

১০৫০ সালে প্রথম কার্পাস হইতে কাগজ তৈরির কৌশল আবিষ্কৃত হয়।

১০৯৬—১২৭০ পর্যন্ত এশিয়া মাইনর ও ইতালীর সহরের মধ্যে কার্পাস শিল্প বস্তুর ব্যবসা চলিয়াছিল।

১২০০—১৩০০ সালের মধ্যে তাতারেরা চীনদেশে কার্পাসের চাষ ও ইহার ব্যবহার প্রণালী প্রচলন করে। সেখান হইতে কার্পাস শিল্প কোরিয়াতে প্রসারিত হয়। একই সময়ে কার্পাসের কথা সর্বপ্রথম ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্যে স্থান পায়। কার্পাস তখন ইংলণ্ডে মোমবাতির শলিতার আর ফরাসী দেশে টুপির জন্য ব্যবহৃত হইত।

বারসেলোনা সেই সময়ে কার্পাস শিল্পের কেন্দ্ররূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সেখানে বিশেষভাবে জাহাজের পাল ও টুইল জাতীয় কাপড়ই তৈরী হইত।

১৩২০ সালে মধ্য ও উত্তর ইউরোপের উলম্ (ulm) নামক স্থানে সর্বপ্রথম তুলার স্থতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন শিল্প প্রবতিত হয়।

১৩৫০—১৪০০ সালে অটোমান তুর্কের অভিযানের ফলে বলকান দেশ সমূহে কার্পাসশিল্প প্রবর্তিত হয়।

কার্পাস গাছ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তখনও ইংলাণ্ডবাসীদের ছিল না। পূর্বদেশ ভ্রমণকারীরা তখন কার্পাস গাছের যে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিতান্তই কাল্পনিক ও রহস্যজনক।

"In Tartary, there grew a wondrous tree, the buds of which burst when ripe and exposed to view tiny lambs, the fleece of which gave a white wool which could be spun and woven into cloth."

অর্থাৎ তাতারে এক প্রকার অদ্ভুত গাছ জন্মে, ইহার ফল পাকিলে ফাটিয়া যায় এবং ইহাতে ছোট ছোট মেষ দেখা দেয়। তাহাদের সাদা লোমে স্থতা ও কাপড় হয়।" *

কোন কোন লেখক উপরোক্ত বর্ণনাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে গাছের আগায় একটি মেষই ঝুলিত, গাছের ডগা নরম থাকায় মেষটি প্রয়োজন মত মুখ বাড়াইয়া ঘাস খাইতে পারিত। তারপর গাছ ও মেষ দুই-ই মরিয়া যাইত। কাল্পনিক কার্পাস গাছের চিত্র 'যোয়ান্নেস খান' নামক তখনকার এক আর্টিষ্ট আঁকিয়া গিয়াছেন।*

১৩৫০ সালে তৃতীয় এডোয়ার্ডের রাজত্বকালে স্যার জন মাণ্ডেভিল্লে নামক জনৈক ইংরাজ পূর্ব ইউরোপ ও এসিয়া ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি মেষযুক্ত অত্যদ্ভুত কার্পাস গাছের চাক্ষুষ-বর্ণনা দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, তিনি নিজে কার্পাস মেষের মাংস খাইয়াছিলেন।*

হয়তো এই কারণেই সেই যুগের ইংরাজী সাহিত্যে cotton-wool (কার্পাস-পশম) শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়।

১৪৯২ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখে ইতিহাস প্রসিদ্ধ কলম্বাস বাহামা দ্বীপে

* Man and cotton by Ernest H. Short.

অবতরণ করেন এবং সেখানকার কার্পাস বস্ত্র পরিহিত অধিবাসী দেখিয়াই তাঁহার ধারণা জন্মে যে তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পৃথিবীর সেই অঞ্চলেও পৃথক কার্পাস শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার সঙ্গে ভারতীয় কার্পাস শিল্পের কোন যোগাযোগ ছিল বলিয়া জানা যায় না। কলম্বাস স্বদেশ প্রত্যাগমন কালে বাহামা দ্বীপের প্রসিদ্ধ কার্পাসের নমুনা (Sea island cotton) সঙ্গে লইয়া আসেন।

১৫২০ সালে মাগেল্লান (Magellan) ব্রাজিলের কার্পাস উৎপন্নের খবর প্রথম প্রচার করেন।

১৫৯৫ সালে পর্তুগীজেরা জাপানে কার্পাস শিল্পের পুনঃ প্রবর্তন করে।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ১৬০০ সালে কার্পাস শিল্প প্রথম ইংলণ্ডে প্রবর্তিত হয়। এই সময় নেদারলণ্ডের বহু তাঁতিকে ইংলণ্ডে আশ্রয় দেওয়া হয়।

১৬১৯ সালে আমেরিকার ভার্জিনিয়া নদীর তীরের অধিবাসিরা কার্পাসের চাষ শুরু করে। ইহার পর হইতেই আমেরিকার কার্পাস শিল্প ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে।

১৬২১ সালে বিলাতের পশম শিল্পীরা সেখানে কার্পাস ও পশম মিশ্রিত ৪০ হাজার খণ্ড টুইল কাপড় প্রতি বৎসর প্রস্তুত করিত।

১৬৭৮ সালে মুদ্রিত পুস্তিকাবলী হইতে জানা যায় যে, ভারতীয় বস্ত্রাদি ইংলণ্ডের বাজারে খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৫৯৯ সালে প্রথম ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয়। যে সকল ব্যবসায়ী এদেশজাত বস্ত্রাদি ইংলণ্ডের বাজারে আমদানী করিত, তাহাদের চিঠিপত্র হইতেও জানা যায় যে, ভারতীয় বস্ত্র ইংলণ্ডের বাজারে কত সমাদর লাভ করিয়াছিল। এখানে নমুনা দিতেছি—

You cannot imagine what a great number of the chint would sell here, they being the wear of gentle women in Holland. Make great provision of them beforehand; 200,000 of all sorts in a year will not be too much for this market......etc.

অর্থাৎ "এ দেশে চিনট (রঙীন ছাপান কাপড়) যে কত বিক্রি হইতে পারে, তাহা ধারণা করা কঠিন। হল্যাণ্ডের ভদ্র মহিলারা ইহা বিশেষ পছন্দ

করেন। পূর্ব হইতেই এই জাতীয় কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে মজুত করা দরকার; বৎসরে ২০০,০০০ খানা কাপড় অতি অনায়াসেই বিক্রি হইবে"—ইত্যাদি।

১৭০০ সালে ইংলণ্ডের পশম ব্যবসায়ী ও মেষপালকেরা সেখানকার বাজারে ভারতজাত কার্পাস বস্ত্রাদি বিক্রয় নিবারণ করার অনুরোধ পার্লামেণ্টে পেশ করে। পার্লামেণ্ট সেই অনুযায়ী আইন পাশ করেন।

১৭১২ সালে আর এক নূতন আইন করিয়া ভারতীয় রঙীন ছাপের কাপড় ও সকল প্রকার কার্পাস কাপড় বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। এই আইনের বলে ভারতীয় কাপড় ক্রেতাকে পাঁচ পাউণ্ড ও বিক্রেতাকে ২০ পাউণ্ড দণ্ড দানের ব্যবস্থা হয়। তখনকার দিনে পাউণ্ডের মূল্য বিবেচনা কবিলে বুঝা যায় যে, এই শাস্তি কত কঠোর ছিল। ১৬৭৮ সালে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের প্রসারের বিরুদ্ধে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয় তাহা উল্লেখ যোগ্য। পুস্তিকার নাম ছিল—"The Ancient Trades Decayed and Repaired again"—অর্থাৎ প্রাচীন বাণিজ্য ধ্বংস ও তাহার পুনরুদ্ধার।" ১৬৯৬ সালে "The Naked Truth, in an Essay upon Trade"—বাণিজ্য বিষয়ক নগ্ন সত্য প্রবন্ধে"—প্রকাশিত হয়। ইহার অংশ বিশেষ হইতে নমুনা দিতেছি।

"The commodities that we chiefly receive from the East Indies are calicoes, muslins, Indian silk, paper, salt petre, indigo etc. The advantage of these commodities is chiefly in their muslins and Indian silks (a great value in these commodities being comprehended in a small bulk), and these becoming the general wear of England......

"Fashion is truly termed a witch; the dearer and scarcer any commodity, the more the mode.......

"As regards the Indian silk and calico, it goes further.

"It crept into our houses our closets, our bed-chambers, curtains, cushions, chairs and at least beds themselves, were nothing but calicoes or Indian stuffs and in short almost everything that used to be made of wool or silk, relating either to the dress of women or the furniture of our houses, were supplied by the Indian made

"Above half of the (woolen) manufacture was entirely lost, half of the people scattered and ruined aud this by intercourse of the East Indian trade."

অর্থাৎ "পূর্ব-ভারত হইতে আমরা প্রধানত ক্যালিকো, মসলিন, ভারতীয় রেশম, কাগজ, সোরা, নীল ইত্যাদি পণ্য পাই। এই সমস্ত পণ্যের মধ্যে মসলিন ও ভারতীয় রেশমেরই সুবিধা বেশী (অল্প জিনিষে বেশী দাম পাওয়া যায়) এবং ইহারা ইংলণ্ডের সাধারণ পোষাকে পরিণত হইতেছে।

ফ্যাসনকে যথার্থ ই ডাইনী বলা হয়। যে পণ্য যত বেশী দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইবে, উহা ততই বেশী ফ্যাসন হইবে।...

"ভারতীয় রেশম ও ক্যালিকোর বেলায় ইহা আরও এক কাঠি বেশী।

ইহা আমাদের বাড়ী ঘরে, শোয়ার ঘরে, পর্দায়, কুশনে, চেয়ারে এবং সবশেষে বিছানায় পৌছিয়াছে ; সংক্ষেপে এ কথা বলা চলে যে, পশম ও উলে যা কিছু তৈরী হয়, তা মেয়েদের পোষাকই হোক আর গৃহের আসবাবই হোক, সবই ভারতীয় বাণিজ্যে আমদানী হয়।

অর্ধেকের বেশী (পশমী) উৎপাদন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অর্ধেক লোক বিচ্ছিন্ন ও নষ্ট হইয়াছে এবং এ সমস্তই পূর্ব-ভারতীয় বাণিজ্যের ফলে।"

ভারতীয় মসলিন ও সিল্ক ইংলণ্ডের বাজারে বিক্রি করিয়া ঐ দেশের তাঁতি কতটুকু লাভবান হইত, তাহা অবশ্যই বিবেচ্য। কারণ, এ ব্যবসা চালাইত ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। কিন্তু এদেশের কার্পাস ও সিল্ক যে ইংলণ্ডের সর্বশ্রেণীর লোকের নিকট সমাদর পাইয়াছিল এবং সেই দেশের পশম ব্যবসায়ীরাও যে সেজন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ইংলণ্ডের অনুরূপ আইন ফরাসী দেশেও হইয়াছিল।

ভারতীয় কার্পাস বস্ত্রাদি—বিশেষ করিয়া রঙীন ছাপের কাপড়-ইংলণ্ডেও এই শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা জাগাইয়াছিল, সন্দেহ নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে কার্পাস বস্ত্র উৎপাদনের জন্য কলকব্জার অভাবনীয় আবিষ্কার ও উন্নতি বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য এবং ইতিহাসের দিক দিয়া একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, আধুনিক কাপড়ের কলের অসাধারণ উন্নতির মূলে ইংলণ্ডের দান খুবই বেশী।

১৭৩৩ সালে কেই (Kaye) সাহেব ফ্লাইং সাটেল (flying Shuttle) আবিষ্কার করেন। ইহাতে তাঁতের উৎপাদন শক্তি বহু গুণ বাড়িয়া যায়।

১৭৩৬ সালে তথাকথিত "ম্যানচেষ্টার আইন" ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে পাশ হয়। ইহার বলে ইংলণ্ডে পশম মিশ্রিত কার্পাস শিল্প প্রবর্তনের অনুমতি দেওয়া হয়। ভারতজাত বস্ত্রাদি তখনও নিষিদ্ধ থাকে। ফলে ল্যাংকাশায়ার কার্পাস শিল্পে একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে। ১৭৫০ সালে ম্যানচেষ্টার ও বোলটনের কার্পাস শিল্প কেন্দ্রে ৩০ হাজার লোক কাজ করিত। ১৭৬৪ সালে হারগ্রীবস্ (Hargreaves) সুতার কল স্পিনিং জেনি (Spinning Jenny) আবিষ্কার করেন। ১৭৬৬ সালে ম্যানচেষ্টার ও বোলটনে প্রতিবৎসর ৬০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইতে থাকে। ১৭৬৯ সালে আর্করাইট (Arkwright) নিজের আবিষ্কৃত সুতাকাটার কল (Spinning frame) পেটেণ্ট করেন। ১৭৭৯ সালে ক্রম্পটন সাহেব (crompton) প্রসিদ্ধ স্পিনিং মূল (Spining mule) আবিষ্কার করেন। এতগুলি আবিষ্কারের ফলে কার্পাস শিল্পের অসাধারণ উন্নতি সম্ভব হয়। ১৭৮৩ সালে ল্যাংকাসায়ারে প্রথম সম্পূর্ণ কার্পাস সুতার কাপড় তৈরী হয়। ভারতবর্ষের বাজারে বিলাতী বস্ত্রের রপ্তানীর পথ ইহাতে সুগম হয়। ১৭৮৫ সালে কার্টরাইট (Cart wright) কলে অর্থাৎ এঞ্জিনে চালিত তাঁত আবিষ্কার করেন ইহাতে অবশ্যই কাপড় উৎপাদনের হার দ্রুত বাড়িয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, ১৭৯৩ সালে এলী হুইটনী (Eli whitney) কার্পাসের বীজ ছাড়াইবার যন্ত্র অর্থাৎ কলের (cotton gin) আবিষ্কার করেন। ইংলণ্ডের কার্পাস শিল্পের ইতিহাসে যুগান্তর আসে।

১৮১২-১৫ সাল মধ্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সংঘর্ষের ফলে শেষোক্ত দেশেও কার্পাস শিল্প প্রসার লাভ করে।

১৮১৫ সালে এতগুলি আবিষ্কারের সমন্বয়ে বোষ্টন সহরে প্রথম কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮২০ সালে ইংলণ্ডে ফ্যাক্টরী প্রথা প্রবর্তিত হয়। ইহাতে কলে সূতা ও কাপড় বোনা দুইটী স্বতন্ত্র শিল্প হইয়া দাঁড়ায়। সেই সময়ে বাষ্প শক্তিতে চালিত তাঁতের ১৭ গুণ বেশী হস্ত পরিচালিত তাঁত ইংলণ্ডে বর্তমান ছিল। ১৮৩২ সালে সূতা কাটা কলেরও অভাবনীয় উন্নতি হয় অর্থাৎ রিং স্পিনিং (Ring spinning) আবিষ্কৃত হয়।

ইংলণ্ডে উপরোক্ত কার্পাস শিল্পের অপূর্ব উন্নতি ও ভারতের বিরাট বাজারে বিগত মহা সমরের পূর্ব পর্যন্ত কার্পাস বস্ত্রাদি বিক্রয়ের এক চেটিয়া অধিকার ইংলণ্ডের আর্থিক সমৃদ্ধিকে কতগুণ বাড়াইয়াছিল, তাহা অনেকেরই জানা

কথা। বিগত ১৯১৪।১৮ সালের মহাযুদ্ধের সুযোগে ও ভারতের রাজনৈতিক জাগৃতির সঙ্গে স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারে জনসাধারণের আগ্রহের ফলে এদেশেও কাপড়ের কল দ্রুত প্রসার লাভ করে। এদেশ বাসীর প্রয়োজনীয় সাধারণ বস্ত্রাদি দেশী মিলেই প্রস্তুত হইতে থাকে।

শিক্ষা এবং শিল্প লইয়াই আমার কাজ। আমি শিক্ষানীতির দৃষ্টিতে চরকা সম্বন্ধে যত গবেষণা করিয়াছি তাহাতে এই সত্যটিই বিশেষ ভাবে ধরা পড়িয়াছে যে, দৈনিক এক ঘণ্টা করিয়া আধুনিক সাধারণ চরকায় সূতা কাটলে মাসে ১৫ ফেটি করিয়া সূতা পাওয়া যায়। একখানা ধুতি বা সাড়ীর জন্য সাধারণতঃ ২৫ ফেটি প্রয়োজন। অর্থাৎ যে কোন স্বাভাবিক লোক দৈনিক এক ঘণ্টা করিয়া সূতা কাটিলে বৎসরে ৭ খানা ধুতি বা সাড়ীর সূতা হয়। ইহা এমন একটি সহজ শিল্প যে, ৭ বৎসরের বালক বালিকা পর্যন্ত অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারে এবং তদূর্দ্ধের যে কোন বয়সের কর্মক্ষম ব্যক্তি চরকা চালাইয়া দৈহিক ও মানসিক আনন্দ ও বস্ত্র-স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতে পারে। বালক বালিকার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি স্ফূরণের পক্ষে ইহা একটি প্রকৃষ্ট শিক্ষার উপাদান। এই শিল্পের সঙ্গে মানব সভ্যতার ইতিহাস ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত; সে জন্য শিক্ষা দানের ক্ষেত্রেও ইহা একটি বড় শিল্প। চরকাও একটি যন্ত্র। সূতার কলের সঙ্গে ইহার তফাৎ এই যে, ইহা মনুষ্যশক্তি দ্বারা চালিত। ফলে যন্ত্র বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রথম সোপান হিসাবেও চরকা অতি উপযোগী। আর সকলের বড় কথা এই যে, ইহা বস্ত্র স্বাতন্ত্র্য দিতে পারে। কলের সঙ্গে চরকার কোন বিবাদ থাকিতে পারে না; কারণ চরকাও একটি কল আর কল মানুষেরই আবিষ্কার। কিন্তু কলে উৎপন্ন দ্রব্য যে ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ঘটায়, সে ক্ষেত্রেই মানুষ মানুষের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। কল যেখানে অতিরিক্ত শক্তিতে চালিত হইয়া অতিরিক্ত উৎপাদনে প্রতিযোগীতার সৃষ্টি করে, সেখানেই কল মানুষেরও শত্রু। যে ক্ষেত্রে মানুষ নিজের শক্তি দ্বারা কুটীর সমন্বয়ে নিজের বস্ত্র স্বাতন্ত্র্য দিতে পারে, সে ক্ষেত্রে কলের বস্ত্র দ্বারা প্রয়োজন মিটাইলে গোল বাধে, সেই বস্ত্র সম্বন্ধীয় অনেক খানি প্রয়োজনীয় জ্ঞান তাহার জীবনে বাদ পড়ে। বস্ত্র সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিস্তৃত বিবরণ।

প্রচলিত তকলি :—

তকলি সূতা কাটার একটি অতি পুরাতন ও সহজতম যন্ত্র। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত বস্তু তকলি নির্মাণের জন্য সহজে মিলিতে পারে, সেই অনুসারে ও কাটিবার উপযোগী দ্রব্য অনুযায়ী এবং রকমারি সূতার প্রয়োজন মাফিক তকলির আকৃতি ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটিয়া আসিয়াছে। এই সমস্ত রকমের মধ্যে আজকাল ভারতবর্ষে যে তকলি চালু আছে, তাহাই সর্বাধিক উৎকৃষ্ট। ইহার চাকতি পিতলের, ডাঁটি ইস্পাতের এবং ইহার মাথায় একটা তেরচা খাঁজ আছে। এই তকলি ১০ হইতে ২০ নম্বরের সূতার পক্ষে বিশেষ ভাবে উপযুক্ত। বেশী নম্বরের সূতার জন্য ভিন্ন রকমের তকলি ব্যবহার করিতে হয়। মিহি সূতার জন্য কোন্ ধরণের তকলি বানানো উচিত, তাহা সেই সম্পর্কের ও অন্যান্য কাজের বিবরণের সহিত পরে সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই, এখানে সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নাই।

তকলির ওজন ও মাপ :—

এই তকলির ওজন ১।০ হইতে ১।।০ তোলা পর্যন্ত এবং দৈর্ঘ্য ৬$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি হইতে ৬$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি পর্যন্ত হইয়া থাকে। চাকতিটি ডাঁটের নীচের মাথা হইতে আধ ইঞ্চি উপরে লাগানো থাকে। উহার ব্যাস $\frac{১৫}{১৬}$ ইঞ্চি অর্থাৎ ১ ইঞ্চি হইতে কিছু কম। চাকতির পুরুত্ব $\frac{৫}{৩২}$ ইঞ্চি এবং ওজন একতোলা তিন আনা পরিমাণ। উহার ঠিক মাঝখানে গাঁটের সামনে মোটা ছিদ্র থাকে যাহাতে গাঁটটি চাকতির সমকোণে আটকানো এবং চাকতিটি ঠিক সুডোল থাকিতে পারে। চাকতির তলার দিকটি কিছুটা গোলালো হইয়া থাকে।

ইস্পাত নির্মিত ডাঁটাটির দৈর্ঘ্য পূর্ব কথিত মত ৬$\frac{১}{২}$ হইতে ৬$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়; উহার ব্যাস $\frac{৩}{৩২}$ ইঞ্চি এবং ওজন ৩ হইতে ৪ আনা পরিমাণ পর্যন্ত থাকে। উহার আগার মাথায় আধ ইঞ্চি পরিমিত স্থান চ্যাপ্টা করিয়া উহাতে $\frac{৫}{৬৪}$ ইঞ্চি গভীর ৪৫° ডিগ্রি তেরচা খাঁজ বানানো হয়। ডাঁটের এই চ্যাপ্টা এবং

আট্‌কাইবার অংশটিকে নাক্‌ বলে। ইহার ঠোঁটটি কতকটা ভিতরের দিকে মোড়া থাকে। নাকের দৈর্ঘ্য ঠোঁটের প্রান্ত হইতে মাথা পর্য্যন্ত ২সূত (১সূত= ⅛ ইঞ্চি) এবং প্রস্থ অর্থাৎ চ্যাপ্টা অংশও ২সূতই থাকে।

চাকতির তলায় বাহির হওয়া গাঁটের অংশকে "অনি" বলা হয়। উহা ৪-৫ সূত লম্বা এবং উহার শেষ প্রান্তের ১-২ সূত পরিমিত স্থান মোচাকৃতি ও চোখা রাখা হয়।

তকলির বৈশিষ্ট্য—একটি মাত্র জোড় ঃ—

ডাঁট ও চাকতি—তকলির মাত্র দুইটি অঙ্গ। এই জন্য তকলিতে মাত্র এক স্থানে জোড়। শত শত জোড় দেওয়া চরকার মতো উহা ঢিলা হইতে পারে না। তকলিতে যে একটি জোড় থাকে, তাহাও খুব পাকা। সামান্য ঝাঁকুনিতে উহা আল্‌গা হয় না।

ধাতু ও কাঠের তকলি ঃ—তুলনা।

ধাতুর তকলি এইজন্য পছন্দ করা হইয়াছে যে, উহা কাঠ ইত্যাদি অন্যান্য জিনিষের তকলি অপেক্ষা অধিকতর টেকসই; সরু মজবুত ইস্পাতের ডাঁট থাকায় উহা অধিক দ্রুত ঘুরানো চলে এবং আকারে ছোট অথচ ওজন বেশী হওয়ার ফলে বেশী কাজ দেয়।

বাঁশের ডাঁট লাগানো হইলে উহা তেরচা হওয়ার ও ভাঙিবার আশঙ্কা থাকে। শক্ত করার জন্য উহা অনেক মোটা করিতে হয়। উহার "অনি" মাটিতে খুব ঘষা যাইবে, ফলে উহা টিকিবে কম, আর কাজ দিবে অল্প। ধাতু ছাড়া অন্য জিনিষের চাকতি লাগানো হইলে উপযুক্ত ভারের জন্য উহার আকারও বড় করিতে হয়। কিন্তু সেই অবস্থায় হাওয়ার সহিত উহার ঘর্ষণ বেশী হইবে, ফলে দ্রুতি কমিয়া যাইবে। টেকসই হওয়া, বেঁকে না যাওয়া, খুব কম ঘর্ষণ খাওয়া ও ছোট আকারে বেশী ভার থাকার ফলে ভালো কাজ দেওয়া, ইত্যাদি গুণের জন্য ধাতুর তকলি অন্য সব রকম তকলি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাহা ছাড়া ইহা দেখিতেও সুন্দর। এরূপ সুদর্শন ধাতব তকলির পক্ষে ৭।৮ পয়সা দাম মোটেই কিছু বেশী নহে। পিতলের চাক্‌তির বদলে লোহার চাকতি লাগাইয়া মূল্য কামানো যাইতে পারে। কিন্তু চাকতির জন্য পিতল এই সমস্ত কারণে ব্যবহার করা হয় যে, প্রথমত, পিতলের চাকতি জঙ্‌ ধরে না; দ্বিতীয়ত, উহা সহজেই ছিদ্র করা যায়; তৃতীয়ত, উহা নির্মল,

উজ্জ্বল ও সুশ্রী দেখায়। এই সমস্ত বিশেষত্বের পর ও যদি এই তকলির দোষ একান্ত ভাবে দেখাইতেই হয়। তবে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, ইহা সহজলভ্য কোন বস্তু দিয়া ঘরে ঘরে তৈরী করা যাইতে পারে না। মাত্র সেই চরম সীমায় গিয়া ইহাকে কম স্বদেশী বলা যাইতে পারে। মিহি সুতা কাটার জন্যও ধাতুর তকলি বানানো সম্ভবপর। কাজেই মিহি সুতা উহাতে কাটা চলে না—এই দোষও দেওয়া যায় না। বাংলায় ও বিহারে মিহি সুতা কাটার জন্য ধাতুরই—বিশেষ ভাবে ধাতুর ডাঁট যুক্ত—তকলি কাজে লাগে।

প্রত্যেকটি অঙ্গের কাজ ঃ—

তকলি নিজের কাজ কি ভাবে করে, ইহা বুঝার জন্য উহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি জানিয়া লওয়া প্রয়োজন।

ডাঁট ঃ—

ডাঁটই তকলির প্রধান অঙ্গ। এই ডাটের জন্যই ইহার নাম তকলি। সংস্কৃত "তর্কু" শব্দ হইতে হিন্দীতে তকুয়া, তকলা, তকলি এবং বাংলায় টাকু, টাকুয়া, তকলি ইত্যাদি শব্দ রচিত হইয়াছে।

ডাঁটের কাজ দুই রকমের—(১) এক হাতের আঙ্গুলে ঘুরপাক খাওয়ার পর অপর হাতে ধরা পাঁজের আঁশ পাকানো অর্থাৎ সুতা কাটা এবং (২) কাটা সুতার ধাগা আপন শরীরে জড়াইয়া লওয়া।

ডাঁটাটি সাইকেলের "স্পোক্" দিয়া যেন তৈরি করা না হয়, কারণ, উহা খুব মসৃণ, সরু ও নরম। ডাঁটটি প্রায়ই ছাতার শলায় তৈরী হয়।

কোন কোন কাটুনী ডাঁটের নাকের নীচে ২—২½ ইঞ্চি পরিমিত অংশ গোল না রাখিয়া কতকটা পল-তোলা করিয়া লয় যাহাতে উহার গায়ে পিছল ভাব না আসে এবং আঙুল দিয়া উহাতে পুরা দ্রুতি দেওয়া চলে। উকা দিয়া ঘসিয়া ডাঁটে পলতোলার বদলে দাঁতালো পাক-সাঁড়াশি (vice) দিয়া চাপিয়া উহার গায়ে দাঁতের চিহ্ন উঠানো ভালো এবং তাহা সহজও। কিন্তু এত সব ব্যাপারের বিশেষ প্রয়োজন নাই, কারণ সুতা কাটার সময় ডাঁটের উপর জড়ানো সুতার ঘষায় ডাঁট কম বেশী খর খরে হইয়া যায়। ইহা ছাড়া খরখরে ভাব আনার জন্য ছাইও কাজে লাগানো হয়।

চাক্‌তি ঃ—

তকলির নীচের প্রান্তের নিকটে লাগানো চাক্‌তি বা চক্রী, ডাঁটের দ্রুতি অনেকক্ষণ বজায় রাখে। চাক্‌তি ছাড়া ডাঁট তত দ্রুত ঘুরিতে পারে না। এই চাক্‌তি কুমারের চাকের মত। কুমার লাঠির সাহায্যে আপন চাকাটি একবার সজোরে ঘুরাইয়া দেয়, ফলে উহা বহুক্ষণ পর্যন্ত পাক খাইয়া লাট্টুর মত ঘুরিতে থাকে। তকলিতেও ঠিক এই ব্যাপারই ঘটে। কুমার চাকের উপর রাখা মাটিকে আর সুতাকাটুনী নিজের পাঁজকে রূপ দেয়। উভয়ের মধ্যেই ভার সঞ্জাত আবর্তনের ফল এক। ভারী চাকতির কাজ কেবল আবর্তন বজায় রাখাই নয়, ভারের জন্য গতিবেগও একরকমই থাকে। তকলি মাটিতে না ঠেকাইয়া কাটিবার সময় সুতার ধাগা আপনা আপনি ভারের টানে চলিয়া আসে, ফলে সুতা সমান ও দ্রুত কাটা চলে। ইহা ব্যতীত চাকতির আরো একটি কাজ আছে। সুতার গম্বুজ চাকতির ভিত্তির উপরেই খাড়া করা চলে। চাকতি বাদে সুতা শঙ্কুর আকারে জড়ানো যায় না। শঙ্কুর আকৃতিই এমন যে উহাতে হাওয়ার প্রতিরোধ সব চাইতে কম হয়। অপর কোন আকৃতি সুতা জড়ানোর পক্ষে উপযুক্ত নয়। কাটার সময় মধ্যে মধ্যে সুতা নীচের দিকে চাপিয়া কড়া করিয়া দিবারও প্রয়োজন হয়; এই কাজটি চাকতির সাহায্য ব্যতীত চলিতে পারে না। এই জন্য চাক্‌তির কর্তব্য চারিটি—(১) দ্রুতি বজায় রাখা। (২) দ্রুতি সমান ভাবে রাখা; (৩) সুতার ধাগা টানা এবং (৪) সুতা গুটানোর কাজে সহায়তা করা।

নাক ঃ—

তকলির উপরের মাথায় যে আঁকড়া (খাঁজ) থাকে, তাহাকে "নাক" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। নাক থাকার ফলে অপর কোন কিছুর সাহায্য ছাড়াই তকলি না ঠেকাইয়া হাওয়ার মধ্যে ঘুরাইয়া সুতা কাটিতে পারা যায়, ফলে মাটির সহিত ঘষা না খাওয়ায় উহা অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটানা ঘুরিতে পারে। নাকের সহায়তায় চাকতিটি আপন ভারেই সুতা টানিতে পারে। নাকের জন্যই সুতার ধাগা তকলি হইতে পিছলাইয়া বাহির হইতে পারে না এবং কাটার সময় তকলি সোজা রাখিয়াও ধাগা টানা যাইতে পারে। নাকের বিশেষ কাজ—ডাঁট হইতে সুতা পিছলাইয়া না দেওয়া। ইহা ছাড়া তকলি যখন সম্পূর্ণ খালি থাকে, তখন প্রথম ধাগা বাহির করার পক্ষে নাকই কাজ দেয়।

তকলির নোক অর্থাৎ নাকের উপরের মাথা গম্বুজের মত। এই মাথার ড়া চোখা থাকে—ইহাতে তকলি ঠিক ও সুডৌল, না বেঠিক ও বে-ডৌল তাহা জানা যায়। তকলি যদি ঠিক থাকে, তবে ঘুরানোর সময় এই "নোক"টি কাঁপিবে না, বরং একই জায়গায় সোজা ঘুরিতে থাকিবে।

তকলির নাকের কাজ এইরূপঃ—(১) না ঠেকাইয়া কাটা, (২) তকলির বরাবর সুতার ধাগা টানা (৩) অনেকক্ষণ ঘুরানো (৪) চাকতির ভারীত্বের সুবিধা আদায় করা ও (৫) সুতার প্রথম ধাগা বাহির করা।

অনি ঃ—

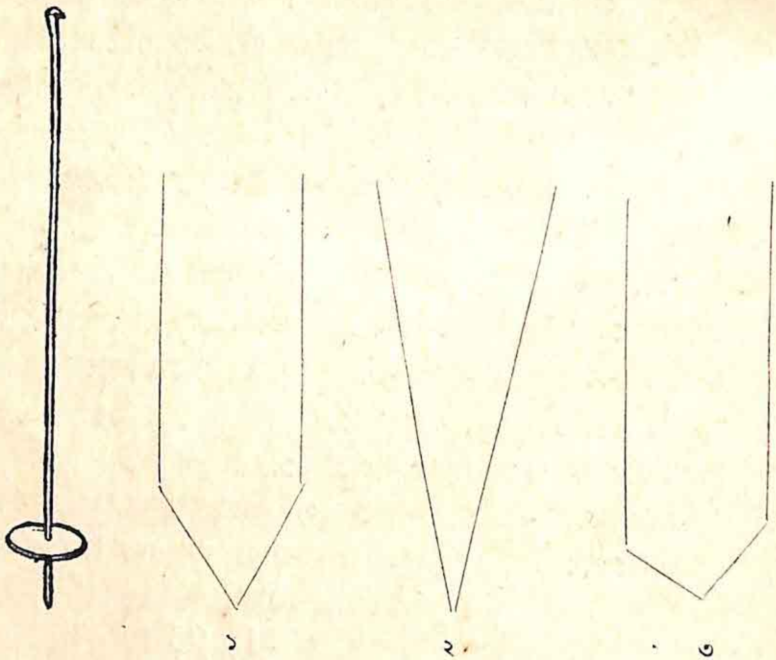
চাকতির নীচে ডাঁটের অংশটুকুর নাম অনি। এই অনির কাজ দুই ধরনের এক, তকলি ঠেকাইয়া সুতা কাটার সময় এবং দুই, নীচে মাটিতে ঠেকাইয়া সুতা গুটাইবার সময়। কাটার সময় সুতা ভরিতে ভরিতে তকলির ওজন বাড়িয়া যায়। ওজন পরিবর্তিত হওয়ার ফলে সুতাও সেই অনুপাতে ধীরে ধীরে বাহির হয় অর্থাৎ ইহাতে কাটার কাজে বাধা জন্মে। অনিটি :মাটিতে ঠেকাইয়া সুতা কাটিলে এই পরিবর্তিত ওজন কাটার উপর কোন প্রতিক্রিয়া জন্মায় না। তকলির তেড়া বাঁকা ঘুর্ণণও অনি ঠেকাইয়া রাখায় সিধা হইয়া যায়। ঠেকানোর ফলে ঝাঁকি লাগে না এবং তকলি এদিক ওদিক হেলে দোলে না। কাটা সুতা অনির সহায়তায় সুন্দর ভাবে জড়ানো যায়; না ঠেকাইয়া জড়াইতে খুব সময় লাগে। অনি না থাকিলে তকলি ঠেকাইয়া কাটার কোনও সুব্যবস্থা আমাদের মিলে না। অনির চারিটি কাজ—(১) ঠেকাইয়া কাটা (২) দ্রুত জড়ানো (৩) সুতার ধাগার উপর তকলির ভার না পড়িতে দেওয়া এবং (৪) তেড়া-বাঁকা ঘুর পাক ঠিক করিয়া দেওয়া।

অনির নোক ঃ—

সুতা কাটার সময় অনি যাহাতে পিছলাইতে বা সরিতে না পারে এবং এক পাশে একই জায়গায় পরিষ্কারভাবে ঘুরিতে থাকে, সেই উদ্দেশ্যে উহার নোক চোখা থাকা দরকার। নোক ভোঁতা হইলে তকলিটি এক জায়গায় টিকিয়া থাকিতে পারে না ফলে গতিবেগে বাধা জন্মে এবং কাজ কম হয়।

অনির এই নোকটি কিছু লম্বা থাকা প্রয়োজন। অনিকে চাকতির গোড়া

হইতেই মোচাকৃতি করিয়া ক্রমশঃ চোখা করা ঠিক নয়। উহাতে অনির স্থূলতা কমায় উহা দুর্বল হইয়া পড়িবে। অনুরূপ ভাবেই অনির নোক কিছুটা ঘষিয়া চোখা করাও ঠিক হইবে না। কারণ, সেই অবস্থায়, সুতা জড়ানোর সময় উহার যোগাযোগ ভেঁাতা অনির মতোই হইবে। সব চেয়ে কম মাটি ছোঁয়ার উদ্দেশ্য ইহাতে পূর্ণ হয় না। এই ধরনের অনির সাহায্যে তকলিটি এক জায়গায় ঠেকাইয়া ঘুরানোর কাজ ও ঠিক মতো চলে না; এই চিত্রে অনির যে তিনটি রকম দেখানো হইল, উহাদের মধ্যে প্রথম রকমের অনি সর্বাধিক ভালো মনে করিতে হইবে।



তৃতীয় অধ্যায়

বস্ত্র বয়ন উপযোগী আঁশ ও কার্পাস

খাল ও ছাল—

কাপড় তৈরি মানুষের কৃতিত্ব। প্রকৃতির কাছ হইতে সহজে সে উহা লাভ করে না। কাপড়ের জন্য আবশ্যক কাঁচা মাল প্রকৃতি মানুষকে দেয়। প্রকৃতির সাহায্যে লোকের যেমন যেমন জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই ভাবেই কাপড় বয়ন শিক্ষারও উন্নতি হইয়াছে। আদিম যুগে মানুষের যখন দুনিয়া সম্পর্কে জ্ঞান খুব কম ছিল, সে সময়ে সে শীত ও গ্রীষ্মের কবল হইতে আপন শরীর বাঁচাইবার জন্য ও লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত পশুর খাল ও গাছের ছাল কাজে লাগাইতে থাকে। সে বরফে ঢাকা উত্তর ভূখণ্ডে চামড়া বা খাল এবং গরম দেশে ছাল পরিধান করিত। আজকাল-ও এস্কিমো প্রভৃতি জাতি সমূহ আলাস্কা গ্রীণলাণ্ড ও সাইবেরিয়া ইত্যাদি বরফের দেশে সীল, বীবর, হরিণ, ভালুক, ও শৃগাল ইত্যাদি পশুর গরম পশমী ও লোমশ খালের স্বাভাবিক পোষাক উহাদের গাত্র হইতে ছিনাইয়া লইয়া কাজে লাগায়। তিব্বতের লামারা এই ধরণের চামড়ার কাপড় পরে। পোষাকের জন্য পশুর ছালের ব্যবহার যে ভাবে আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। গাছের ছাল কিন্তু সে ভাবে আসে নাই। তবুও কোথাও কোথাও এখনও ইহার ব্যবহার দেখা যায়। ফিজির আদিম অধিবাসীর একটি বাকল (গাছের ছালের কাপড়) ওয়ার্ধার মগন সংগ্রহালয়ে (মিউজিয়মে) আমরা দেখিতে পারি। ওহ্ গাছের ভিতরের ছালে উহা প্রস্তুত ; ফিজির লোকেরা উহাকে "টাপা" বলে। এই গাছের মোলায়েম ছালটি পিটাইয়া প্রথমে লম্বা পাটির মতো করা হয়। পরে গঁদ লাগাইয়া উহার কাপড় তৈরী হয়। ভারতবর্ষে উড়িষ্যার জংলী জাতিরা যে এই ধরণের ছালের কাপড় তৈরি করিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই বল্কল প্রায় কাগজের মত ছিল। লেখার জন্যও উহা ব্যবহৃত হইত। দক্ষিণ ভারতে ত্রিবাঙ্কুরের নানা দিকে বিস্তৃত জঙ্গলে এন্টিএরিষ্টাক্সিকারিয়া নামক দেড়শ ফুট বা ততোধিক লম্বা এক প্রকার গাছ সর্বত্র পাওয়া যায়। এই গাছের ভিতরের ছাল ভালো আঁশ যুক্ত। ইহা দিয়া তৈরী কাপড়কে সেখানে "মারাওরী" নামে অভিহিত করে।

ছালের কাপড় তৈরির জন্য প্রথমে বেশ মোটা গাছ খুঁজিয়া বাহির করিয়া উহা কাটিয়া ফেলা হয়। যতখানি লম্বা কাপড় তৈরী করিতে হইবে, ততখানি লম্বা টুকরা উহা হইতে কাটিতে হয়। কাঠের মুগুর দিয়া এই কুঁদার ছাল পিটাইয়া ঢিলা করার পরে কুঁদার এক মাথা হইতে আরেক মাথা পর্য্যন্ত উপর হইতে ছাড়াইয়া আলগা করিয়া ছালটি বাহির করা হয়। এই ছালের কাপড় তাঁতের তানার মতো দেখায়। ত্রিবাঙ্কুরের বন বিভাগ কর্তৃক উপহৃত ৮ ফুট ও ২ ফুট ৭ ইঞ্চি চওড়া একখণ্ড তৈরী বাকল পুনায় লর্ড রে ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ঐ বাকলে তৈরী একটি কুর্তা ও একটি জাঙ্গিয়াও সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পোষাকগুলি হাতে টাঁকিয়া সেলাই করা হইয়াছে। বাকলটি খুব মোটা থাকায় নিমিত্ত গঁদ মাখানো যায় নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহার বেশীর ভাগই থলি বানানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। পোষাক তৈরির জন্য ইহার ব্যবহার নাই। যে এন্টিএরিষ্টাক্সিকারিয়া গাছের ছালে এই বাকল তৈরী হয়। সেই গাছের মধ্য হইতে দুধের মত এক প্রকার সাদা রস নিঃসৃত হয়। এই রস খুব বিষাক্ত। জাভার লোকেরা তীরের ফলা বিষাক্ত করিবার কাজে ইহা লাগায়। জংলী জাতিদের জংলী কাপড়ের এই মনোরম কাহিনী হইতে বুঝা যাইবে যে, দেহ আবৃত করার জন্য মানুষকে আপন বুদ্ধির উপর কতখানি জোর দিতে হইয়াছে। কাপড় তৈরী প্রচেষ্টায় চামড়া পাকানো ও লোম কাজে লাগানো ইত্যাদি আরো কত কাজের কথা হয়তো তাহার জ্ঞান ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছে এবং অনুরূপ ভাবেই পশমের সন্ধান হয়তো তাহার মিলিয়া থাকিবে। শোয়ার জন্য বিছানো পশমের আঁশকে শরীরের চাপে ও ঘামে কার্পেটের মত নরম হইতে দেখিয়াই হয়তো কাপড় এবং উহার প্রস্তুতির পথের সন্ধান তাহার মিলিয়াছে। সর্বাগ্রে হয়তো কাপড় বয়নের পদ্ধতি তাহার বোধগম্য হইয়াছে এবং তাহার পরেই হয়তো সূতা কাটা এবং সূতা কাটার উপযোগী আঁশ সম্পর্কে তাহার জ্ঞানলাভ হইয়া থাকিবে। গাছের পাতার নির্মাণ কৌশল ও মাকড়সার জাল দেখিয়াই হয়তো মানুষের মনে বুননের ধারণা জন্মিয়া থাকিবে। প্রথমে হয়তো সে কাশ ও কুশ ইত্যাদি ঘাসের সাহায্যে চাটাই আসন ও ঢাকনি ইত্যাদি জিনিষ বুনিয়াছে।

পশম, তিসি, কাপাস ও রেশম :—

সম্পর্কে কোন সন্দেহই নাই যে, কাপড় বুননের শিল্প জ্ঞান সূতা কাটা

শিল্পের আগেই হইয়া থাকিবে। কিন্তু কাপড় বুনিতে যে সব বস্তুর আঁশ কাজে লাগে, তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি সর্বপ্রথমে কাজে লাগানো হইয়াছিল তাহা বলা মুশকিল। মানুষ প্রথমে উল (পশম), পরে তিসির শন, তার পরে কাপাস ও শেষে রেশম খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, একথা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে না। এই চারিটি বস্তুই হাজার বৎসর যাবৎ দুনিয়ার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পশমের ব্যবহার তো শুরু হইতেই চলিয়া আসিতেছে, এজন্য ইহাকে আদিম বস্তু বলা যায়। যীশু খ্রীষ্টের ২০০০ বৎসর আগে তৈরী মিসরের পুরাতন পিরামিডে রক্ষিত "মমী"র * উপর শনের কাপড় পাওয়া গিয়াছে। পুরাতন "কার্পাস বস্ত্র" সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ সিন্ধুদেশের খুজিয়া বাহির করা মোহেন্‌-জো-দড়ো নগরেও (খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর) পাওয়া গিয়াছে। চীনের ইতিহাসে (খ্রীঃ পূঃ ২৭০০ বৎসর) রেশমের উল্লেখ দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় এই সমস্ত বস্তুর মধ্যে প্রথমে কোনটি আর পরেই বা কোনটি তাহা নির্দ্ধারণ করা মুশকিল। কাপাস ও রেশমের প্রকৃত অবস্থিতি কিন্তু ঠিক ভাবে বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ কাপাসের এবং চীন দেশ রেশমের জন্মভূমি। তিসির ও শনের জন্মও এসিয়াতে। মিসরের মমীর উপর যে কাপড় পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভারতেই তৈরী হইত, এরূপ কাহিনী পুঁথিতে উল্লিখিত আছে। তিসি ভারতের বস্তু বলিয়া পরিগণিত না হইলেও তিসির কাপড় যে ভারতবর্ষে পরা হইত, ইহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত পুস্তকে ইহা "ক্ষৌম" বলিয়া বর্ণিত আছে এবং উহা যে খুব সুপরিচিত ছিল, সে ভাবেই উহার কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই চারিটি পুরাতন বস্তু আজও কাপড় তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাপড় বুনাইবার আঁশ :—আবশ্যক গুণাবলি :—

দুনিয়ায় আঁশযুক্ত বস্তু অনেক আছে, কিন্তু উহাদের মধ্যে খুব কমই কাপড় বুননের কাজে আসে কারণ যে সমস্ত গুণ থাকিলে আঁশ হইতে সুতা কাটা যাইতে পারে, তাহা সকলের মধ্যে নাই। বয়নের পক্ষে প্রথমেই বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, আঁশ হইতে যেন অটুট লম্বা-ধাগা তৈরী হইতে পারে। এই জন্য আঁশ লম্বা ও মজবুত হওয়া দরকার। উহাতে ধৃতিও যথেষ্ট থাকা চাই অর্থাৎ উহা যেন পরস্পরের সহিত আঁটিয়া জড়াইয়া পাকানো চলে। পরিবার

* মসলা লাগাইয়া সংরক্ষিত মৃতদেহ। আজ পর্যন্ত উহা অবিকৃত আছে।

কাপড় তৈরী বা অনুরূপ অন্যান্য কাজে লাগানোর উপযোগী আঁশ ওজনে হাল্‌কা এবং স্পর্শে মোলায়েম ও তুলতুলে হওয়া প্রয়োজন। উহা জল শোষকও হওয়া দরকার, নইলে ঘাম শুষিয়া লওয়ার ও ধুইলে সাফ হওয়ার গুণ উহাতে থাকিবে না এবং উহা রঙানোও যাইবে না। যদি এই সমস্ত গুণ উহাতে না থাকে, তবে উহার কাপড় পরিধানের উপযোগী ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হইবে না।

পাঁচটি আঁশওয়ালা বস্তু ঃ—

যে সমস্ত আঁশ যথেষ্ট পরিমাণে সহজে মিলিতে পারে, তাহাই লোকে প্রাত্যহিক কাজে, ব্যবসা ও লেন-দেনের ব্যাপারে ব্যবহার করিতে পারিবে। উৎপাদন কম হইলে আঁশের মূল্য এত বেশী হইবে যে, উহা সাধারণ লোকের দৈনন্দিন কাজে লাগানো সম্ভব হইবে না। কাপাস, পশম, তিসি, (শন) রেয়ন ও রেশম এই পাঁচটি আঁশ আজকাল কাপড় বয়নেরও কাজে লাগে। ইহাদের প্রত্যেকটির ব্যবহারের অনুপাত যথাক্রমে শতকরা ৬৯, ১৯, ৭.৫, ৪ এবং .৫। এই সমস্ত আঁশেরই প্রচলন খুব বেশী। ইহা ছাড়া আরো অন্য রকমের এমন কতকগুলি আঁশ আছে যাহাদের ব্যবহার কাপড় তৈরীর কাজে স্বতন্ত্র ভাবে বা অন্যান্য আঁশের সহিত মিলাইয়া করা হয় বটে, কিন্তু তাহাদের খুব কমই কাজে লাগানো হয়।

তিসি, কাপাস, পশম ও রেশম প্রভৃতি প্রাকৃতিক আঁশের মধ্যেও বয়নের পক্ষে আবশ্যক গুণাবলি যথাক্রমে অধিকতর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কাপাস ও পশমকে মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে আবার নূতন ও সংশোধিত রূপ দিয়াছে। ইহা ছাড়া কতকগুলি সম্পূর্ণ নয়া আঁশও প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই ভাবে আঁশের তিনটি জাত দেখা যায়—প্রাকৃতিক, সংশোধিত ও কৃত্রিম।

জন্ম স্থান ও রাসায়নিক প্রস্তুতির কথা চিবেচনা করিয়া ইহাদের আবার নিম্নোক্ত রূপ বিভাগও সম্ভব—পশু হইতে লব্ধ, গাছ-গাছড়া হইতে সংগৃহীত, খনি হইতে বাহির করা, জৈব পদার্থ হইতে তৈরী, এবং অজৈব পদার্থ হইতে প্রস্তুত।

আঁশের জাতঃ—

- আঁশ
  - প্রাকৃতিক
    - পশু হইতে লব্ধ
      - উল :—ভেড়া, ছাগল, গরু, চমরী, আলপাকা ইত্যাদি পশুর রোম
      - লালা : —পোকার লালা, তসর, রেশম, এণ্ডি ও মূগা—(সাধারণ নাম রেশম)
    - গাছ-গাছড়া হইতে সংগৃহীত
      - বীজ-আঁশ —কাপাস
      - ছাল-আঁশ—তিসি, শণ, পাট ইত্যাদি।
      - পাতা-আঁশ—কেতকী (কেয়া)
      - ছোবড়া-আঁশ —তাল, নারিকেল ইত্যাদি
    - খনি বইতে উত্তোলিত
      - এস্‌বেস্‌টস্ নামক পাথর (Asbestos)
  - সংশোধিত
    - দুইবার তৈরী উল (Re-manufactured wool)
    - চিক্কণ কাপাস (Mercerised Cotton)
    - ক্লোরিণ গ্যাসে সংশোধিত উল (Chlorinated wool)
  - কৃত্রিম
    - জৈব :—রেয়ন বা নকল রেশম (Rayon) ল্যানিটাল দুধ হইতে।
    - অজৈব :—পাথর বা সোনা, রূপা ইত্যাদি ধাতুর তার।
    - নাইলন—পাথুরে কয়লা হইতে।

রকমারি আঁশের বর্ণনা :—

উলঃ—কাপাসের মত ভেড়ারও অনেক জাতি আছে। কাপড় বয়নের উপযোগী গাছের মধ্যে যেমন কাপাস প্রধান, পশুর আঁশের মধ্যে সেইরূপ ভেড়ার লোমই শ্রেষ্ঠ। কাপাস ও উলের জন্ম স্থান ভিন্ন ভিন্ন। মিসিসিপির ব-দ্বীপ, ব্রাজিল, মিসর, ভারতবর্ষ ও চীন প্রভৃতি কাপাস-উৎপাদক দেশ সমূহ ৪০° ডিগ্রির সমতাপ রেখার (Isotherm ৪০°) ভিতরে অবস্থিত। অশ্চর্যের

বিষয় এই যে, উল-উৎপাদক দেশ সমুহ ৮০°র সমতাপ রেখার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ উল মধ্যম আবহাওয়াযুক্ত দেশে এবং কাপাস গ্রীষ্ম প্রধান দেশে উৎপন্ন বস্তু। উলের উৎপাদন ঐরূপ দেশের সর্বত্রই অল্প বিস্তর হইয়া থাকে, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর দক্ষিণ অংশেই উহা বিশেষ ভাবে উৎপন্ন হয়। মেরিনো নামক ভেড়ার জাতই সব ভেড়ার মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করা হয়। এই জাত স্পেনের বাসিন্দা হইলেও আজকাল সব দেশেই উহা পালিত হইয়া থাকে।

ছাগলের মধ্যে তুর্কিস্থানের আঙ্গোরা এবং হিন্দুস্থানের কাশ্মীরী ছাগলের পশম সর্বাধিক ভালো। আঙ্গোরা ছাগলের উলকে "মোহে অব" বলা হয়। ইহা সাদা রং-এর, মিহি ও উজ্জ্বল। ইহার কাপড় পৃথক ভাবে বুনানো চলে, আবার রেশমের সঙ্গে মিলাইয়াও বুনা যায়। আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইউরোপেও ইহার উৎপাদন বাড়িতেছে। কাশ্মীরী ছাগলের উল প্রথম শ্রেণীর। ইহা খুব মিহি ও মোলায়েম। ছাগলের গায়ে বাহিরের কর্কশ উলের তলে তলে এই মোলায়েম উল সযত্নে রক্ষিত থাকে। জগৎ বিখ্যাত কাশ্মীরী শাল পশমীনা এই উল হইতেই তৈরী হয়। চীনে ও এই ধরণের উল পাওয়া যায়। উহা রেশমের মত মিহি ও কোমল। উহার রং ঠিক সাদা রেশমের মত। রেশমের সহিত উহার এতই মিল যে, এই দুইটিতে একত্র মিশাইয়া দিলে তাহাদের পৃথক ভাব চেনা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে।

কাশ্মীরী ছাগলের উলের মত উটের উলও উহার বাহিরের শক্ত পশমের তলায় ঢাকা থাকে। ভিতরের এই কোমল উলই বয়নের কাজে ব্যবহৃত হয়।

লামা, আলপাকা, বিহকুনা প্রভৃতি দক্ষিণ আমেরিকার পাহাড়ী লোমশ পশু। জংলী, কিন্তু পালনযোগ্যও বটে। ইহাদের দিয়া ভার বহনের কাজ করানো যায়।

এই তিনটি জন্তুর মধ্যে প্রথমটির উল হাল্‌কা, দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত ভালো এবং তৃতীয়টির উল কাশ্মীরী উলের মত মনোরম।

গরুর লোম স্কাণ্ডিনেভিয়ায় হাল্‌কা কম্বল (Rug) প্রস্তুতের কাজে লাগে। ঘোড়ার লেজের চুল দিয়া গৃহস্থালী ও বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য চালুনি তৈরী হয়। উহার ঘাড়ের চুল ও অন্যান্য পশমের সহিত মিশাইয়া বুননের কাজে ব্যবহার করা চলে।

রেশমের অর্থাৎ রেশম, তসর, এণ্ডি ও মুগার কাপড় পোকার লালার তার দিয়া তৈরী কাপড়ের অন্তর্ভূক্ত। তুঁতপাতা খাওয়া গৃহ-পালিত রেশমের পোকা হইতে রোম, এরণ্ড বা রেড়ীর পাতা খাওয়া গৃহপালিত পোকা হইতে এণ্ডি এবং শাল ও কুল পাতা খাওয়া সেই জাতীয় এক রকমের জংলী পোকা হইতে তসর ও আসামের শোয়ালু গাছের পাতা-খাওয়া জংলী পোকা হইতে মুগা পাওয়া যায়।

জাপান, চীন, ইতালী ও ফ্রাঁসে রেশম-উৎপাদন বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে। ভারতেও কিছু রেশম এবং তসর, এণ্ডি ও মুগা উৎপন্ন হয়।

সমুদ্রজাত এক রকমের শামুক আপন দেহ নিঃসৃত আঠালো রস হইতে আঁশ তৈরী করে, রেশমের পোকার মতো সে কিন্তু আঁশ দিয়া কোয়া বা গুটি তৈরি করে না। এই শামুক ইতালীর নিকটবর্তী ভূমধ্য সাগরে পাওয়া যায়। ইহার খোলার উপর সোনালী বা সবুজ রংয়ের সওয়া বা দেড় ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ, মোলায়েম, নমনীয় ও মজবুত আঁশ জন্মিয়া থাকে। এই আঁশের সাহায্যে শামুকটি আপন খোলার ডিঙি হইতে সমুদ্রের তলায় নোঙর ফেলিয়া বিশ্রাম করে। ইংরেজীতে এই আঁশের নাম বাইসাস্ বা মসল রেশম (Byssus or Mussol Silk) এই রেশমে থলি, দস্তানা ও অন্যান্য সুন্দর সুন্দর জিনিষ তৈরী হয়।

কার্পাস ব্যতীত আর যে সমস্ত গাছ আপন বীজের গায়ের রেঁায়া হইতে তুলা প্রদান করে। আখ, শিমুল ইত্যাদি তাহাদের অন্যতম। কিন্তু উহাদের আঁশের মধ্যে স্বভাবজাত পাক ও ধারণ শক্তি না থাকার ফলে উহারা সূতা কাটার কাজে লাগিতে পারে না। গদি ও তাকিয়া, বালিশ ইত্যাদি ভরার উদ্দেশ্যে উহাদের ব্যবহার চলিতে পারে।

কেতকী বা কেয়া—প্রভৃতি গাছের মোটা পাতার আঁশ হইতে কাপড়, দড়ি ও ডোর বানানো যায়। ছিন্দ এর পাতা হইতে বাহির করা আঁশও ইহার মধ্যে ধরা যাইতে পারে।

আঁশযুক্ত ছোবড়া ওয়ালা—ফলের মধ্যে নারিকেল সকলেরই পরিচিত। ইহার ছোবড়া দিয়া মোটা দড়ি, সরু রশি, পা-পোষ, পাটি ইত্যাদি অনেক রকমের জিনিষ তৈরী করা যাইতে পারে। নারিকেলের ছোবড়া খুব কড়া হওয়ার দরুণ ইহা কাপড় তৈরীর কাজে লাগানো যায় না। তবে নানাবিধ কাজের

জিনিষ বুনানো যায় বলিয়া ইহাকে আঁশের মধ্যে গুন্‌তি করা চলে। নারিকেলের ছোবড়ার বেশ বিরাট শিল্প প্রচলিত আছে।

স্বাভাবিক খনিজ আঁশ—একটিই আছে। ইংরেজীতে এস্‌বেস্টস (Asbestos) বলা হয়। ইহার উপর আগুনের বা অ্যাসিডের কোন ক্রিয়া নাই। এজন্য আগুন নিবারণের উদ্দেশ্যে নির্মিত বস্ত্রে ও বৈজ্ঞানিক কাজে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া, লণ্ঠনের পলিতা, ও আগুনের কাছে থাকা কাঠের দেওয়ালের আবরণ ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের কাজে ইহা লাগানো হয়।

"রি-ম্যানুফ্যাকচার্ড্‌" অর্থাৎ পুনরায় তৈরী উল—পুরাতন পশমী কাপড় ছিঁড়িয়া উহা হইতে ভালো আঁশগুলি বাছিয়া সাফ করিয়া এবং তাহা হইতে সূতা কাটিয়া পুনরায় বানানো চলে।

"মার্সিরাইজড্‌" অর্থাৎ উজ্জল সূতা—মার্সার নামক একজন ইংরেজ এই প্রণালীটি আবিষ্কার করেন—এই জন্য এই প্রণালীতে উজ্জ্বলীকৃত বা চকচকানো সূতী কাপড়কে মার্সিরাইজড" বলা হয়। ইহা একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া। ইহার ফলে কার্পাসের আঁশের গড়ন বদলাইয়া যায়। আঁশের স্বাভাবিক পাক নষ্ট হয় এবং উহা একটি সোজা নলের আকৃতি প্রাপ্ত হয়। আর আঁশগুলি মজবুত ও চকচকে হয় এবং ভালো রকমে রং শুষিয়া লইতে পারে।

"ক্লোরিনেটেড্‌" অর্থাৎ ক্লোরিন (chlorine) নামক গ্যাসের পরিষ্কৃত——ক্লোরিন বা ব্রোমিন (Bromine)—এর ক্রিয়ায় আঁশগুলি মজবুত উজ্জ্বলতর রঙানোর উপযোগী হইয়া থাকে।

রেয়ন অর্থাৎ তৈরী রেশম—ইহা তৈরী হইলেও অকেজো নয়। কাঠে এবং সেলুলোজ (cellulose) নামে পরিচিত অনুরূপ ধরণের অন্যান্য দ্রব্য হইতে রাসায়নিক পক্রিয়া এবং মেশিনের সাহায্যে ইহা তৈরী করা হয়। ইহার আবার তিন চারিটি জাত আছে। ইহার উৎপাদন বর্তমানে খুব দ্রুত গতিতে বাড়িতেছে। প্রাকৃতিক রেশমের তুলনায় ইহার উৎপাদন দশ বারো গুণ বেশী অথচ মূল্য চার পাচ গুণ কম।

কাচের সুতা—ইহাও অনেক কাজে লাগে। কাপড় তৈরির জন্যও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সোণা রূপার তার—রেশমী বা অন্যান্য মূল্যবান কাপড়ের নক্‌শা পাড় ও আঁচলার জন্য ইহার পট্টি, ফিতা, লেস ইত্যাদি তৈরী হয়। উহাকে জরীপাড় বলে।

বৈজ্ঞানিক মত অনুযায়ী কাপাসের জাত :—

উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে কাপাসের গনতি মালবাসী (Malvaceae) শ্রেণীর (Nature order) গসিপিয়ম (Gossipiom জাতের মধ্যে। মালবাসী শ্রেণীর বিশেষত্ব এই যে, ইহার গাছ মাসে মাসে বাড়িতে থাকে। গসিপিয়াম অর্থাৎ কাপাসের জাত দুই রকমের। (১) এসিয়ার উৎপন্ন। (২) এসিয়ার বাহিরে উৎপন্ন। প্যালেস্টাইন হইতে চীন পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশে এবং সিংহল হইতে এসিয়ার রাশিয়া পর্যন্ত ভূখণ্ডে উৎপন্ন হরবেশিয়ম্ কাপাস, আর দেব কাপাস জাতীয় চির সবুজ আরবোরিয়ম নামক কাপাসের গাছ (Tree cotton) প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আবার দুইটি জাতি আছে—এক, আপলাণ্ড, দ্বিতীয়, পেরুবিয়ন। আপালাণ্ড জাতীয় কাপাসের বৈজ্ঞানিক নাম হিরসুটম্ (Hirsutum)। হিরসুটম্-এর অর্থ—যাহার শরীরে মিহি রোঁয়া আছে। কম্বোডিয়া কাপাসও এই জাতির। এই জাতিটি আসলে এসিয়ার। কিন্তু ইহার উৎপাদন বেশির ভাগ আমেরিকায় হয়। পেরুবিয়ান জাতীয় কাপাসের তিনটি নাম—বার্বাডেন্স (Barbadense) মার্টিমম্ (Martimum) ও পেরুরিয়ানম্ (Perurianum) এই জাতির ভিতর সমুদ্র-দ্বীপ (Sea Islnd) ইজিপশিয়ান (মিশর দেশীয়), পেরুবিয়ন করবোনিকা ইত্যাদি কাপাস আছে। ইহা প্রথম শ্রেণীর কাপাস। ইহার জন্মভূমির ঠিক ঠিকানা পাওয়া যায় না। ইহার পাতা আঙুরের পাতার মত, কাজেই প্রচলিত পদ্ধতিতেই ইহা চেনা যাইতে পারে।

কাপাসের জাত কয়টি সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানীদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। যদিও উপরে যাহা কিছু লেখা হইয়াছে, তাহা সবাই মানেন।

মোটামুটি কাপাসের দুইটি জাত :—ক্ষেতী অর্থাৎ বর্ষজীবি চারা (২) দীর্ঘজীবি গাছ। এই উভয়েরই আবার কয়েকটি উপরিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

হরবেশিয়াম্, অরবোরিয়াম্, হিরসুটম্ ইত্যাদি নাম বৈজ্ঞানিক আর আমেরিকান, পেরুবিয়ান, ইজিপশিয়ান প্রভৃতি নাম দেশ অনুযায়ী।

কার্পাসের সাধারণ বিবরণ :—

ভিন্ন ভিন্ন জাতের কাপাস গাছ ৩ ফুট হইতে ১০।১২ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। জমি ভাল হইলে ইহার শিকড় ৬।৭ ফুট মাটির ভিতরে প্রবেশ করে। কোন

কোনটির পাতায় তিনটি শিষ বাহির হয়, কাহারো কাহারো বা পাঁচটি। কোন কোনটার পাতায় রোঁয়া থাকে, কোনটায় থাকে না। ফুল হলদে; সোনালী, গোলাপী, লাল ও কমলা ইত্যাদি রং-এর হইয়া থাকে। ইহার আকার করবী ফুলের মত, ঘণ্টার মতন গোলালো। জাত অনুযায়ী ইহার বীজ কোষ বা ঢেঁড়ি পৌনে এক ইঞ্চি হইতে দেড় ইঞ্চি পর্যন্ত মোটা, হালকা বা গাঢ় রংঙে এ রঙীন, ছোট, বড়, লম্বা, খাটো, গোল ও চোখা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। ফুটিবার পর কোন কোন জাতের ঢেঁড়ির মধ্য হইতে কাপাস বাহির হইয়া ২।৩ ইঞ্চি লম্বা চুলের গেছার আকারে ঝুলিতে থাকে, আবার কোন কোন ঢেঁড়ি হইতে উহা বাহিরই হয় না। আর কোন কোনটা কুণ্ডলীর মত ভিতরে ভিতরেই জমাট বাঁধিয়া থাকে। কোন কোন জাতীয় বীজ হইতে আঁশ পরিষ্কার আল্গা হইয়া আসে আর কোন কোনটির বীজ হইতে আঁশ ছাড়ানোর পরেও মিহি রোয়া উহাতে লাগিয়াই থাকে। এই সাঁটিয়া থাকা রোঁয়াকে ইংরেজিতে লিণ্টার্স (Linters) বলা হয়। যদি তুলাকে চুল বলা যায়, তবে তুলার এই বাকী অংশকে রোম বলা যাইতে পারে। তুলার মূল্য নির্ধারণ উহার আঁশের দৈর্ঘ্য, শক্তি, রং, কোমলতা ও নমনীয়তা ইত্যাদি গুণ অনুযায়ী কম বেশী হইয়া থাকে। কাপাসের আঁশের দৈর্ঘ্য আধ ইঞ্চি হইতে ২ ইঞ্চি পর্যন্ত এবং ব্যাস ০'০০১ হইতে ০'০০৯৪৬ ইঞ্চি অবধি হয়। আঁশ যত ছোট হয়, উহার ব্যাসও ততই বেশী, আর আঁশ যত লম্বা হয়, ততই উহা মিহি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ কাপাসের মোট ওজনের দুই-তৃতীয়াংশ বীজ এবং এক তৃতীয়াংশ তুলা বাহির হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতের কাপাসে তুলার উৎপাদনের মাত্রা শতকরা ২৫ হইতে ৫০ পর্যন্ত পাওয়া যায়।

কার্পাসের অাঁশের গড়ন ঃ—

এখন কার্পাসের আঁশের আসল গড়ন দেখা যাউক। এই আঁশের বিশেষত্ব এই যে, উপরিভাগে উহা এক কোশী (One Celled) দেখা যায় বটে, কিন্তু ভালো অনুবীক্ষণে দেখিলে উহার গড়ন খুব বিস্ময়কর বোধ হয়। আঁশের অভ্যন্তর নলের চারিধার পরতে পরতে গড়া একটি চতুষ্কোণ দেওয়ালের মতো। এই পরত খুব মিহি রোমে তৈরী এবং পরস্পরের সঙ্গে এক প্রকার আঠালো পদার্থে আঁটা বা জমাট বাঁধা। এই রোমগুলি আবার সেল্যুলুজ পরমাণু দিয়া

তৈরী ও আঠালো রসে জোড়া। কাপাসের আঁশের গড়ন খুব জটিল। উহা বহু রকমের পদার্থের মিশ্রনে প্রস্তুত, কেবল একটি মাত্র বস্তুতে তৈরী নয়। এই বিষয়টি অনুবীক্ষণের সাহায্য ছাড়া খালি চোখে দেখা যায় না।

নানা রকম পদার্থে তৈরী, পরতে পরতে জড়ানো, পাতলা দেওয়ালে ঘেরা ও ফাঁপা নলের আকৃতি বিশিষ্ট এই আঁশ বীজের খোসার উপর বাড়িয়া চলে। উহার এক মাথা বীজের সঙ্গে লাগা ও অপরটি খোলা। বীজ হইতে একটা দুধের মতো রস আঁশের ফাঁপা নলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়; তাহা হইতে খোরাক পাইয়া আঁশ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বাড়িতে থাকে। আঁশে পুরা পাক ধরা পর্য্যন্ত অর্থাৎ উহার বাড় পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত এই রসের প্রবাহ চলিতে থাকে। ঢোঁড়ি যখন ফাটিয়া যায় এবং আঁশের উপর বহির্জগতের রোদ ও বাতাস লাগিতে থাকে, তখন এই রস ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায় এবং আঁশে ফাঁপ জন্মায়। হাওয়ার চাপের ফলে ধীরে ধীরে উহার দেওয়ালও চাপিয়া আসে এবং উহা চ্যাপ্‌টা হইয়া যায়। চাপের প্রতিক্রিয়া প্রথমে আঁশের খোলা সরু মাথার উপর পড়ে এবং ধীরে ধীরে উহা বীজের সঙ্গে লাগে ও আঁশের মোটা মূল পর্যন্ত গিয়া পৌঁছে। ফলে, আঁশটি আপন অক্ষদণ্ডের (axle) উপর নিজে নিজেই পাক খাইয়া গুটাইয়া যায়। পাকা আঁশের মধ্যে এই গুটানোর পাক ১৫০ হইতে ৩০০ পর্যন্ত পাওয়া যায়। এই পাক না থাকিলে কিন্তু এত ছোট আঁশে আস্ত সূতা কাটা সম্ভব হইত না। পাকের কারণে আঁশগুলি পরস্পরের পায়ে সাঁটিয়া থাকায় সূতা তৈরী হইয়া থাকে। আধ পাকা ও মরা আঁশে এই পাক খুব কম থাকে, সেজন্য ঐরূপ খারাপ আঁশ পৃথক করিয়া তোলা উচিত আর তাহা সূতা কাটার কাজে লাগানো সঙ্গত নয়। ঐ সমস্ত আঁশ দুর্বল, ভঙ্গুর ও রঙানোর অনুপযোগী। ইহাতে সূতা কাটিবার উপযুক্ত পাক এবং রঙানোর পক্ষে ফাঁপাই থাকে না।

আঁশের আগা সরু ও প্রায়ই ঠাসা হয়। আর উহা নমনীয় নহে। এজন্য ধুননের সময় প্রায়ই উহা ছিঁড়িয়া যায়। আঁশের গোড়া অর্থাৎ বীজের সঙ্গে লাগাও মাথাটি মোটা এবং উহার মুখ খোলা থাকে।

যেখান থেকে অঙ্কুর গজায়, বীজের সেই মুখের পাশে যে সব আঁশ থাকে, তাহারা কম লম্বা আর মুখের উল্‌টা দিককার আঁশ গুলি বেশী লম্বা হয়। অর্থাৎ বীজের সব আঁশের দৈর্ঘ্য সমান থাকে না। তুলার ঢেঁড়ির মধ্যে অবস্থিত

সব বীজের এবং বীজের উপরিস্থ সব আঁশের সমান জায়গা জোটে না, ফলে সব আঁশের ক্রম-বিস্তার সমান হইতে পারে না।

কাপাসে শত করা ৯০ ভাগ কাঠ অর্থাৎ সেল্যুলোজ, শতকরা ৬ হইতে ৮ ভাগ জল ও শতকরা ২ হইতে ৪ ভাগ ক্ষার, তৈল ইত্যাদি অন্যান্য পদার্থ আছে।

কাপাসের চাষ—জমি, মৌসুম ও আবহাওয়া :—

(১) উত্তমরূপে কর্ষিত কালো উর্বর জমি (২) আবশ্যক মত স্থায়ী গ্রীষ্ম (৩) আদ্রতা অর্থাৎ জমির সেঁতসেঁতে ভাব; (৪) ঠিক মত বীজ নির্বাচন (৫) প্রত্যেকটি চারা ও প্রত্যেক লাইনের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রাখিয়া সময় মত বীজ বপন (৬) বৈজ্ঞানিক সার ও সেচ কার্য (৭) দিনে গরম ও রাত্রে ঠাণ্ডা এবং (৮) বীজ বপনের পরে মাঝে মাঝে অল্প অল্প বৃষ্টি—এই সমস্ত ব্যাপারই কাপাসের উৎকৃষ্ট চাষের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

কাপাস-চারা খুব কোমল। আবহাওয়ার আকস্মিক ও পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন সে সহ্য করিতে পারে না। ঠাণ্ডা দেশে এবং উপযুক্ত পরিবেশ না মিলিলে কাপাসের ফসল হয় না। এইজন্য ইংলণ্ডে মোটেই কাপাস জন্মে না কেবল গ্রীষ্ম বা নাতি গ্রীষ্ম (Sub tropical) দেশেই ইহার উৎপাদন সীমাবদ্ধ। শুধু যে বর্ষা বা বৃষ্টির জলের প্রক্রিয়ার ফলেই কাপাসের চাষ হইতে পারিবে এমন নয় সেচের সাহায্যেও কাপাস উৎপন্ন করা যাইতে পারে। মিসরে এবং অপর কোন কোন দেশে এই প্রথায় ইহার চাষ করা হয়। এই সমস্ত দেশে বর্ষা খুব কম হয়। কাজেই খাল হইতে জল সেচের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক হইয়া থাকে। বৃষ্টির জলে চাষের তুলনায় সেচের চাষে উচ্চতর শ্রেণীর কাপাস জন্মে। প্রতি একরে কাপাসের উৎপাদনও খুব বেশী হয়, ফলে কৃষকের আয়ও যথেষ্ট হইয়া থাকে। বর্ষার উপর ভরসা রাখার প্রয়েজেন না থাকায়, অতি বৃষ্টি, শুকা বা অসময়ের বর্ষায় ক্ষতি হওয়ার ভয় খুব কম।

যেখানে খাল হইতে সেচের বন্দোবস্ত নাই, সেখানে কাপাসের চাষ সম্পূর্ণরূপে বর্ষার ক্রিয়ার উপরেই নির্ভর করে। ঋতুর পরিবর্তন বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে হওয়ার ফলে দুনিয়ার কোন না কোন অংশে কাপাস বপন ও চয়ন

সব সময়ই চলিতে থাকে। কাপাসের বপন হইতে চয়ন পর্যন্ত কাজে যত সময় লাগে, তাহা কাপাসের ভিন্ন ভিন্ন জাত অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। কোন কোন জাত ৪-৫ মাসেই তৈরী হয়, আবার কোন কোনটির তৈরিতে বেশ কয়েক মাস লাগিয়া যায়। কয়েক সপ্তাহ ব্যাপিয়া কাপাস-চারায় ফল ফুল ধরে এবং উহার ঢেঁড়ি ফুটিতে থাকে। ক্ষেত হইতে সমস্ত কাপাস তুলিয়া আনার জন্য ৪ হইতে ৫ বার পর্যন্ত চয়ন করিতে হয়। এই চয়নের কাজ দেড় দুই মাস চালু থাকে।

কাপাসের চাষ—বিস্তৃতি ও পরিমাণ ঃ—

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র (United States), ভারতবর্ষ, চীন, রুশিয়া, মিসর ও ব্রাজিল দেশে কাপাসের উৎপাদন খুব বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে। উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কম—এই হিসাবে এই সকল দেশের নামগুলি সাজানো আছে। অর্থাৎ উৎপাদনের বেলায় আমেরিকার স্থান প্রথম ও ভারতবর্ষের দ্বিতীয়। আমেরিকায় ৪ কোটি একর এবং ভারতে ২॥ কোটি একর জমিতে কাপাসের চাষ হয়। অথচ প্রতি একরে উৎপাদন বিষয়ে প্রথম স্থান মিসরের, উহার পরে রুশিয়া, চীন ও আমেরিকা এবং সর্বনিম্নে ভারতের স্থান। এই সকল দেশের প্রতি একরে তুলার উৎপাদন যথাক্রমে ৪০০, ২১২, ২০০, ১৭০ ও ৯৬ পাউণ্ড। কয়েক বৎসর যাবত ব্রাজিল ও অষ্ট্রেলিয়ায় যথেষ্ট পরিমাণে কাপাসের উৎপাদন বাড়িতে শুরু করিয়াছে। বিশেষ বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে প্রথম লোহা, দ্বিতীয় কয়লা এবং তৃতীয় স্থান কাপাসের, একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই কারণেই অনুকূল দেশ সমূহের সর্বত্র কাপাস-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। দুনিয়ায় প্রতিবৎর মোট ৫৫ হইতে ৬৫ লক্ষ টন তুলা জন্মে; উহার মধ্য হইতে প্রায় ৪৫ হইতে ৫৫ লক্ষ টন তুলা কাপড় তৈরির এবং বাকিটা অন্যান্য শিল্পের কাজে লাগে।

কাপাস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল। গুণানুযায়ী কত রকম জাতের কাপাস সারা পৃথিবীতে আছে, তাহাই এখন বলা হইবে।

গুণানুযায়ী পৃথিবীর সমস্ত কাপাসের শ্রেণী বিভাগ।

কাপাস	স্তার নম্বর (count)	আঁশের দৈর্ঘ্য— (—ইঞ্চিতে)
১। সাগর দ্বীপ—প্রথম শ্রেণীর কারোবিনা পশ্চিম ভারতীয়	৩০০	২ বা ২ হইতে বেশী
২। ফ্লোরিডা, জর্জিয়া সাগর দ্বীপ মিসরের প্রথম শ্রেণীর	২০০	১½—১¾
৩। মিশরের সাধারণ লম্বা আঁশওয়ালা আপ ল্যাণ্ড	৭০	১⅛—১½
পেরুবিয়ান	৬০	১—১½
৪। পূর্ব আফ্রিকান্ ব্রাজিলিয়ান্	৫০	১—১⅛
আমেরিকান্ আপ ল্যাণ্ড রাশিয়ান্, পশ্চিম আফ্রিকান্, এসিয়া মাইনরের	৪০	১—১⅕
৫। ভারতীয় চীনা	৩০	¾—১

সংশ্লিষ্ট তালিকা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীতে ৩০ হইতে ৩০০ নম্বর অবধি স্তা কাটার উপযোগী নানা জাতের কাপাস আছে। উহাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাপাস সাগর-দ্বীপের ; মধ্যম মিশরের এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট ভারতবর্ষের। স্তা কাটাই শিল্পের অধঃপতনের সাথে সাথেই ভারতীয় কাপাসের অবস্থাও খারাপ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি অবশ্য লাঙ্কাশায়ারেয় মিলগুলির জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট উচ্চশ্রেণীর কাপাস উৎপাদনের ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছেন ; ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে,আজকাল ৪০—৫০ নম্বরের স্তার উপযোগী কয়েক জাতের কাপাস সৃষ্টি হইয়াছে। কাপাসের নম্বরের এই মাপ কলে কাটার হিসাবে নির্ধারিত হইয়াছে। হাতে কাটার হিসাবে এই কাপাসেই ১০০ বা তাহার চাইতেও বেশী স্তা কাটা সম্ভবপর। সাধারণ কাপাস দিয়া উচ্চ

শ্রেণীর সূতা কাটিবার শক্তি তকলি ও চরকার মত সাধারণ যন্ত্রে আছে। কলে এইরূপ ব্যাপার ঘটে না। নরম আঁশে বেশী নম্বরের সূতা কাটিবার ক্ষমতা মেশিনে কিছু পরিমাণে কমাইয়া দেয়। তকলী কাটুনী আপন আঙুলের সাহায্যে যে কাজ করে, কল তাহাই অন্ধের মত সম্পাদন করে। এইজন্য অত্যন্ত সাধারন রকমের ব্যাপারেও ইহাতে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়। ফলে কোমল আঁশ যদি পিষ্ট হইয়া যায়, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

ভারতীয় কাপাসের গুণানুযায়ী শ্রেণী বিভাগ :—

বেশী নম্বরের মিহি সূতার পক্ষে ভারতীয় কাপাসের নিম্নলিখিত জাতিগুলি প্রধান।—

প্রদেশ	কাপাস	আঁশের দৈর্ঘ্য ইঞ্চিতে	সূতার নম্বর
মধ্য প্রদেশ	বনী—৯০ } ” —৬৩ }	১	৪১—৫১
	” —৩১ } ” —৩০১ }	১	৪০—৪৪
	ভেরাম—৪৩৮ } ” —৪৩৪ }	১	৩৪—৩৭
গুজরাট	ব্রোচ দেশী ৮	$\frac{২৪}{২৫}$	৩০
	সুরতী ১০২৭	০.৯৬	৩২
	এ, এল, এফ		
সিন্ধু	সিন্ধু-আমেরিকান এ, টী	$\frac{৭}{৮}$ হইতে ১	২৪—৩২
পাঞ্জাব	পাঞ্জাব আমেরিকান ২৮৯ এফ	১ হইতে ১$\frac{১}{৩২}$	৩০—৪০
মাদ্রাজ	জয়বন্ত	১	২৬—৩০
	কম্বোডিয়া	$\frac{৭}{৮}$ হইতে ১	২৪—৩০
	করুংগন্নী	$\frac{৭}{৮}$	২৪

এই কাপাস ছাড়া অন্ধ্রের মিহি সুতার পক্ষে কাজে লাগার মত কোণ্ডপর্তী কাপাসও হিসাবে ধরা যাইতে পারে।

দেব কাপাস ঃ—দোষ গুণ ঃ—

ভারতবর্ষের প্রায় সব প্রদেশেই কাপাসের চাষ চলিতে পারে। কিন্তু যেখানে ক্ষেত-কাপাস জন্মে না। সেখানে দেব কাপাস লাগানোই ঠিক হইবে। দেব কাপাসের গাছে যথেষ্ট কাপাস জন্মে।

১৯৩৫-এর ১৪ই ডিসেম্বরের 'হরিজনে' সতীশবাবুর "গ্রাম সেবার পথে" নামক একটি প্রবন্ধে দেব কাপাস সম্পর্কিত আলোচনা প্রকাশিত হয়। তাহার খানিকটা এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

বেঙ্গল রিলিফ কমিটি আত্রাই থানার আশপাশে কাপড়ের চাহিদা মিটাইবার প্রচার শুরু করিয়াছেন। সেখানকার বাঁশবেরিয়া গ্রামের জন্য আবশ্যক কাপাস সম্পর্কে তিনি লিখিতেছেন।

"এই অঞ্চলে ওয়ার্ধা কাপাস ও অন্যান্য ভারতীয় কাপাস চাষের পরীক্ষা করা হইয়াছে। বৃষ্টি বেশী হওয়ার ফলে কাপাস গাছ বাড়িয়া খুব উঁচু এবং উহার পাতাও খুব ভারী হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাতে মোটেই ফল ধরে নাই। অথচ সেখানে দেব কাপাসের বেশ ভালো ফসল পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি দেব কাপাসের গাছের প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। ৯ ফুট ঘেরের একটি গাছে এই বার চার হাজার গুটি ধরিয়াছে। ৪০টি গুটি হইতে ৩ তোলা কাপাস বাহির হইয়াছে এবং তাহাতে ১ তোলা তুলা পাওয়া গিয়াছে। মোট ৪০০০ গুটি হইতে ১০০ তোলা অর্থাৎ ১$\frac{১}{৪}$ সের তুলা মিলিবে। দেব কাপাস প্রতি বৎসর দুইবার ফসল জন্মে। অর্থাৎ এক বৎসরে একটি গাছে ২$\frac{১}{২}$ সের তুলা পাওয়া যাইবে। এই হিসাব যে খাঁটি তাহা গাছটির মালিকই আমাকে লিখিয়াছেন।

"এই গ্রামে ইহার চাইতেও বড় এবং অধিক তুলা উৎপাদক গাছ আছে। এক বিঘা জমিতে ১৪৪টি গাছ লাগানো যাইতে পারে; ফলে প্রতি বৎসর ১৪৪৲ টাকা আয় হইতে পারে।

"অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, আটজন লোকের একটি পরিবারের জন্য ৯৬ গজ বা লোক পিছু ১২ গজ খাদির প্রয়োজন। একজন গৃহস্থের শিশুর সংখ্যা ৩ বলিয়া ধরা হয়। উপরোক্ত পরিমাণ কাপড়ের জন্য জন প্রতি প্রতিবৎসর ১$\frac{১}{২}$ সের তুলা দরকার অর্থাৎ পাঁচটি দেব কাপাস গাছ হইতে ঐরূপ একটি পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে। কিন্তু এক একটি গাছের বাড় পূর্ণ হইতে প্রায় তিন বৎসর লাগিবে, কাজেই তাড়াতাড়ি প্রয়োজন অনুযায়ী

কাপাস পাইতে হইলে প্রত্যেক পরিবারের বাড়ীর আঙিনায় ৬।৭টি গাছ লাগাইলেই কাপাসের চাহিদা পূর্ণ হইয়া যাইবে।

এই দিক দিয়া দেব কাপাস বেশ কার্যকর প্রমাণিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, পোকায় উহার খুব ক্ষতি করে। ঐ কাপাসে পোকার ঘর তৈয়ারী হয়—ফলে ঢেঁড়ি খারাপ হইয়া যায়। পাশেই কাপাশের ক্ষেত থাকিলে এই পোকা দ্বারা তাহার ও ক্ষতি ঘটিবার আশঙ্কা থাকে। প্রায়ই কাপাসের ফসল উঠিবার পরে গরমের দিন আসিলে ক্ষেতের পোকা খোরাকের সন্ধানে দেব কাপাসের গাছে চড়াও হয় এবং পরবর্তী বর্ষা অবধি সেখানেই বাসা বাঁধিয়া আপন জীবিকা নির্বাহ করে। এই হিসাবে দেব কাপাস ও কারবোনিকা ইত্যাদি চির-সবুজ জগতের তুলনায় কাপাসের ফসলী জাতগুলী উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সর্বত্র ফসলী কাপাসের প্রচার হওয়ার ইহাও একটি বড় কারণ। ফসল উঠার পরে ফসলী কাপাসের গাছ তুলিয়া ফেলা হয়; ফলে জমির শক্তি অনর্থক নষ্ট হয় না এবং উক্ত গাছের উপর নির্ভরশীল পোকাগুলি চৈত্র বৈশাখের কড়া রৌদ্রে মরিয়া যায়। ঠাণ্ডা হওয়ায় ছায়ার আড়ালে এই পোকা বৃদ্ধি পায়। কাপাসের পোকা উহার বীজের মধ্যে ঢুকিয়া যায়; সুতরাং সেই অনিষ্টের হাত হইতে বাঁচানোর জন্য বীজগুলিও বৈশাখের কড়া রৌদ্রে বিছাইয়া শুকাইয়া লওয়া উচিত। কড়া রৌদ্রে বীজের উৎপাদন শক্তি কমে না, কাজেই রোদ দেওয়ায় কোন ক্ষতি নাই। ভারত-গভর্ণমেণ্ট বিহারে দেব কাপাস লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। তথাপি প্রেয়োজন অনুযায়ী আপন আপন বাড়ীর আঙিনায় দেব কাপাসের গাছ লাগানোতে কোন ক্ষতি নেই। পোকা দূর করার পক্ষে কেরোসিন ও সাবান জলের মসলা বেশ ভালো কাজ দেয়।*

---

* এখানে কয়েকটি পোকা নিবারক মসলার উল্লেখ করা হইল। (১) **কেরোসিন অবদ্রব** (Emulsion)

সাবান—/।০ কেরোসিন ২ গ্যালন (প্রায় ৭ সের) জল—(গরম) ১ গ্যালন (প্রায় ৩½ সের); জল—৩০ গ্যালন (১০৫ সের) প্রথমে সাবান গরম জলে গলাইয়া পরে উহাতে কেরোসিন মিশাইতে হইবে। এই মিশ্রণটি প্রায় আধঘণ্টা কাল নাড়িতে হয়। গাছের উপর ছড়ানোর সময় ইহা দশগুণ জলে মিলাইয়া লইতে হইবে।

অন্ধ্র প্রদেশের কার্পাস ঃ—

কোণ্ডাগট্টি নামক কাপাস গঞ্জাম ও ভিজাগাপট্টম জেলার পাহাড়ের ঢালু জমিতে এবং বুরাদা পট্টি বা গুড্ডিপট্টি কাপাস সমতল ক্ষেত্রে মাঠে উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত নাম উহাদের জন্মস্থান হইতে পাওয়া। (কোণ্ডা=পাহাড়ী, বুরাদা=মাঠ, পট্টি=কাপাস) এই সমস্ত কাপাসের আঁশ আধ ইঞ্চি অর্থাৎ ছোট ছোট; অথচ উহা রেশমের মত খুব মোলায়েম। ইহা দিয়া অন্ধ্রের নিপুণ কাটুনীরা ৪০ হইতে ১২০ নং সূতাও কাটে।

সাবান অবদ্রব ঃ—

সাবান—½ সের। জল—১ গ্যালন (৩½ সের)।

সাবানে ঠিক মত গুলিবার জন্য গরমজল ব্যবহার করা প্রয়োজন।

(৩) তামাকের জল ঃ—

½ সের তামাকের গুঁড়া ২ গ্যালন জলে ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পরে কাপড় ছাঁকিয়া আরো ২ গ্যালন জল উহাতে মিশাইতে হইবে। কীট নাশক ঔষধ প্রয়োগের সময় প্রথমে ২।১টি গাছের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। মসলা বেশী তেজস্কর হইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ধরা পড়িবে। অভিজ্ঞতা লাভ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ ঔষধই ব্যবহার করা ভালো।

এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত প্রতিকার সমূহ ও মনে রাখা উচিত। (১) হাতে বাছাই করিয়া ফেলা—কীট, শামুক, ইত্যাদির বেলায় এই প্রথা খাটে। (২) পোকা পোড়াইয়া ফেলা—টুকড়া লাগানো অর্থাৎ পাতা কোঁকড়ানো পোকার বেলায় ইহা চলে। (৩) ডাল কাটিয়া ফেলা ও বিশেষতঃ যে সব ক্ষেত্রে অর্বুদ হইয়াছে তাহা পোড়াইয়া ফেলা। (৪) বন্যা বহাইয়া দেওয়া—মাটিতে যে সব পোকা লুকাইয়া থাকে, তাহাদের বেলায় এই নিয়ম। (৫) লাফানো ফড়িং ধরার জন্য জাল ব্যবহার (৬) দড়ি টানিয়া পোকা তাড়াইয়া দেওয়া। (৭) আলোর ফাঁদ পাতা—বিশেষ ভাবে নিশাচর পোকার জন্য। অনেক পোকা আলোতে আকৃষ্ট হয়। রেড়িরতেল মিশানো জলের গামলার মধ্যে একটা বাতি বসাইলেই এই কাজ চলে। পোকাগুলি জলে পড়িলে আর উঠিতে পারেনা। (৮) পোকার উৎপাতের হাত হইতে বাঁচানেরে জন্য কাপাস গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঢেঁড়স গাছ লাগানো যাইতে পারে। পোকাগুলি তখন কাপাস ছাড়িয়া ঢেঁড়স গাছে যায়।

ভারতের আরো অনেক জাতের কাপাসে ৬ হইতে ১৮-২০ নম্বর পর্যন্ত স্থতা কাটা যাইতে পারে।

মোটা সূতার উপযোগী ভারী কাপাস ঃ—

যে ভারী কাপাস দিয়া বেশী নম্বরের স্থতা কাটা যায়, তাহা মোটা স্থতা কাটার কাজে লাগানো আর্থিক দৃষ্টিতে বেশী ক্ষতিকারক নয়। উচ্চ শ্রেণীর কাপাসের কাপড় অধিক টেকসই হয়। কাজেই ভারী কাপাস খরিদে যে অতিরিক্ত পয়সা খরচ করিতে হয়, উহার ক্ষতি পূরণ কাপড়ের দীর্ঘ স্থায়িত্ব হইতেই হইয়া যায়। মোটরের চাকা, জাহাজের পাল, টাইপরাইটারের ফিতা সেলাইয়ের স্থতা এবং অনুরূপ অন্যান্য জিনিষ তৈরীর জন্য সর্বাধিক ভারী কাপাস কাজে লাগানো হয়, কারণ, এই সমস্ত জিনিষের উপর বেশী টানা হেঁচড়া পড়ে, সেইজন্য উহাদের খুব মজবুত হওয়া দরকার। অন্যান্য স্থতী দ্রব্য অপেক্ষা এই সমস্ত জিনিষের মূল্য বেশী বটে, কিন্তু দীর্ঘ স্থায়ীত্বের হিসাবে এই মূল্য বেশী নয়।

হাল্‌কা কাপাসে এই সমস্ত দ্রব্য তৈরী হইলে উহারা সস্তা হইতে পারে কিন্তু লোকের উহা পছন্দ হইবে না, কারণ তাড়াতাড়ি কাটিয়া যায় বলিয়া অবশেষে উহার মূল্য বেশীই পড়িবে। ইহা কেবল অনুমান নয়, পক্ষান্তরে পরীক্ষিত সত্য।

বাংলার লম্বা অাঁশের তুলার চাষ ঃ—

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও রংপুরের উঁচু জমি লম্বা অাঁশের কাপাসের পক্ষে উপযোগী। নিম্ন লিখিত জাতের কাপাসের চাষ পরীক্ষা করিয়া ভালো ফল পাওয়া গিয়াছে।

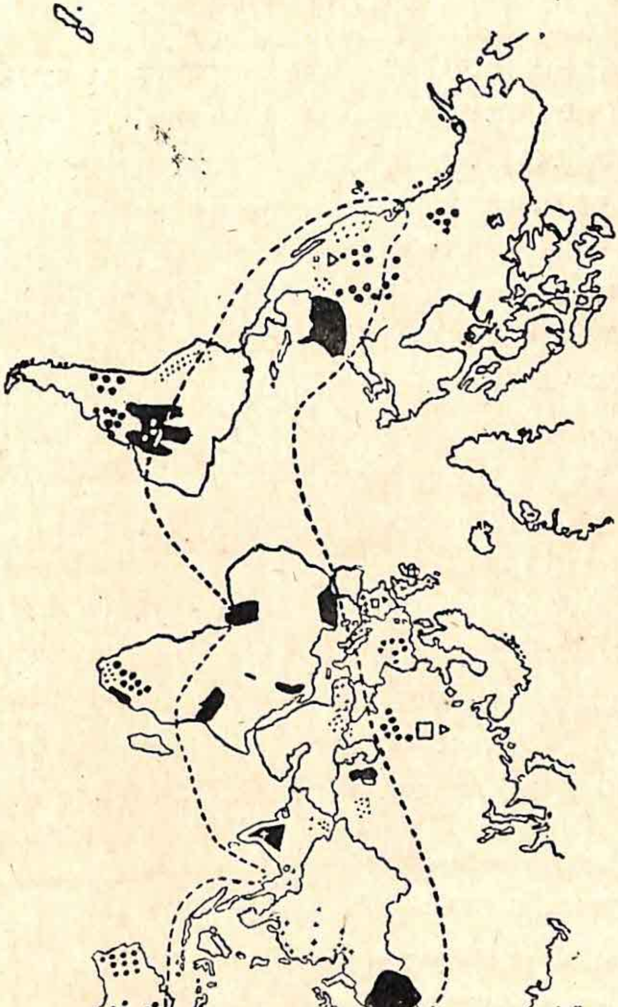
(১) **ঢাকা পাঞ্জাব আমেরিকান** ২৮৯ এফ (২) **ঢাকা কম্বোডিয়া** (২) **ঢাকা পারবনি** (৪) **ঢাকা বুড়ি** (৫) **ঢাকা ধারোয়ার** (৬) **ঢাকা কাম্পালা**। মিসরী কাপাস প্রথম বৎসর ভালো হইলেও বাংলার আর্দ্র আবহাওয়ায় **anthracreose** রোগ জন্মে। এই সমস্ত কাপাস মে মাসের মাঝা মাঝি হইতে জুনের শেষ অবধি বোনা চলিতে পারে। প্রতি লাইনে ৪ ফুট ও প্রতি গাছে ৩ ফুট ফাঁক থাকা উচিত। আস্ত জাতের চীনা বাদাম লাইনগুলির মধ্যে লাগাইলে গাছগুলি আগাছার কবল হইতে বাঁচে, চাষীর ও আয় বাড়ে।

বার্ষিক উৎপাদন

সারা দুনিয়ার আঁশ			সারা দুনিয়ার তুলা		এসিয়ার তুলা	
আঁশ	চিহ্ন	ওজন লাখ টন	মহাদেশ	ওজন লাখ টন	দেশ	ওজন লাখ টন
কাপাস	▬	৬০—৬৫	আমেরিকা	৩৬	চীন	৯
উল— মেরিনো ভেড়ার ছাগলের	০০০ ...	১৬	এসিয়া	২০	ভারত	৭·২৫
	O	৯—১০	আফ্রিকা	৪	রুশিয়া	৩·২৫
তিসি	[]	৬·৭৫	ইউরোপ	৩	অন্যান্য দেশ	·৫
রেয়ন	△	৩·৫	অষ্ট্রেলিয়া	২		
রেশম	+++	·৩৭৫				
মোট		১০১·৬২৫	মোট	৬৫	মোট	২০

পৃথিবীর মানচিত্র

(বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপাদিত আঁশের স্থান নির্দেশ করিয়া)



চতুর্থ অধ্যায়

কাপাসের প্রস্তুতি

চয়ন ঃ— প্রাত্যকেরই উচিত নিজের জন্য আবশ্যক ১২ গজ কাপড়ের উপযোগী ভালো জাতের সুপক্ক ১০।১২ সের আন্দাজ কাপাস যতদূর সম্ভব নিজে নিজেই ক্ষেত হইতে তুলিয়া আনা। এই ভাবে তোলার উদ্দেশ্য, উৎকৃষ্ট ও পরিষ্কার কাপাস, সংগ্রহ করা। কাঁচা পোকা-লাগা, দাগী, পাতাযুক্ত ও মাটি মিশানো কাপাস খারাপ গন্য করা উচিত। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারের তোলা কাপাস ভালো। প্রথম-তোলা কাপাস আধ-ফোটা এবং শেষ তোলা কাপাস ফাটা-ফুটা হইয়া থাকে। কাজেই সময় মতো সাবধান না হইলে কাপাসের দোষ বশতঃ পরিবর্তী সমস্ত প্রক্রিয়ার অনর্থের সৃষ্টি হয়। শুরুতেই দোষ দূর করা সহজ, পরে কিন্তু উহা মুশকিল হইয়া পড়ে। ফলে পরিশ্রম বাড়ে এবং অনর্থক সময় নষ্ট হয়। ইহার পরেও ইচ্ছামত কাজ চলে না। শেষে পরিষ্কার করিলে আঁশের লোকসান হয় অথচ সময় মত কাজ করিলে পরবর্তী কাজ সহজ হইয়া যায়।

গাছ হইতে কাপাস তোলার কাজ প্রাতে করা উচিত। ভোরে শিশির থাকায় কাপাসের গায়ে পাতা লাগে না। তখন টানা-হেঁচড়া হইলেও আশ খারাপ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কারণ, শিশিরে ভিজিয়া আঁশ মজবুত হইয়া যায়। ইহা ছাড়া প্রাতে চয়ন কারীর রৌদ্রে কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

অসাবধানে তোলা কাপাসে শতকরা ৫ হইতে ১০ ভাগ অবধি আবর্জনাদি বাহির হয়।

গুদাম ভরতি করণ :— (Storage)

আদ্রতা, আগুণ ও ইঁদুর কাপাসের স্বাভাবিক শত্রু। উহারা ক্ষতি করিতে না পারে এরূপ সুরক্ষিত স্থানে কাপাস রাখা সঙ্গত।

টাট্‌কা তুলিয়া আনা কাপাস তাড়াতাড়ি ঠাসিয়া ঠাসিয়া ভরা উচিত নয়। তখন উহা কিছুটা ভিজা থাকে, কাজেই ঐ ভাবে ভরিয়া রাখিলে খারাপ হইয়া যাওয়ার ভয় আছে। সুতরাং চয়ন করা কাপাস কিছু দিন খোলা বাতাসে রাখিয়া দেওয়া উচিত।

তাজা কাপাসের বীজ ছাড়ানো উচিত নয়, কারণ কাপাস তোলার পরেও উহার পাকার কাজ চলিতে থাকে এবং তখন ও বীজ পুষ্ট ও আঁশ শুষ্ক, ফাঁপা ও শক্ত হইতে থাকে। এই কাজ ২।৩ সপ্তাহে পূর্ণ হয়।

পরিষ্করণ :—

কাপাস যদি বাছিয়া তোলা না হইয়া থাকে, তবে প্রথমে উহা ভালো রকমে সাফ করিয়া লওয়া দরকার। যেমন শস্য পিষিবার আগে উহা বাছিয়া লইতে হয়, সেইরূপ কাপাসও সাফ করিয়া লওয়া উচিত। পরিষ্করণেয় আগে কাপাস ঝাড়া উচিত নয়। এরূপ করিলে পাতা ভাঙিয়া উহার কুচি আঁশের সহিত আট্‌কাইয়া যাইবে এবং বড় বড় পাতা বাছাইয়ের বদলে তখন ছোট ছোট কুচি বাছিতে হইবে। কাপাস সাফাইয়ের জায়গা এমন হওয়া উচিত যেন হাতে তুলিয়া লওয়া কাপসের উপর আলো পড়ে অথচ চোখের উপর সোজা আলো না লাগে, নইলে, চোখের অনিষ্ট ঘটিবে। বাছাই করার সময় কাপাস যেন হাতের কাছে রাখা হয় যাহাতে উহা উঠাইবার জন্য বারে বারে ঝুঁকিতে না হয়। এই কাজের জন্য আসন গাড়িয়া বসা ভালো। এই ভাবে বসিলে নিজের সামনে খুব কাছে কাপাস রাখা যাইতে পারে। পেটের কাছে হাটু ঠেকাইয়া (অর্থাৎ উট্‌কা উট্‌কি) বসা ঠিক নয়। ইহাতে পিঠ, মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় ও পেট চাপিয়া বসে। পেটে চাপ লাগিলে হজমে গোলমাল হইতে পারে আর মেরুদণ্ড বাঁকিলে স্নায়ু দুর্বল হয়। পরিষ্করণের জন্য কাপাসের গাদা (স্তুপ) হইতে অল্পপরিমাণে কাপাস লইয়া প্রথমে দুই একবার উহা মাটির উপর ঝাড়িতে হইবে। ইহাতে ধূলা, বালি প্রভৃতি ভারী আবর্জনা নীচে পড়িয়া যাইবে। পরে উহা বাম হাতে তুলিয়া ডান হাতে সাফ করিতে হয়। প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে বাম হাতে কাপাসটি ঘুরাইতে হইবে। চোখ ও হাতের মাঝে ১০।১২ ইঞ্চি ব্যবধান রাখা দরকার। কাঁচা, পোকা-লাগা ও দাগী ঢেঁড়ি আল্‌গা করিয়া বাছিয়া লওয়া উচিত। ভিন্ন ভিন্ন জাতের কাপাস যেন পৃথক পৃথক রাখা হয়। পাতা ইত্যাদি আঁটিয়া থাকা আবর্জ্জনা চিমটি দিয়া বাছিয়া ফেলিতে হইবে এবং মাটি বা বালির কনা আঙুলের টোকা মারিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে। এই আবর্জনা যেন আবার সামনে রাখা কাপাসের গাদার উপর না পড়ে, সেদিকেও খেয়াল রাখা দরকার। বাছাইকরা আবর্জনা আপন ডান পাশে অথবা ডান জঙ্ঘার উপর রাখা সঙ্গত ; উহা উড়াইয়া চার দিকে ছড়াইয়া

দেওয়া উচিত নয়। পরিষ্কার করা কাপাস বাম দিকে সাফ-জায়গায় অথবা টুকরিতে রাখিতে হয়।

এই ভাবে বাছাই করা, ঝাড়া ও সাফকরা কাপাসের বীজ সহজে ছাড়ানো যাইতে পারে। পোকার খাওয়া বা পচা-গলা ঢেঁড়ি বাহির করিয়া ফেলায় ছড়ানোর সময় বীজ ভাঙ্গে না, ফলে তুলা এবং সময় দুই-ই বাঁচে। এইভাবে সুতা কাটার উপযোগী পরিষ্কার তুলা ও বুনিবার উপযোগী উৎকৃষ্ট বীজ পাওয়া যায়। কাটুনী ও কৃষক এইরূপ তুলা ও বীজ অধিক মূল্যে খরিদ করে। কাপাস সাফাই কারিণী সাধারণত এক ঘণ্টায় এক পাউণ্ড বা আধ সের কাপাস সাফ করে। সাফাইয়ের দ্রুতি কাপাসের আবর্জনার পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

বীজ ছাড়ানোর আগে ঃ—

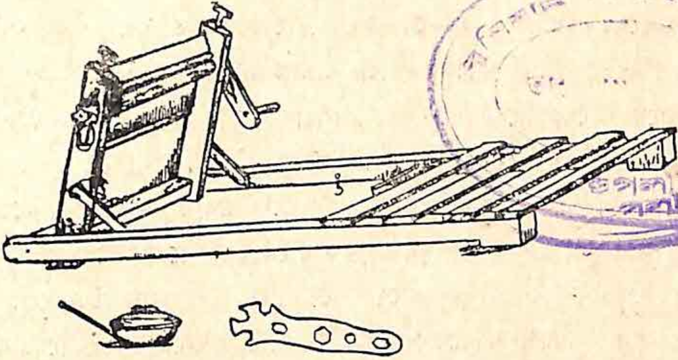
সাফাই হওয়ার পরে বীজ ছাড়ানোর আগে কাপাস রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। শুকানোর ফলে কাপাসের কোঁকড়ানো আঁশের আদ্রতা দূর হওয়ায় উহা খরে খরে হইয়া ছাড়িয়া পড়ে, বীজগুলিও শক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কড়া রৌদ্রে বেশীক্ষণ রাখিলে আঁশে ঔজ্জ্বল্য ও নম্যতা কমিয়া যায়। শুকানোর পরে ঘন-বুন খাটিয়ার উপর কাপাস বিছাইয়া এক খণ্ড বেত অথবা বাঁশের সরু ছড়ি দিয়া সন্তর্পণে উহা পিটানো উচিত। ইহাতে অবশিষ্ট আবর্জনা নীচে পড়িয়া যায় এবং কাপাস আল্‌গা হয়। কাপাস জোরে পিটান উচিত নয়, কারণ উহাতে আঁশ দুর্বল হইয়া যায়। এই ভাবে শুকানো ও পিটানো কাপাস সহজেই কেরকিতে ধরিয়া লয়, এবং কাজ তাড়াতাড়ি ও ভালো ভাবে সম্পন্ন হয়।

বীজ ছড়ানো ঃ—

উল্লিখিত কাজ সব শেষ হইলে কাপাসের বীজ ছাড়ানো উচিত। বীজ ছাড়ানোর উদ্দেশ্য—বীজ হইতে আঁশ পৃথক করা। বীজ ছাড়ানোর দুইটী যন্ত্র আছে ;—(১) শলাই-পাটা ; (২) হাত-কেরকি। শলাই পাটায় কেরকির চাইতে কাজ কম হয়। কিন্তু আঁশগুলি খুব যত্নের সহিত আল্‌গা হইয়া থাকে। মিহি সুতা কাটাই নামক অধ্যায়ে ইহার পরিচয় পরে দেওয়া হইয়াছে। এখানে কেবল হাত-কেরকিয় কাজ কিছু বর্ণনা করা গেল।

হাত কেরকি ঃ–

জোড়ালো প্যাচের সহায়তার পরস্পরের বিরুদ্ধে উল্‌টা দিকে ঘুরিতে পারে, হাত-কেরকিতে লোহা ও কাঠের এরূপ দুইটি বেলন দুই প্রাশে দুইটি খাম্বার মধ্যে বসানো থাকে। ইহার গঠন কৌশলের মধ্যে কতকগুলি যান্ত্রিক



জটিলতা থাকায় উহা চালানো তত সহজ নয়। ইহার কোন বিষয় আজ পর্যন্তও ঠিক মত বুঝা যায় নাই। কেরকির বিস্তারিত বিবরণ প্রদানের এখানে কোনও প্রয়োজন নাই, কাজেই বীজ ছাড়ানো সম্পর্কে কিছু বিশেষ বিশেষ কথা মাত্র এখানে লেখা হইতেছে।

বীজ ছাড়ানোর সময় সতর্কতার আবশ্যকতা ঃ—

বীজ ছাড়ানোর সময় থাম্বাগুলির ভিতর দিকে এক এক ইঞ্চি পরিমিত জায়গা ছাড়িয়া বেলন দুইটির ফাঁকের মধ্যে এমন ভাবে কাপাস ভরিতে হয় যেন খাম্বার গর্তের ভিতর বীজ ঢুকিয়া কেরকির চলন চাপ করিয়া না তোলে। কাপাসের জন্য আড়াআড়ি টান টান করিয়া বেলনের সম্পুর্ণ দৈর্ঘ্য অবধি ভরিয়া দিতে হয়, কিন্তু উহা যেন এক ভাবে ও অল্প অল্প করিয়া ঢুকিতে থাকে। আর বীজ যেন আপনা আপনি ছুটিয়া যায়। বীজ যদি ঠিক মত না ছোটে, তবে প্রয়োজন অনুসারে, খিল বা গোঁজ ঠুকিয়া অথবা প্যাচ থাকিলে তাহা কষিয়া লোহার শলাকা ও কাঠের বেলনের মধ্যস্থ ব্যবধান ঠিক করিয়া লইতে হয়। কাপাস বেশী দিলে অথবা অন্য কোন কারণে বীজ না ছুটিলে বা কেরকি ভারী চালে ঘুরিলে উহা একটু উল্‌টা ঘুরাইয়া কাপাস বাহির করিয়া লওয়ার পরে আবার ছাড়ানো সুরু করিতে হয়। বেলনের খাঁজে শলাকার ধারা ঠিক মত চলিতেছে কিনা, সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। তুলা উত্তমরূপে টানার উদ্দেশ্য

বেলনটি কিছু খর খরে আর শলাকাটি ছ-পল বা আটপল রাখিতে হয়। বীজ ভালো ভাবে ছাড়ানোর জন্য বেলনের উপর শলাকাটি যেন কেরকি-চালকের দি'ক মুখ করিয়া লাগানো থাকে। শলাকার উপর কাঠের একটা পটি দেওয়া থাকে, নহিলে শলাকার গায়ে তুলা জড়াইতে থাকে এবং তাহা বারে বারে খুলিতে যথেষ্ট সময় লাগে। ফলে বীজ ছড়ানোর দ্রুতি কমে এবং কেরকি চালকও বিরক্ত হয়। কাজেই ইহাকে সামান্য ব্যাপার মনে করা উচিন নয়। এই ভাবে বেলনের নীচের দিকে উহার সমান চওড়া ও বেশ লম্বা একখানা পাতলা তক্তা বা কাপড়ের পর্দা উহার সহিত সাঁটিয়া লাগাইতে হয়। ইহা লাগানোর অর্থ এই যে, তুলা যেন আবার বেলনের তলায় ফিরিয়া আসিতে না পারে, আর তুলা ও বীজ যেন পৃথক পৃথক থাকে, পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া না যায়। কেরকি যেন হাল্কা ভাবে চলিতে পারে, সেই জন্য উহা বেশী কষা উচিত নয়। অনুরূপ কারণে বেলনের উভয় পাশের খাঁজে এবং বেলনের মাথায় চুদোর প্যাচের দাঁতালো জোড়-চাকায় (helical tooth gear) তেল দেওয়া প্রয়োজন। বাতাসে আদ্রতা থাকিলে কাপাস ও কেরকি উভয়ই গরম করিয়া লওয়া উচিত।

বীজ ছড়ানোর দ্রুতি ঃ—

একটি উত্তম হাত কেরকির সাহায্যে একজন সুনিপুণ ব্যক্তি প্রতি ঘণ্টায় দুই আড়াই সের কাপাসের বীজ ছাড়াইতে পারে। (৮০ তোলায় সের—৪০ সেরে মণ) কাপাসের জাতের উপর ছাড়ানোর দ্রুতি অনেকটা নির্ভরশীল।

ধুনাই ঃ—

বীজ ছাড়ানোর পরে ধুননের কাজ। টাট্কা ছাড়ানো তুলা ধুনিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট। তুলা চাপ লাগা থাকিলে সামান্য রৌদ্রে ১০।১৫ মিনিট শুকাইয়া পিটিলেই উহা খুলিয়া যাইবে। ধুননের আগে তুলার মধ্যে হইতে ভাঙা বীজ পাতা ও আবর্জনা ইত্যাদি বাছাই করিয়া লওয়া উচিত।

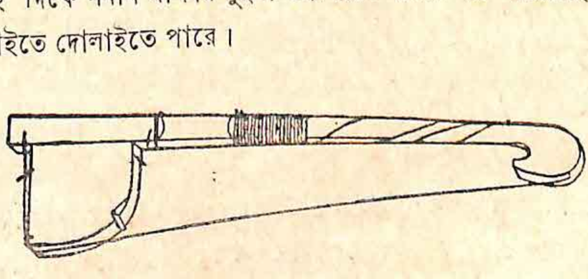
ধুনকির রকম ঃ—

ধুনন অর্থাৎ আলুথালু ভাবে জড়ানো আঁশখুলিয়া সিধা সমান্তরাল ও এক রকম করা। এই কাজের দুইটি যন্ত্র—(১) ধুনকি ও (২) ধনুক।

বিবরণ মিহি স্থতার অধ্যায়ে পরে দেওয়া হইবে। ধুনকি আবার কয়েক ধরণের হইলেও উহার তিনটি বিশেষ রকম আছে—(১) বড় (২) মাঝারি ও (৩) হাত ধুনকি। বড় ধুনকি পেশাদার ধুনুরীর কাজে আসে। উহা দিয়া সে লেপ তোষকে ভরার তুলা ধোনে। এই ধুনকি স্থতা কাটার তুলা ধোনার পক্ষে ঠিক নয়। সেই কাজের জন্য মাঝারি ধুনকি উপযুক্ত। কিন্তু এই দুই রকম ধুনকই ওজনে ভারী, কাজেই ইহাদের হাতে তুলিয়া ধুনা যায় না। এই জন্য জোড়া ধনুকে ইহাদের লটকাইয়া ধুনাই করিতে হয়। এই সমস্ত ধুনকির বেলায় উহাদের আকার অনুপাতে তাঁত এবং অনুরূপ মোটা হাতল প্রয়োজন হয়। বড় ধুনকি স্থতা কাটার কাজের পক্ষে অনুকূল নহে, এবং মাঝারি ধুনকির জন্যও অবলম্বন দরকার। কাজেই এই দুইটি ধুনকির বিষয় এখানে আলোচনার প্রয়োজন নাই। হাত-ধুনকি ছোট ও আরামপ্রদ, এবং ভালো কাজ দেয়। এই জন্য উহার কিছু বিবরণ এখানে লেখা হইতেছে।

হাত-ধুনকি

না—লটকাইয়া হাতে ধরিয়া চালানো হয় বলিয়া এই যন্ত্রের নাম হাত-ধুনকি। ইহার দৈর্ঘ্য ২ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং প্রস্থ পাখার দিকে ৮ ইঞ্চি, (তন্মধ্যে ডাঁট ১২ ইঞ্চি এবং পাখার সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ৬১ ইঞ্চি)আর আগার মাথার দিকে ৩১ ইঞ্চি। ইহার বেধ ৩/৪ ইঞ্চি। পিছনে গোড়ার দিকে ১১ ইঞ্চি ডাঁট বাদ দিয়া পরে ৬ ইঞ্চি পরিমিত স্থান জুড়িয়া পাখা। তার পরে ১১ ইঞ্চি ডাঁট এবং উহার সামনের ৫ ইঞ্চি মুঠ থাকে। মুঠের পরে মাথা হইতে ঘাড় অবধি ডাঁটটি কিছু পরিমাণে মোচাকৃতি হইয়া যায়। হাত-ধুনকির মোট ওজন ৬০ হইতে ৭০ তোলা অবধি অর্থাৎ ১২ হইতে ১৪ ছটাক পর্যন্ত হইয়া থাকে। মুঠ এরূপ জায়গায় থাকে যাহাতে ধুনকির উভয় পাশে সমান ওজন হয়। ফলে ধুনকির ওজন দুই দিকে সমান থাকায় ধুনুরী উহা হাতে ধরিয়া অল্প আয়াসেই যে দিকে খুসি হেলাইতে দোলাইতে পারে।



তাঁতঃ—

ছাগলের আঁত বা পশুর পাছা হইতে তাঁত তৈরী হয়। আঁত হইতে তৈরী তাঁত অধিক মজবুত ও সমান হইয়া থাকে। মিহি সুতার তুলা ধুননের জন্য সরু তাঁত লওয়া উচিত। সরু তাঁতে কম্পন খুব বেশী হয়, ফলে তুলা ভালো ধুনাই হয়। হাত-ধুনকিতে সাধারণত ৩২ নম্বরের সুতার উপযুক্ত ধুনন হইতে পারে। ৫ হইতে ১০ নম্বর সুতার উপযোগী ধূনাইয়ের নিমিত্ত চারতারী তাঁত চলিতে পারে। পাঁচ বা ততোধিক তারের তাঁত হাত ধুনকির কাজে লাগে না।

এক ইঞ্চিতে যতটা তাঁত সমান্তরাল ভাবে পাশাপাশি রাখা যায়, তাহাই তাঁতের নম্বর বুঝিতে হইবে। "তিন-তারী" বলিতে তাঁতের পুরুত্ব বুঝা যায় না। "তিন তারীর" অর্থ তে হরা অর্থাৎ তিন লহর। তিন তারী তাঁত ২৮ নম্বরেরও হইতে পারে, আবার ৩২ নম্বরেরও। তাঁত যত বেশী তারের এবং উচু নম্বরের হইবে, ততই ভালো। ২৮ নম্বরের তাঁতের পুরুত্ব $\frac{১}{২৮}$ ইঞ্চি। সাধারণ তিন তাঁত $\frac{১}{৩২}$ ইঞ্চি, চার তারী $\frac{৩}{৬৪}$ ইঞ্চি এবং পাঁচ বা ছয়তারী তাঁত $\frac{২}{৩২}$ ইঞ্চি মোটা থাকে ;

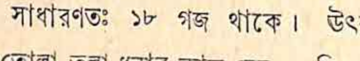
তাঁত উল্‌টা পাকানো থাকে, কাজেই তাঁতের উপর ডান দিকে (ঘড়ির কাঁটার মতো) উহা জড়ানো দরকার যাহাতে উহার পাক খুলিতে না পারে।

তাঁতের বাণ্ডিল সাধারণতঃ ১৮ গজ থাকে। উৎকৃষ্ট তাঁত ফুট প্রতি কম পক্ষে ৯—১০ তোলা তুলা ধুনার কাজ দেয়। কিন্তু এই পরিমাণে মাত্রা নির্ভর করে তুলার জাত, তাঁতের শ্রেণী ও নম্বর, ভিজা বা শুকনা হওয়া এবং সর্বশেষ ধুনুরীর নিপুণতা ইত্যাদি ব্যাপারের উপর।

ধুনকির হাতল বা গোটীলা ঃ—

তেঁতুল, শিশু, বাবলা ইত্যাদি গাছের ভিতরকার লাল রংয়ের সার দিয়া হাতল তৈরী হয়। নইলে, শীঘ্র নষ্ট হইয়া উহা তাঁত খারাপ করিয়া দেয়।

গোটীলার আকৃতি শিশুদের খেলার মুঠের মতন। হাতলের গুলির ঘের ৩ ইঞ্চি ও মুঠের ঘের থাকে ১$\frac{১}{৩}$ ইঞ্চি। গুলির কিনারায় বাহিরের উভয় পার্শ্ব



কিছুটা গোলাল এবং উহার উচ্চতা $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি। গুলি যদি মুঠের সমকোণ করিয়া তৈরী হয়, তবে প্রত্যেকটি আঘাতের সাথে সাথে উহা, তাঁতে আট্‌কাইয়া যাইবে

এবং তাড়াতাড়ি বাহির হইবে না। ধারে বেশী গোল হইলে তাঁত হইতে গুলি ফস্কাইয়া যাইবে আর আঘাতও ঠিক মতো লাগিবে না। হাতলের ওজন ৫ তোলা পর্যন্ত রাখা যাইতে পারে।

"কাঁকর" :—

পাখার বেধের উপরে লাগানো চামড়ার পট্টিকে কাঁকর বলে। এই পট্টি খঞ্জনি, তবলা, খোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রে লাগানো চামড়ার মতো অর্থাৎ ছাগলের চামড়া হইতে মাংস ও পশম ইত্যাদি ছাড়াইয়া সাফ করিয়া এবং উহা টান করিয়া রোদে শুকাইয়া এই পট্টি তৈরী হয়। এই কাঁকর-পট্টি পাখার বেধেরই সমান অর্থাৎ ৩/৪ ইঞ্চি চওড়া এবং উহা লম্বায় ৮ ইঞ্চি থাকে। প্রায় ৩ ইঞ্চি পট্টি ভিতরের দিকে মুড়িয়া দেওয়া হয়। পাখার কোণের ১ ইঞ্চি নীচে যে ছিদ্র থাকে, তাহার মধ্যে তাঁতের একটা টুকরা দোহারা জড়াইয়া কষিয়া দেওয়া হয়। এই টুকরার ফাঁকে কাঁকরের একটি মাথা লাগাইয়া পট্টিটি তলা হইতে উপরের দিকে সাঁটিয়া পাখার গোলাকৃতি অংশের মধ্য অবধি নেওয়া হয় ১ ১/৪—১ ১/৩ ইঞ্চি লম্বা একটি বাঁশের গোল খিলের উপর হইতে এবং পাখার গায়ের ছিদ্রে বসানো আর একটি খিলের উভয় মাথার পিছন দিক দিয়া মুঠের বাম পার্শ্বে ১/৩ ইঞ্চি নীচে পাখার সংলগ্ন ডাঁটের ছিদ্রে পরানো দোহারা তাঁতের ফাঁদে পট্টিটি আটকানোর ফলে উহা টান হইয়া থাকে। ছাদের মধ্যে ছোট মতন একটা খিল ঢুকাইয়া উহা পাকাইয়া কষানো হয়, ফলে কাঁকরটি বেশ ভালো ভাবে টান থাকে। কাঁকর বাঁধিবার সময় কিছুটা ভিজাইয়া লইলে উহা পাখার গায়ে চাপিয়া বসে।

কাঁকরের উপযোগিতা দুইটি। উহা তাঁতকে বাঁচায় কাঠের ঘর্ষণ হইতে আর কাঠকে তাঁতের আঘাত হইতে ইহা ছাড়া আত্মা বা জিভকে চাপিয়া রাখা এবং শব্দ সৃষ্টি করাও উহার কাজ। আওয়াজের দ্বারা তাঁত টান না ঢিলা অর্থাৎ কাঁপন ঠিক হইতেছে কিনা, তাহা বুঝা যায়।

শির পট্টি :—

ধুনকির মাথার উপরে যে চামড়ার পট্টি লাগানো থাকে, উহার কাজ তাঁত ও কাঠকে পরস্পরের ঘর্ষণ হইতে বাঁচানো। শির পট্টি দিয়া আওয়াজ বাহির করার আবশ্যকতা নাই বটে, কিন্তু যথেষ্ট টেকসই হওয়া প্রয়োজন, কাজেই,

পাকা চামড়ায় উহা তৈরী হয়। ধুনকির উপর পট্টিটি কিন্তু ধুনরীর লাগাইতে হয় না। যে ধুনকি তৈরি করে, সেই উহা লাগাইয়া দেয়। তাঁতে পাক উল্টা থাকে, কাজেই ধুনকির উপর তাঁতটি ডাইনে জড়াইতে হয় অর্থাৎ সেইজন্য শিরপট্টিও ডাইন দিকে জড়াইয়া লাগানো হয়।

জিভ্ বা আত্মা ঃ—

ইহা দুই বা এক সুত মোটা, ১ ইঞ্চি × ১½ ইঞ্চি মাপের **"কাঁকর"** বা ঐ জাতীয় অন্য কোন পদার্থের একটি ছোট মতন টুকরা। ইহার সাহায্যে পাখা ও কাঁকরের মাঝে ফাঁপ সৃষ্টি করা হয়। এই ফাঁপের অস্তিত্ব বশতঃ কাঁকর ও তাঁত হইতে সংগীতের মত ধ্বনি জন্মিয়া থাকে। জিভটি যত মোটা হইবে এবং যে জায়গায় লাগানো থাকিবে, সেই অনুযায়ী ফাপ বেশী বা কম হইবে। পাখায় তাঁত চড়ানোর পরে, পাখার গোলত্বের উপরিস্থ কাঁকরের সহিত যেখানে উহার প্রথম সংযোগ, সেই জায়গার সন্নিকটে কাঁকরের তলে জিভ্টি লাগাইতে হয় অর্থাৎ যেখানে জিভ্টা লাগানো হইবে, কাঁকরের সেই অংশ এবং চাপানো তাঁতের মধ্যে কিছু ফাঁক রাখা দরকার। ফলে, তাঁতে কম্পন শুরু হইলেই কাঁকরও কাঁপিতে থাকিবে এবং উহা হইতে সুরযুক্ত আওয়াজ বাহির হইতে থাকিবে। আত্মা চলিয়া গেলে মানুষ যেমন শবে পরিণত হয়, সেইরূপ জিভ না থাকিলে ধুনাকিও শব হইয়া যায়। এই জন্য জিভকে আত্মা বলা হয়। যতক্ষণ তাঁতে কম্পন থাকে, ততক্ষণ ধুনাই ভালো হয়। কাজেই কম্পন সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁতে টান এবং কাঁকর কষা থাকা উচিত। কাঁকর বা তাঁত ভিজা থাকিলে আওয়াজ ঠিক মত বাহির হইবে না। সুতরাং ধুনাই শুরু করার আগে প্রয়োজন হইলে ধুনকি রৌদ্রে রাখিয়া বা আগুনের আঁচে শুকাইয়া লইতে হয়। এই জন্য ধুননের পক্ষে বর্ষাকাল উপযোগী নহে।

ধুন্কিতে তাঁত চড়ানো ঃ—

তাঁত চড়াইবার সময় প্রথমে ধুনকির পাখাটি নিজের সামনে কাছে রাখিয়া ডাঁটটি বাম পায়ে চাপিয়া ধরিতে হয়। নাইলে, তাঁত টান করিয়া চড়ানোর সময় ধুনকি উপরের দিকে উঠিয়া যাইবে। পরে, পাখা অবধি পৌছিতে পারে এরূপ লম্বা তাঁত ডাঁট হইতে বাহির করিয়া ধুনকির

ঘাড়ের খিলটির ভিতর দিক হইতে শির পট্টির উপর দিয়া পাখার উপর দিকের কোণ পর্যন্ত কিছুটা ব্যবধান রাখিয়া লইয়া আসিতে হয় এবং উহার শেষ প্রান্তে তুলার ছোট একটি গুলি বাঁধিয়া পাখার পিছন দিককার তাঁতের ফাঁদের মধ্যে উহা আট্‌কাইয়া দিতে হয়। ফাঁদের সহিত গিঁঠ লাগাইয়া তাঁতটি পাকাপাকি ভাবে বাঁধা উচিত নয়। ফাঁদের মধ্যে আটকানো তাঁত একটি শলাকার উপর লইয়া এবং দুই হাতের বুড়া আঙ্গুল দুইটি পাখার কোণের কিনারায় রাখিয়া অন্যান্য আঙ্গুলগুলি দিয়া উহা টানিতে হইবে এবং তাঁতটি পাখার কোণের উপরে আনিয়া শলাকাটি বাহির করিয়া লইতে হইবে। চড়ানোর সময় তাঁত বেশী টান হইলে ডাঁটের উপরে গুটানো অংশের খানিকটা সামনে সরাইয়া উহা একটু ঢিলা করিয়া লওয়া দরকার; আর ঢিলা থাকিলে গুটানোর দিকে পিছনে সরাইয়া উহা টান করিতে হয়। তাঁত যদি সামান্য ঢিলা থাকে, তবে খুঁটি বলিয়া পরিচিত ফাঁদে-লাগানো খিলের সাহায্যে প্যাঁচ কষিয়া এই ঢিলাভাব দূর করা যাইতে পারে।

ধুনাই ঘর ঃ—

ধুনাই-ঘরের ভিতরে বাতাসের ঝাপটা যেন আসে অথচ ঘরটি যথেষ্ট আলো থাকা প্রয়োজন। ঘরে কাচের জানালার ব্যবস্থা না হইলেও অন্ততঃ চালে কাঁচের ছোট ছোট গবাক্ষ লাগানো দরকার। ধুনরীর বারে বারে ঘরে আসা যাওয়া করিতে হইলে দরজার ভিতর দিকে এমন ছিটকিনি লাগানো প্রয়োজন যাহা বাহির হইতেও খোলা যাইতে পারে। ধুনাই-ঘরটি যেন এরূপ থাকে যে, উহা ঝাড়িয়া মুছিয়া সাফ করা যাইতে পারে। বাঁশের বাখারির বেড়া হইলে উহার ফাঁকে ফাঁকে আঁশ ঢুকিয়া যায় এবং পরে তাহা সাফ করা মুশকিল হয়।

চাটাই ঃ—

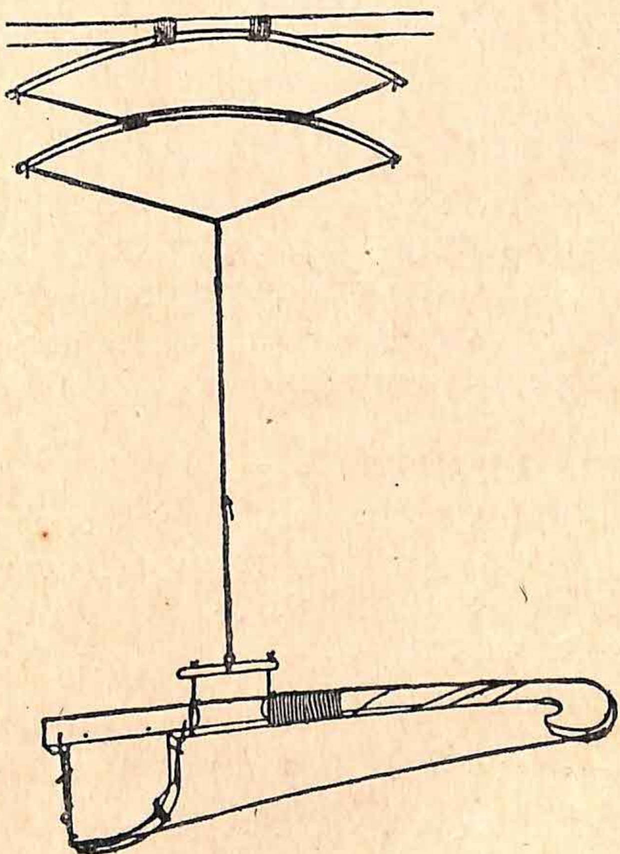
মুঞ্জ ইত্যাদি ঘাসের গোলাকার শরকাঠিতেই চাটাই ভালো হয়। কারণ, উহার ভিতর দিয়া পাতার কুচি ও অন্যান্য আবর্জনাদি সহজেই গলিয়া যায় এবং কাজ হইয়া গেলে উহা গুটাইয়া রাখা যাইতে পারে। বাঁশের পাতলা বাতার চাটাই হইলেও কাজ চলিতে পারে বটে, কিন্তু উহার ছিদ্র যেন চওড়া না হয়; তাহা হইলে, আবর্জনার সাথে সাথে তুলা ও নীচে পড়িয়া যাইবে। হাত-

ধুনকির পক্ষে ৪½ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া চাটাই ঠিক হয়। চাটাইর কাজ কেবল আবর্জনা চালা-ই নয়, ইহাতে ছোট ছোট আঁশ ও পৃথক করা যায়। ধুনের সময় লম্বা আশগুলি উপরে থাকিয়া সামনের দিকে আসিয়া জড় হয় আর ছোট ছোট আঁশ পিছনে থাকিয়া তলায় পড়িয়া যায়। তলায় পড়িয়া যাওয়া এই ছোট ছোট অব্যবহার্য আঁশগুলিকে চাপই আপন ছিদ্রের ভিতর দিয়া নীচে গলাইয়া দেয় আর অপেক্ষাকৃত ভালো ও লম্বা আঁশগুলি বাকী থাকে। সম মাপের লম্বা আঁশের সুতার তুলনায় একত্রে মিশানো ছোট বড় আঁশে কাটা সুতা অনেক দুর্বল। একই জাতের মধ্যেও ছোট বড় আঁশের পক্কতা কম বেশী হইয়া থাকে। পুরা পাকা আঁশের সহিত আধ-পাকা আঁশ মিলাইয়া সুতা কাটা হয় বটে, কিন্তু ঐ সুতায় শক্তি থাকে না। এই জন্য লম্বা আঁশের সুতার তুলনায় এই সুতা দুর্বল। চাটাইয়ের নীচে-পড়া বাজে আঁশ হইতে সুতা কাটা হইলে উহা ফুসফুসে, নরম ও অসমান হইবে। হাতের সা ারণ সুতার তুলনায় মিলের সুত অধিকতর সমান ও মজবুত, কারণ উহা ধুনানো ও পেঁজানো তুলা হইতে কাটা হয়। হাতে-কাটাইয়ে পেঁজানোর কাজ বেশীর ভাগ করাই হয় না, আর যেখানেও বা করা হয়, সেখানেও উহা ধুনাইয়ের আগেই করা হয়। চাটাই কালো রঙের হইলে উহার উপর ফাপাই পরীক্ষা করা সহজ। ধুনের সময় চাটাইর সন্মুখ ভাগ যেন ভূমি হইতে ৩-৪ ইঞ্চি উপরে উঠাইয়া রাখা হয়, যাহাতে আবর্জনার নীচে পড়ার মতন জায়গা মিলিতে পারে। চাটাইয়ের তলায় পড়া আঁশ তোষকে ভরার বা কাগজ তৈরির কাজে লাগানো যায়।

লটকন ঃ—

যে জোড়া-ধনুকের সহিত ধুনকি লটকানো হয়, তাহার নাম লটকন। ধুনকি কেবল এক নাগাড়ে হাতে উঠাইয়া রাখা এবং আগে পিছে ও উপর নীচে নাড়ানো মুশকিল। লটকনের সাহায্যে এই কাজ সহজ হইয়া যায়। এক সাথে-জোড়া দুইটি ধনুকে ঝুলানো এবং স্থিতিস্থাপকতা –এই উভয় কাজই হয়। কাজেই তুলা লইবার জন্য তাঁত যখন চাটাইয়ের পাশে আনিতে হয়, সেই সময় কিছুটা চাপ দিতেই ধুনকি নীচে নামিয়া আসে এবং তুলা ছাড়ইবার সময় চাপ কমাইলেই না উঠিলেও আপনা আপনি উপরে উঠিয়া যায়। উপর নীচে উঠানো নামানোর এই সঞ্চালন ক্রিয়া ধুনাইয়ের প্রথম হইতে শেষ অবধি করিতে হয়, সুতরাং সর্বদা লটকনের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

লটকনের ধনুকের জন্য একেবারে নয়া ও সবুজ বাঁশের আড়াই—তিন ফুট লম্বা মোটা বাতা লউন। উহা সহজে বাঁক না হইলে জলে ভিজাইয়া লইবেন। দড়ি বাঁধিবার জন্য উহার দুই মাথার উভয় পার্শ্বে এমন ভাবে খাঁজ কাটুন যেন যাহাতে দড়িটি সরিয়া না যাইতে পারে। পরে বাতাটিতে এই ভাবে দড়ি বাঁধুন যেন বাতাটি সম্পূর্ণ সিধা থাকে, বাঁকা হইতে না পায়। এই ভাবে দুইটি ধনুক তৈরী করুন। প্রথম ধনুকটির ছিলার সহিত দ্বিতীয় ধনুকটি বাতার উভয় প্রান্ত হইতে এক তৃতীয়াংশ ব্যবধানে দুই জায়গায় দৃঢ়ভাবে বাঁধুন। ঠিক মধ্যস্থলে একই জায়গায় বাঁধিলে ধনুকটি ঘুরিতে থাকিবে। লটকনটি ও ধুনাই ঘরের ছাদে দুই জায়গায় শক্ত করিয়া বাঁধিতে হইবে। ধনুকের মাঝখানে বাঁধা



দড়িটি ঝুলিয়া যেন চাটাইয়ের পিছন দিকে গিয়া না পড়ে এই ভাবে লটকনটি বাঁধিতে হইবে।

হাত-ধুনকির জন্য লটকনের প্রয়োজন নাই আর সেই কারণেই উহা হাত-ধুনকি নামে পরিচিত। তথাপি ধুনন শেখা কালে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধুনাই হইলে লটকনের আবশ্যক বলিয়া গণ্য করা যায়। সাধারণ লোক দুই এক সপ্তাহ অভ্যাস করিলেই—লটকনের সাহায্য ছাড়াই নিজের দৈনিন্দিন ধুনাই করিয়া হইতে পারে।

পিঁড়িঃ—

পিঁড়ির উপর বসিয়া ধুনায় সুবিধা আছে। পিঁড়িটা একটু উঁচা হইলে ধুনকিও সহজে উঁচা রাখা যাইতে পারে; ফলে মাটির সহিত পাখার টক্কর লাগার ভয় থাকে না। পিঁড়ির উপর বসিলে কাপড় ময়লা হয় না আর পাও খানিকটা সোজা থাকে।

আসন বা বসিবার ভঙ্গিঃ—

ধুননের জন্য উট্‌কা-উট্‌কি বসা উচিত। এই ভাবে বসিলে বাম হাত হাঁটুর সাহায্য পায়। বাম হাতে ধুনকি উঠাইয়া রাখিতে হয়, কাজেই উহার ঠেকনার প্রয়োজন। লটকন থাকিলেও ইহার আবশ্যকতা থাকেই। বাম বগল বা বাক হাঁটুর উপর ঠেকাইয়া ধুনকি ধরা প্রয়োজন, ইহাতে হাতের ভার হাঁটু ও কাঁধের উপর ভাগাভাগি হওয়ায় ক্লান্তি কম হয়।

চালানোর সময় ধুনকীর ধরণ-রীতিঃ—

ধুনকির ডাঁটাটি ভূমির সমান্তরালে এবং পাখাটি ধুনকীর দিকে তেরচা করিয়া রাখিতে হয় অর্থাৎ ভূমি ও পাখার মধ্যে ৪৫° কোণ থাকা দরকার। লটকানোর সময় লটকনের দড়ি দুইটি ডাঁটের সামনের দিক হইতে পিছনে নিয়া মুখের খিলে আটকাইলে ধুনকি তেরচা হইয়া যায়। হাতে তুলিয়া ধুননের সময় উহা তেরচা করিয়া ঘুরাইয়া লইতে হয়।

আঘাতের স্থানঃ—

গোটিলার ছোট মুঠের সম্মুখস্থ তাঁতের গায়ে লাগানো দরকার যাহাতে

ধুনকির ব্যালেন্স্ (সামঞ্জস্য) নষ্ট না হইতে পারে। গোটীলার এক ভাবের আঘাতে তাঁত নরম হইয়া ছিড়িয়া যায়। মুঠের সামনে তাঁতের গায়ে চোট লাগাইলে তাঁতের ছোট মতন টুকরাই ছিঁড়িবে আর তাঁতও বেশী খরচ হইবে না।

ধুনকির নড়ন-চড়ন ঃ—

ধুননের সময় ধুনকির একটানা "নড়ন-চড়ন" হইতে থাকে। ইহা দোহারা গতি। **নড়ন** অর্থাৎ ঘড়ির দোলনের মত আগে পিছে নড়া এবং **চড়ন** অর্থাৎ নড়ার সাথে সাথে সামনে চলা। তাঁতে আঘাত কালে গোটীলা ডাঁট ও তাঁতের উপর পিঠে থাকিলে তাঁত হইতে ছাড়া পাওয়া আঁশ ঠিক ডাঁটের উপর পড়িয়া সেখানেই আটকাইয়া যায়। ইহাতে ধুননে বাধা পড়ে। অথচ "নড়নের" ফলে আঁশ ডাটের উপর না পড়িয়া উহার তলায় সম্মুখ দিকে বাহির হইয়া যায়। "নড়নের" এই কাজ। 'চড়ন' বা "চলনের" দ্বারা ধুনা তুলা অ-ধুনা তুলা হইতে পৃথক করা যায় যাহাতে ধুনা ও অ-ধুনা তুলা মিশিয়া যাইতে না পারে। ফলে, সমস্ত আশ একের পর এক ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে খুলিয়া সিধা করা যায়। এই প্রক্রিয়াটি আপনা আপনি তালে তালে হইয়া থাকে। তালে তালে হওয়ার পর লোকে ধুনাইয়ের কাজে উত্যক্ত হয় না এবং উহাতে রসও পায়।

তাঁতের দোহারা গতি ঃ—

ধুনকির উপর চড়ানো তাঁতে আঘাতের ফলে উহাতে দোহারা গতি সৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমত, উহা নিজেই পাক খায়, আর, দ্বিতীয়ত, উহাতে কাঁপন জন্মায়। পাকানো দড়িতে সর্বদাই পাক খোলার প্রতিক্রিয়া ঘটে, ফলে উহা পাক খায়। এই অবস্থায় আঘাত-লাগা তাঁত তুলার মধ্যে ঢুকাইতেই তাহাতে আঁশ জড়াইয়া যায়। কিন্তু কাঁপনের ফলে জড়িত আঁশ তাঁত হইতে ছুটিয়া আসে। তাঁতের সহিত আঁশ লেপটানোর বিশেষ কারণ আঁশের পাক ও তাঁতের কর্কশতা। তাঁতের বদলে ধাতুর তারে শিমূল তুলা ধুনিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহা তারের সঙ্গে মোটেই জড়ায় না।

ধুননের সময় তাঁত আপন আবর্তন বশতঃ তুলার মধ্য হইতে আঁশগুলি টানিয়া লয়; কম্পনের ফলে আঁশগুলি নাচিতে নাচিতে খুলিতে ও আলগা হইতে থাকে আর গোটীলার আঘাতে ও পিঞ্জনের (ধুনকি) নড়নে উহারা

তাঁত হইতে ছুটিয়া সামনে গিয়া পড়ে। এই ভাবে ধুনাইয়ের এই সমস্ত ক্রিয়ার ফলে কুঞ্চিত ও জট-পাকানো আঁশের পাক কমিয়া যাওয়ায় আঁশগুলি খুলিয়া বেশ সিধা ও সমান্তরাল হইয়া যায়।

ধুননের আদর্শ (সব চেয়ে উঁচু শ্রেণী) ঃ–

এ কথা বলা আবশ্যক যে, গোটীলা দিয়া তাঁত ফেটাইয়া আঁশগুলি খুলিয়া ফেলাই ধোনাইয়ে আদর্শ পদ্ধতি নয়। আমরা সেই পদ্ধতিকেই আদর্শ বলিতে পারি যাহাতে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ বিদ্যমান।—

(১) আঁশগুলি উত্তমরূপে খোলা অর্থাৎ প্রত্যেকটি আঁশ আলগা আলগা করিয়া দেওয়া।

(২) বীজ বা বীজের টুকরা, ছিল্‌কা, পাতা, বালি, ধূলা ইত্যাদি আবর্জনা মোটেই থাকিতে না দেওয়া।

(৩) খুব ছোট ছোট ও খারাপ আঁশগুলি বাহির করিয়া ফেলা।

(৪) এই ভাবে খোলা, সাফ ও বাছাই-করা আঁশগুলি পাশাপাশি সমান্তরাল করিয়া সাজানো।

(৫) ধুনা আঁশ দিয়া ঠিক মাপের ও সমান আকারের পাঁজ তৈরী করা।

মিলে কলের সাহায্যে এই ধরণের উৎকৃষ্ট ধুনাই করা হয়। হাতে সুতা কাটার পক্ষে এইরূপে বেশ ভালো ধুনন হইয়া থাকে। মিহি সুতা কাটাই অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া হইবে।

সাধারণ ধুনাই ঃ—

এখানে আমরা সাধারণ ধুনাইয়ের আলোচনা করিতেছি, কাজেই এখন যাহা কিছু লেখা হইতেছে, তাহা এই বিষয় সম্পর্কেই বুঝিতে হইবে।

সাধারণ ধুনাইয়ের তিনটি পদ্ধতি। (১) উড়ানো (২) ঝটকানো ও (৩) ফুলানো।

উড়ানো অর্থাৎ তাঁত ফেটাইয়া তুলা সামনের দিকে উড়াইতে উড়াইতে ধুনানো। ধুন করেরা প্রায়ই এই রীতিতেই ধুনাই করে। ইহাতে তুলা গোলাকারে উড়িতে থাকে, ফলে তুলা সমান ভাবে ও ভালো রকমে ধুনা যায় না। ধুনা তুলার সাথে অ-ধুনা তুলাও মিশিয়া যায়। ধুননের সময় অ-ধুনা তুলার গোলার সাথে খোলা আঁশের উপর ও তাঁতের আঘাত পড়ায় সেই আঁশ-

গুলি ছিঁড়িয়া যায় এবং তাহাদের ফুট্কি অর্থাৎ সূক্ষ্ম গুট্লি তৈরী হইতে থাকে। ধুনা ও অ-ধুনা তুলার এই খিঁচুড়ি সেই ভাবেই রাখা হইলে ধুনাইয়ের উদ্দেশ্যই-নষ্ট হইয়া যায়। ইহা ছাড়া এই উড়ানোর পদ্ধতিতে আঁশগুলি এক নাগাড়ে উড়িতেই থাকে, ফলে তুলার অপচয় যথেষ্ট হয় অথচ আঁশও ভালো করিয়া খোলে না।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঝটকানোর। ঝটকানো অর্থাৎ তাঁতের আঘাতে তুলার আঁশ পিছন দিকে বৃষ্টির পসলার মতো গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির আকারে ছড়ানো। এই পদ্ধতিতে প্রথমে তুলা সামনের দিকে উড়াইয়া ফেটানো হয় এইং পরে উহা ঝটকানো হয় (অর্থাৎ তাঁত হেঁচকা টান দেওয়া হয়।) এই পদ্ধতিতে তুলার প্রত্যেকটি আঁশ আলগা হইয়া যায়, কিন্তু আঁশগুলি পিছনে ঝটকানোর জন্য তাঁতের আঘাত এত জোরে লাগাইতে হয় যে, উহাতে ফুটকি না পড়িয়াই পারে না। টান-টান তাঁতের জোরালো আঘাত ফুটকি পড়ার একটি কারণ। অপর কারণ এই যে, পিছে ঝটকানোর জন্য খুব কম আঁশই তাঁতে তুলিতে হয়। ইহা ছাড়া এই পদ্ধতিতে ধুননে সময় ও খুব কম লাগে।

প্রথম পদ্ধতিতে ধুনাই জল্দি হইলেও উহা কাঁচা ও অসমাপ্ত থাকে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ধুনাই দেরীতে এবং ফুটকি যুক্ত হয়। এই কারণে এই দুইটি পদ্ধতি-ই ঠিক নয়।

তৃতীয় পদ্ধতি ফুলানোর। ফুলানো অর্থাৎ তুলা ধীরে ধীরে খুলিতে থাকে। ফুলের কলি ফুটিবার পরে যেরূপ উহার প্রত্যেকটি পাপড়ি আল্গা আল্গা হইয়া যায়। সেইরূপ এই পদ্ধতিতে আঁশের কলিগুলি ফুলিয়া যায়; সেই জন্য ইহাকে ফুলানো বলা হইয়াছে তুলা যেরূপ কম বেশী পরিমাণে চাপা থাকে, সেই অনুযায়ী উহা ফুলানোর জন্য কম বেশী সময়ও পরিশ্রম লাগে। টাটকা ছাড়ানো তুলা সর্বাধিক উত্তম। উহা খুব কম সময়ে এবং সহজে ফুলিয়া যায়। জিনিং ফ্যাক্টরীর (তুলার বীজ ছড়ানো কারখানার) গাঁইটের তুলা ধুননের পক্ষে ভালো। কিন্তু প্রেসে চাপা গাঁইটের তুলার ধুনাই সহজে নিষ্পন্ন হয় না। উহা প্রথমে ছড়ি দিয়া খুব পিটাইয়া ছাড়াইয়া লইতে হয়। জিনিং মেসিনের বেলনের ব্যাস বড় থাকার দরুণ উহার মধ্য দিয়া আঁশ সিধা হইয়া বাহির হয়। এই ব্যাপার হাত কেরাকির সরু বেলনে ঘটেনা। ইহাতে আঁশ খানিকটা গোলালো হইয়া লেপটাইয়া যায়। এই জন্য হাত কেরাকির তুলার তুলনায় মেশিনে ছড়ানো তুলা ধুনন সহজ।

ফুলানোর পদ্ধতিতে উড়ানের কাজ মোটেই থাকে না। একথা বলা

যাইতে পারে। তুলার গাদার পিছন ভাগ হইতে ধুনাই শুরু করিতে হয়। তাঁত তুলার ভিতরে ঢুকানো হয় না, উপরে উপরেই চালাইতে হয়। এই ভাবে এক একটি পরত খুলিয়া সামনের দিকে উলটাইয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় পরত খোলার জন্য আবার পিছনের দিকে ধুনা শুরু করা হয়। এই ভাবে ধুননের ফলে ধুনকির নড়ন-চড়ান তুলার তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং সমস্ত আঁশ এই তরঙ্গের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া উপর নীচে চলিয়া সামনের দিকে সরিয়া যায়। এই ভাবে তালে তালে তরঙ্গিতে ধুনাইয়ের ফলে তুলা ধীরে ধীরে খুলিতে খুলিতে ফুলিতে থাকে। তরঙ্গ শীষের আঁশ সর্বাধিক ফুলানো থাকে। পিছনের লহরীর তুলনায় উহার সামনের লহরী অধিকতর খোলা ও ফুলা থাকে। এই ভাবে অল্প ক্ষণের মধ্যেই খোলা ও ফুলা আঁশের ছোট মতন একটা বাঁধ তৈরী হইয়া যায়। তুলার উপরকার সব লহরী ইহার উপর টক্কর খাইয়া ফুটিতে থাকে এবং ইহার সহিত মিলাইয়া যায়। ইহাকে ফাঁপ বলা হয়। খানিক ফাঁপ তৈরী হওয়ার পরে এবং তুলার লহরীর সহিত সেগুলি মিলিয়া গেলে ধুনকিটি আর পিছের দিকে না নিয়া উহা দিয়াই ফাঁপের মধ্য হইতে একটি লহরী উঠাইয়া ফাঁপের সামনে ধুনিতে ধুনিতে লইয়া যাইতে হয়। ইহার পরে আবার পিছন হইতে প্রথম বারের মত ধুনাই শুরু করা দরকার। তুলায় বা ফাঁপে যে লহরী তোলা হয়, তাহা তুলার পিছন হইতে এবং চাটাইয়ের সহিত ছোঁওয়াইয়া উপরে উঠাইতে ও ফাঁপে চড়াইতে হয়। ইহাতে লহরী সমূহের ফুলিবার ও ছড়াইবার সুযোগ মিলে, ফলে উহারা ক্রমশ ফুলিতে থাকে। তুলার সামনের দিক হইতে ধুনাই করিলে এই ব্যাপার ঘটে না। উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে ধুনাই করিলে সমস্ত তুলা সমান ভাবে ধুনা হয় এবং আঁশগুলি সিধা, খোলা ও একই রকমের হইয়া যায়। উহাতে গিঁট অথবা ফুটকি মোটেই থাকে না। এই পদ্ধতিতে ধুনিবার সময় তাঁতে তুলা খুব কম আটকায়। ইহাতে আবর্জনা পিছে পড়িয়া থাকে এবং পাতা, ধুলা ও ছোট ছোট আঁশ ইত্যাদি চাটাইয়ের ছেঁদার ফাঁক দিয়া তলায় পড়িয়া যায়। উড়ানোর পদ্ধতিতে আঁশ খানিকটা কোঁকড়াইয়া যায়, অথচ ফুলানোতে এই ব্যাপার ঘটে না। সেখানে বরং উহা অধিকতর সিধা হইয়া যায়। ঝটকানোতে আঁশের সেরূপ প্রবাহ সৃষ্টি হয় না, যাহা ফুলানোতে হয়। এখানে সমস্ত আঁশ এক দিকে বিছানো থাকে এবং তেড়া বাঁকা আঁশ ও খুব কমই থাকে। ইহাতে জলের প্রয়োজন নাই, কাজ বেশ ধীরে ধীরে ও শান্তির সহিত সম্পন্ন হয়।

ধুনার সময় তুলা চাটাইয়ের উপর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। উহা মাঝে মাঝে গুছাইয়া একত্র করা প্রয়োজন। একত্র করার সময় এই কথাটি মনে রাখা উচিত যে, আঁশের ঝোঁক বাহির হইবার দিকে। এই জন্য ছড়ানো তুলা চাটাইয়ের মাঝখানে ঠেলিয়া দেওয়া উচিত অথবা উভয় পাশের ফাঁপ তুলিয়া আনিয়া মধ্য স্থলে রাখিয়া দেওয়া প্রয়োজন।

ফুলানোর সময় চাটাইয়ের পিছন দিককার অংশে ধুননের জন্য কাঁচা তুলা, মাঝখানে অসম্পূর্ণ-ধুনা ফাঁপ ও উপরের দিকে পুরা ধুনা অর্থাৎ নিখুঁৎ ফাঁপ থাকে।

ধূননের জন্য এক সাথে অনেকখানি তুলা চাটাইয়ের উপয় লওয়া উচিত নয়, কারণ ইহাতে চাটাইয়ের উপরকার তুলা ছড়াইবার সুযোগ পায় না। চাটাইয়ের মাপ অনুযায়ী কম বা বেশী তুলা লওয়া উচিত। ৪॥ ফুট ×৩ ফুট মাপের চাটাইয়ের উপর ধুনিবার জন্য বেশী হইলে ৫ তোলা তুলা একেবারে লওয়া যাইতে পারে।

সুরাটের তুলার মত মোলায়েম ও লম্বা আঁশের তুলা হইলে আর তাহা ঠিক রীতিতে ধুনা হইলে কেবল একবারের ধুনাইতেও ভালো রকম ফাঁপ তৈরী হয়। কিন্তু রোজিয়ামের মতো কড়া তুলা দুইবার কখনো কখনো তিনবারও ধুনিতে হয়। একবারের ধুনাইয়েতে ইহা ঠিক ধুনা হয় না। একবার ধুনা তুলার ফাঁপ এই ভাবে উল্‌টাইয়া দিতে হয় যেন উপরের তুলা নীচে ও বাম দিকের তুলা ডান দিকে চলিয়া যায়। এই ভাবে দ্বিতীয় বার ধুনাই হইয়া যাওয়ার পর উহার পাঁজ তৈরী কর, উচিত।

ফাঁপ পরীক্ষা

ধুনাই ভালো হইল কিনা তাহা পরীক্ষার জন্য শলার মাথা দিয়া ফাপের খানিকটা উঠাইয়া লউন। যতটুকু তুলিতে চাহেন ততটুকুই যদি উঠিয়া আসে এবং উহার সাথে বেশী তুলা না উঠে। তবে তো ধুনাই ঠিক হইয়াছে মনে করিতে হইবে। তোলা তুলার গোলাটি আলোর সামনে ঝুলাইয়া দেখুন উহাতে যদি গিঁট ও ফুট্‌কি না দেখা যায় এবং আঁশগুল যদি সমান ভাবে ছড়ান থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে ধুনাই ভালো হইয়াছে। উৎকৃষ্ট ফাঁপের পাতলা পরত কাগজের উপর বিছাইলে কাগজের উপরে লেখা অক্ষর পড়িতে পারা যাইবে।

টান বা ঢিলা তাঁত ও উহার কম্পন ঃ—

তাঁতের দৈর্ঘ যত কম হয়, কম্পন ও ততই বেশী সৃষ্টি হয়। মাঝারি ধুনকির তুলনায় হাত-ধুনকি যে ভালো কাজ দেয়, উহার কারণ ইহাই। ঢিলা তাঁতের তুলনায় টান তাঁতে ধুনাই ভালো হয়, কারণ ইহাতে কম্পন বেশী হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁত যতই ছোট ও টান হইয়া থাকিবে, কাঁপনও ততই বেশী হইবে। তাঁতের টান চারগুন বাড়ানো হইলে কম্পন কেবল দ্বিগুণ বাড়ে। এই জন্য তাঁত ঢিলা রাখিলে ধুনা যাইবে না এবং আঁশও শীঘ্র এবং ভালো রকম আল্‌গা হইবে না। তাঁত বেশী টান রাখিলে কম্পন বেশী হইবে। ইহাতে তুলা তো ভালো ধুনা হইবে। কিন্তু ধুনিতে দেরী লাগিবে, গোটীলার আঘাত জোরে লাগাইতে হইবে এবং আঁশ ছিঁড়িয়া ফুট্‌কি পড়ার আশঙ্কা থাকিবে। কাজেই তাঁত বেশী টান ও বেশী ঢিলা রাখা উচিত নয়।

তাঁতের সঙ্গে তুলা কেন আটকায় ঃ—

ধুনিবার সময় তুলা কেন তাঁতের সঙ্গে লেপটাইয়া যায়, ইহার কয়েকটি কারণ থাকিতে পারে। তাঁত যদি গিঁঠ দেওয়া, ঢিলা, অথবা সেঁত সেঁতে খাত বিশিষ্ট বা ফেঁকড়া যুক্ত হয়, তুলা যদি কাঁচা বা ভিজা থাকে, আঘাত যদি খুব ধীরে লাগানো হয় ; তাঁত যদি বারে বারে তুলার মধ্য হইতে বাহির করিয়া না ছুটানো হয় ; ধুনা যদি তালে তালে সুরযুক্ত ও তরঙ্গায়িত না হয়, তবে তাঁতের সহিত তুলা আটকাইয়া যায়।

তাঁতের তত্ত্বাবধান ঃ—

বর্ষার দিনে তাঁত সেঁতে সেঁতে হইয়া যায়, ফলে উহাতে আটকাইয়া থাকে। তখন তাঁত ও তুলা উভয়ই আগুনের আঁচে শুকাইয়া লওয়া উচিত অথবা রৌদ্র থাকিলে রোদে রাখিয়া গরম করিয়া লওয়া দরকার। শুকনো তাঁতে তুলা লেপটায় না। ডাঁটের উপর গুটানো তাঁতে কাগজ জড়াইয়া রাখা উচিত যাহাতে উহার গায়ে ছাতা না পড়ে। কাজ শেষ হইয়া গেলে তাঁতটা কিছু ঢিলা করিয়া রাখা প্রয়োজন। টান হইয়া থাকিলে তাঁত দুর্বল হইয়া যায়। গোটীলার আঘাতে তাঁতের আঁশ খুলিয়া আসে এবং উহাতে তুলা আট্‌কাইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় তাঁতের গায়ে বাবলা, তেঁতুল বা অনুরূপ কোন গাছের সবুজ চিকণ পাতা উপর হইতে নীচের দিকে অর্থাৎ মাথা হইতে পাখার দিকে

দিকে ঘষা উচিত। উহাতে খোলা ফেঁকড়া বসিয়া যায় এবং তুলা আটকানো বন্ধ হইয়া থাকে। উল্‌টা দিকে অথবা উল্‌টা পালটা রগড়াইলে ফেঁকড়া বসে না। খুব কচি পাতা লওয়া উচিত নয় কারণ উহাতে চিকনাই কম আর জলও বেশী থাকে। পাতা রগড়ানোর পরে তাঁতটি দুই এক মিনিট শুকাইতে দিতে হয়।

তাঁতে আটকানো তুলা সহজে না ছুটিলে, কেহ কেহ উহা পাথার দিকে টানিয়া নেয়, অথচ উহা বেশী টানা যায় না বলিয়া মাঝখানেই উহার গুটলি পাকাইয়া যায়। ফলে, তাঁতের কম্পন বন্ধ হয় এবং ধুনাইতে একটি প্রবল বাধার সৃষ্টি হয়। কারণ গুটলির উপর তখন আরো তুলা আটকাইয়া থাকে। এই জন্য তাঁতে লেপটানো তুলা চিমটির সাহায্যে খুঁটিয় খুঁটিয়া এবং গোটীলার আঘাতে ফেটাইয়া ছাড়াইয়া লইতে হয়। টানিয়া টানিয়া গুটলি তৈরি করা কখনো উচিত নয়। তাঁতে আটকানো তুলা প্রথমে ছাড়াইয়া লইয়া পরে আবার ধুনা শুরু করা সঙ্গত।

তাঁতের যে জায়গায় গোটীলার ঘা পড়ে, সেইখানেই মুঠের সামনে উহা টুটিয়া যায়। কখনো কখনো পাথার কোনেও তাঁত ছিঁড়ে। এই কোনটি কতকটা গোলালো এবং উহার মধ্যে সামান্য খাঁজ কাটা থাকে। তাঁত খারাপ হইলে উহা কোথায় এবং কখন ছিঁড়িবে, তাহার কোন ঠিক ঠিকানা থাকে না। ছেঁড়া তাঁতের গিঁট বাঁধিয়া কাজে লাগানো যাইতে পারে না ; উহা ধুননের পক্ষে অব্যবহার্য্য। উহা ফাঁদ তৈরী করার জন্য কাজে লাগাইবার উপযুক্ত।

কেন ফুটকি পড়ে ?

অতিরিক্ত ধুনাই-ই ফুটকি পড়ার একমাত্র কারণ নয়, উহার আরও কতকগুলি কারণ আছে।—(১) পুরানো খারাপ তুলা ; আধা পাকা ; ছোট ; কড়া, নরম ; এবং ভিজা-শুকা আঁশের মিশ্রণ, তাঁতের নীচে কোথাও কোথাও ঘন এবং বিছানো তুলা ; খুব শুক্‌না তুলা ; (২) একই জায়গায় ধুনন অর্থাৎ ধুনা তুলা সামনে সরাইয়া পৃথক না করা এবং ধুনা ও অ-ধুনা আঁশে উপর বেশী আঘাত লাগা ; (৩) তাঁত খুব মোটা, কড়া ও অতিরিক্ত টান হওয়া ; (৪) জোরে ফেটাইয়া ঘা মারা ইত্যাদি।

ধুনানোর ঘাটতি ঃ

ধুনাইর সময় শতকরা ৮—১০ ভাগ তুলার অপচয় ঘটে। তুলা খুব খারাপ

হইলে শতকরা ১৫ ভাগ পর্যন্ত ঘাট্‌তি হয়। ভালো বাছাই করা সাফ তুলা হইতে শতকরা ৫ ভাগ ঘাট্‌তি ঘটে।

পাঁজ তৈরী করা ঃ—

ধুনানো তুলা ঠিক অমনি ধরিয়া কাটা যাইতে পারে না। কাজেই সুতা কাটার সুবিধার জন্য হাতের চিমটির মধ্যে আসিতে পারে তুলার এরূপ মোটা বাতি বানাইতে হয়। উহাকে পাঁজ বলে। ধুনাইয়ের পরে ফাঁপ তৈরী হইলেই উহা দিয়া পাঁজ বানাইয়া লওয়া উচিত। ফাঁপ অমনই পড়িয়া থাকিলে উহা হাওয়া হইতে অদ্রতা টানিয়া লয় এবং খানিক ক্ষণের মধ্যে ফুলা আঁশ আবারা এলোমেলো হইয়া নিজে নিজেই উলট্ পালট খাইয়া যায়।

পাঁজ বানানোর সরঞ্জাম তিনটি।—(১) পাঁজপিড়ি (২) হাতা ও (৩) পাঁজ কাঠি। পিঁড়ি অর্থাৎ ১$\frac{৩}{৪}$ ফুট×৮ ইঞ্চি×$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি মাপের একখানা তক্তা। উহার পাশের দিকের একটি কিনারা খানিকটা উঁচু করিয়া তোলা থাকে। পিঁড়ি ঢালু হইলে উহার উপর সহজে পাঁজ তৈরী করা যায়। হাতাটিও একখানা তক্তা। উহার মাপ ৬ ইঞ্চি ×৫$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি×$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। উহা ধরার জন্য একটি মুঠ লাগানো থাকে হাতের তালুর সাহায্যেও পাঁজ বানানো যাইতে পারে, কিন্তু ইহাতে পাঁজের সব জায়গায় সমান চাপ পড়ে না এবং পাঁজও তত পরিষ্কার হয় না এই কারণে হাতা রাখা প্রয়োজন। পাঁজ কাঠিটি প্রায় $\frac{১}{৬}$ ইঞ্চি ব্যাসের এক ফুট লম্বা একটা লোহা বা পিতলের শালাকায় তৈরী হইয়া থাকে। ধাতুর তৈরী বলিয়া উহা ঠাণ্ডা হওয়ায় তেড়চা হয় না এবং ধুনকিতে তাঁত চড়ানোর সময় উহা ভাঙ্গেও না। বাঁশের কাঠি তেড়া হয় এবং অল্প চাপেই ভাঙ্গিয়া যায়। কাঠির বেধ আঁশের দৈর্ঘ্য অনুসারে হইয়া থাকে। আঁশ যেন উহার চারিদিকে এক বারের বেশী না জড়াইতে পারে, উহা ততখানি মোটা হওয়া দরকার।

আঁশের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কাঠির ঘের কম হইলে কাঠির চারিদিকে আঁশ বেশী জড়াইয়া যায়, ফলে উহা সহজে বাহির হয় না, কাজেই সুতা কাটার অসুবিধা সৃষ্টি হয়। সাধারণত ভারতীয় কাপাসের আঁশ এক ইঞ্চির চাইতে বেশী লম্বা হয় না, কাজেই কাঠির বেধ অর্থাৎ ব্যাস $\frac{১}{৬}$ ইঞ্চিই যথেষ্ট। কাঠির এক মাথা খানিক মোটা রাখিয়া মাঝখান হইতে অপর মাথাটি ক্রমশঃ কিছুটা সরু থাকা দরকার। এই ঢল যত কম রাখা সম্ভব, তাহাই করিতে হয়, যাহাতে কাঠির

দুই মাথায় বেধে বেশী পার্থক্য না থাকে। মোচাকৃতি হইলে কাঠিটি পাঁজের ভিতর হইতে সহজেই বাহির হইয়া আসে। ইহাতে আঁশ ও সহজে তেরছা গোল হইয়া জড়াইয়া যায়।

পাঁজের মধ্যে আঁশগুলি তরছা গোল হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে আঁশের পাক পাঁজের ভিতরে ঢুকিতে পারে না। সিধা আঁশের এক মাথায় পাক দিলেই উহা অবিলম্বে অন্য মাথায় পৌছিয়া যায়, কিন্তু আঁশ তেরছা হইলে পাক অপর মাথায় পৌছিতে পারে না।

পাঁজ বনানোর আগে কাঠিটি ভালো করিয়া মুছিয়া লইতে হয় যাহাতে উহা ভিজা থাকার দরুণ অথবা উহার গায়ে ময়লা থাকার জন্য প্রথমকার দুই একটি পাঁজ খারাপ না হইয়া যায়।

পাঁজ বনানোর জন্য কাঠিটি বাম হাতে এবং হাতাটি ডান হাতে ধরা উচিত। তুলার ফাঁপ সামনে বা বাম দিকে রাখিতে হয়। ফাঁপ তুলা হইতে াম হাতে তুলিবেন না, কারণ সেই হাতে কাঠি থাকে বারে বারে ধরা ছাড়াতে সময় নষ্ট হয়, কাজেই এক আনা আন্দাজ তুলা ডান হাতের বুড়া আঙুল ও মধ্যমায় ধরিয়া তুলিয়া লইতে হয়। তোলার সময় বাকী সব ফাঁপ যাহাতে উঠিয়া না আসে, সে জন্য বাম হাতের কাঠি দিয়া উহা চাপিয়া রাখা দরকার। ফাঁপা তুলার এই টুকরা পাঁজ পিঁড়ির উপর সমান ভাবে ৭ ইঞ্চি× ৩½ ইঞ্চি চৌরস করিয়া বিছাইতে হয়। পরে উহার উপর কাঠিটি এমন ভাবে পাতিতে হয় যেন উহার সরু মাথাটি ডান দিকে থাকে। হাতাটি ডান হাতে লইয়া উহা কাঠির উপর চাপিয়া উপর দিক হইতে নীচের দিকে এমন ভাবে গড়াইতে হইবে যেন পাঁজ তৈরী হইয়া যায়। কাঠিটি পিঁড়ির গোড়ায় ভিতের কাছে আসিলেই উহা আবার তুলিয়া পিঁড়ির উপরের মাথায় রাখিয়া প্রথম বারের মতো চার পাঁচ বার হাতাটি গড়াইয়া পাঁজ বানাইতে হইবে। পাঁজ বানানোর সময় বাম বুড়া আঙুলের নখের সাহায্যে পাঁজের মুখ তৈরী করিতে পাঁজের ডান মাথার আঁশ যাহাতে বেশী বাহির হইয়া না থাকে, সেই উদ্দেশ্য উহা হাতের সাহায্যেই ভিতরে মুড়িয়া চাপিয়া দিতে হইবে। পাঁজ তৈরীর সময় কাঠিটি যেন হাতের মুঠোর মধ্যে ঘুরিতে থাকে অথচ সেখান থেকে যেন বাহিরে চলিয়া না আসে। ঠিক মতো তৈরী হইয়া গেলে পাঁজটি হাতা দিয়া চাপিয়া কাটিয়া বাম হাতে টানিয়া বাহির করিয়া লইতে হয় এবং হাতার আগার মাথা দিয়া পাঁজ পিঁড়ির সামনে রাখা কাগজের উপর উহা রগড়াইয়া দিতে হয়।

পাঁজ হাতে ধরিয়া তুলিয়া সময় নষ্ট না করাই সঙ্গত। সাধারণত এক মিনিটে ৬টী হইতে ৮টী পাঁজ বানানো যায়। প্রত্যেকটী পাঁজের ওজন এক আনা পরিমিত রাখার উদ্দেশ্য এই যে, পাঁজ হইতেই যেন সুতার নম্বর বাহির করা যাইতে পারে। পাঁজ মোটা করিয়া যদি তৈরি করা হয়, তবে হাতে বেশীক্ষণ থাকার ফলে উহা হাতের ঘাম ও ময়লায় খারাপ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এক আনা ওজনের ছোট পাঁজ এই অসুবিধা হইতে রক্ষা পায়। অন্ধ ও নন্দেরের মিহি সুতা কাটুনী ৩—৪ আনা ওজনের খুব মোটা পাঁজ তৈরি করে, কিন্তু কাটিবার কালে পাঁজ যাহাতে খারাপ না হয়, সেই জন্য এই দামী পাঁজ কলা পাতায় বা কাগজে জড়াইয়া সে সুতা কাটে। মোটা পাঁজ চিমটির চাপে আটকাইয়া রাখা মুশকিল; পাঁজ বেশী লম্বা হইলে কাটিবার সময় উহার অপর মাথাটি ধাগার সঙ্গে জড়াইয়া যায়, কাজেই পাঁজের দৈর্ঘ্য ৭—৭½ ইঞ্চির চাইতে বেশী হওয়া উচিত নয়। পাঁজ মোটা হওয়াও যেমন ঠিক নয়, আবার ইঁদুরের লেজের মত খুব সরু হওয়া ও তেমনি উচিত নয়। সরু জিনিষ আঙুলের সাহায্যে চিমটির মধ্যে সহজে ধরা যায় না। পাঁজ খুব ফাঁপা, ঢিলা ও লম্বা হইলে উহা হইতে মুড়িয়া যায়। বেশী কড়া হইলে উহা হইতে সুতা জলদি জলদি টানিয়া বাহির করা যায় না। কাজেই উহা মাঝামাঝি রকমের হওয়া দরকার। পাঁজ কোথাও নরম, কোথাও কড়া যেন না করা হয়। ইহাতে কাটুনীর চিমটির ধরণ বারে বারে বদলাইতে লাগে। সুতরাং পাঁজের দৈর্ঘ্যও বেধের মত উহার কাঠিন্য ও কোমলতার প্রতিও লক্ষ্য রাখা দরকার। কাঠির চারিপাশে জড়ানো তুলার স্তরের উপর পাঁজের কাঠিন্য ও কোমলতা নির্ভর করে। কাঠির চারিদিকে কম স্তর রাখিলে পাঁজ নরম ও লিক্‌লিকে আর স্তর বেশী রাখিলে কড়া হয়। এজন্য পাঁজ যাহাতে বেশী কড়া বা বেশী নরম না হইতে পারে, সেই আন্দাজেই তুলার স্তর রাখা সঙ্গত। এই ভাবে কাঠির চারিপাশ ঘিরিয়া ও সারা দৈর্ঘ ব্যাপিয়া সমান পরত রাখার দিকেও মন দিতে হয়। অর্থাৎ তুলার গোলা সবদিকে সমান মোটা ও সমান চওড়া করিয়া বিছাইতে হয় এবং উহার সব জায়গায় সমান চাপ দিয়া উহা জড়ানো দরকার। খোলা হাওয়ায় রাখিলে পাঁজ ফুলিয়া খারাপ হইয়া যায়। এজন্য উহা তৈরী হওয়া মাত্রই উহা ১০—১০ তোলার এক একটি পুলিন্দা কাগজে জড়াইয়া রাখিয়া দিতে হয়। বেশী দিন রাখিতে হইলে পুলিন্দার মুখও বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত পুলিন্দা বানানোর সময় পাঁজ খুব জোরে চাপিয়া জড়ানো উচিত

নয়,। ইহাতে উহার ভিতরে মোচড় লাগে এবং উহার টাট্‌কা ভাব নষ্ট হইয়া যায়।

সুতা কাটার পক্ষে টাটকা পাঁজই ভালো। এজন্য যেখানে সম্ভব সেখানে রোজই ধুনিয়া লওয়া উচিত। বর্ষার দিনে রোজ ধুনা সম্ভব নয়, কাজেই গ্রীষ্মকালে পাঁজ বানাইয়া রাখার প্রয়োজন পড়ে।

পঞ্চম অধ্যায়

তকলিতে সুতা কাটার পদ্ধতি

উপক্রমণিকা ও উদ্যোগ পর্ব

বিভিন্ন পদ্ধতিঃ—

বসিয়া বা খাড়া হইয়া সুতা কাটা, ডান বা বাম হাতে কাটা ইত্যাদি বিষয় ভেদ হেতু তকলিতে সুতাকাটার পদ্ধতিও অনেক রকম হইতে পারে। ইহাদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি সমূহ সূত্রাকারে (formula) এখানে লেখা হইতেছে। এইগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া দরকার।

সঙ্কেত সমূহ ও উহাদের অর্থ ঃ—

অ = আঙ্গুলে জোর দেওয়া।
আ = জাং এর উপর জোর দেওয়া।
ই = পায়ের পিণ্ডির উপর জোর দেওরা।
ক = বসিয়া সুতা কাটা।
খ = খাড়া হইয়া কাটা।
গ = ডান হাতে কাটা।
ঘ = বাম হাতে কাটা।
চ = মাটিতে ঠেকাইয়া পাক দেওয়া।
ছ = মাটিতে ঠেকাইয়া গুটানো।
জ = না ঠেকাইয়া পাক দেওয়া।
ঝ = না ঠেকাইয়া গুটানো।
ট = বুড়া আঙ্গুল ও তর্জনীর সাহায্যে।
ঠ = বুড়া আঙ্গুল ও মধ্যমার সাহায্যে।
ড = না ঠেকাইয়া পাক দেওয়া। এবং ঠেকাইয়া কাটা ও গুটানো।

এই সমস্ত সংকেত অনুযায়ী তকলি কাটাইয়ের পৃথক পৃথক পদ্ধতি নীচে দেওয়া হইলো।

চতুষ্ক পদ্ধতি		সূত্র	আধ ঘণ্টার মধ্যম দ্রুতি
প্রথম—	১ম—	অ+ক+গ+চ+ঋ+ট	৬০ তার
	২য়—	অ+ক+ঘ+চ+ঋ+ট	৫০ তার
	৩য়—	অ+ক+গ+চ+ঋ+ঠ	৬০ তার
	৪র্থ—	অ+ক+ঘ+চ+ঋ+ঠ	৫০ তার
দ্বিতীয়—	৫ম—	অ+ক+গ+জ+ঋ+ট	৬০ তার
	৬ষ্ঠ—	অ+ক+ঘ+জ+ঋ+ট	৫০ তার
	৭ম—	অ+ক+গ+জ+ঋ+ঠ	৬০ তার
	৮ম—	অ+ক+ঘ+জ+ঋ+ঠ	৫০ তার
তৃতীয়—	৯ম—	অ+ক+গ+চ+ছ+ট	৮০ তার
	১০ম—	অ+ক+ঘ+চ+ছ+ট	৭০ তার
	১১শ—	অ+ক+গ+চ+ছ+ঠ	৮০ তার
	১২শ—	অ+ক+ঘ+চ+ছ+ঠ	৭০ তার
চতুর্থ—	১৩শ—	অ+ক+গ+জ+ছ+ট	৮০ তার
	১৪শ—	অ+ক+ঘ+জ+ছ+ট	৭০ তার
	১৫শ—	অ+ক+গ+জ+ছ+ঠ	৮০ তার
	১৬শ—	অ+ক+গ+জ+ছ+ঠ	৭০ তার
পঞ্চম—	১৭শ—	অ+খ+গ+জ+ঋ+ট	৭০ তার
	১৮শ—	অ+খ+ঘ+জ+ঋ+ট	৫০ তার
	১৯শ—	অ+খ+গ+জ+ঋ+ঠ	৭০ তার
	২০শ—	অ+খ+ঘ+জ+ঋ+ঠ	৫০ তার
ষষ্ঠ—	২১শ—	আ+ক+গ+ড+ছ+ট বা ঠ	১২০ তার
	২২শ—	আ+ক+ঘ+ড+ছ+ট বা ঠ	১২০ তার
	২৩শ—	ই+ক+গ+ড+ছ+ট বা ঠ	১২০ তার
	২৪শ—	ই+ক+ঘ+ড+ছ+ট বা ঠ	১৪০ তার

অভ্যাস সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ নির্দেশ ঃ—

(১) প্রথম বিশটি পদ্ধতি একটা আলাদা দলের। এগুলির অভ্যাস ভালো রকম আয়ত্ত হওয়ার পরে শেষের চারিটি অভ্যাস শুরু করা উচিত।

(২) বিষম সংখ্যা (১, ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি) হইতে শুরু হওয়ার পদ্ধতি এবং উহাদের পরবর্তী সম-সংখ্যা (২, ৪, ৬, ৮ ইত্যাদি) হইতে শুরু হওয়ার পদ্ধতি সমূহের এক একটি যুগল বানানো হইয়াছে। কাজেই অভ্যাসের জন্য এক একটি যুগল লইতে হয়। যেমন প্রথমে যুগলের একটি পদ্ধতি লইয়া এবং সাধারণত উহা ঠিক মত অভ্যাস হওয়ার পরে অন্য পদ্ধতিটি শুরু করিতে হয়। উভয় পদ্ধতির অভ্যাসের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যেন যতদূর সম্ভব কম থাকে। এই কথার মানে এই যে, অভ্যাস করার সময় যুগল ভাঙ্গিতে দেওয়া উচিত নয় এবং একটি পদ্ধতি ব্যতিরেকে অপরটি অসম্পূর্ণ মনে করা সঙ্গত। এক জোড়া মুগুর ঘুরানোর সময় যেমন প্রথমে এক হাতে ঘুরানোর পরে অন্য হাতে ঘুরাইতে হয় এবং উভয় হাতে ঘুরানোর পরেই জোড়া মুগুরের কাজ সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। তেমনই তকলিতে সুতা কাটা পদ্ধতির যুগলকেই একক মনে করা উচিত। (৩) পদ্ধতিগুলির ধারা ইচ্ছা করিয়াই উল্লিখিত ভাবে রাখা হইয়াছে। কাজেই প্রথম যুগল শেষ হইলে দ্বিতীয় যুগল এবং দ্বিতীয়টি শেষ হওয়ার পরে তৃতীয়—এইভাবে এক একটি যুগলের পর পর অভ্যাস করিতে হয়।

(৪) কিন্তু একটি যুগলের খানিকটা অভ্যাস হইতে না হইতেই অপরটি শুরু করিয়া দেওয়া অনুচিত। অথচ আবার এরূপ ও যেন না করা হয় যে, চলতি পদ্ধতিটির পুরা দ্রুতি যতদিন পর্যন্ত আয়ত্ব না হইবে, ততদিন অপর পদ্ধতি শুরুই করা হইবে না। একটি পদ্ধতিতে দক্ষতা লাভ করার পরে উহাতে নিয়োজিত মনকে আবার অন্য পদ্ধতিতে লাগানো মুশকিল হইয়া থাকে। কাজেই এই সমস্ত পদ্ধতির অভ্যাসের প্রোগ্রাম তৈরি করিয়া একটি পদ্ধতির পর অন্যটি লইয়া অগ্রসর হওয়া উচিত।

(৫) সব পদ্ধতিতে সমান দ্রুতি লাভ হয় না। কাজেই পরীক্ষা দ্বারা উহাদের দ্রুতি নির্ধারণ করিতে হইবে। চরম দ্রুতিকে পুরা ষোল আনা মনে করিয়া উহার এক আনা, চার আনা ও আট আনা ইত্যাদি অংশ অবগত হইতে হইবে। এই ভাবে প্রত্যেকটি পদ্ধতির খানিক দ্রুতি আয়ত্ব করিয়া সমান ভাবে সুতা কাটার অভ্যাস করা যাইতে পারে

(৬) পরবর্ত্তী পদ্ধতি সমূহের অভ্যাস কালে পিছনের পদ্ধতিগুলির পুনরাবৃত্তি করা উচিত।

(৭) "গ" এর তুলনায় "ঘ" এর অভ্যাসের কিছু অধিক সময় ব্যয় করিয়া যতদূর সম্ভব উভয়ের সমান দ্রুতি আয়ত্তের চেষ্টা করা প্রয়োজন।

(৮) "ছ" এর দ্রুতি খুব হয়। অথচ আরম্ভে এই পদ্ধতিতে সুতা ভাল ভাবে গুটান যায় না। "ঝ" এর দ্রুতি ইহার তুলনায় কম, কিন্তু উহাতে সুতা ভালো ভাবে গুটানো যায়। লাটুর আকারে সুতা গুটানো ভালো। এইজন্য প্রথমে "ঝ"-এর অভ্যাস করিতে হয় পরে "ছ"-এ প্রথমে ঝটকায় গুটানো পরে দুই ঝটকা ও শেষে এক ঝটকায় গুটানো অভ্যাস করা উচিত।

(৯) "চ" এর তুলনায় "জ"-এ দ্রুতি বেশী, কিন্তু ইহাতে আরম্ভে সুতাও ছিঁড়ে খুব। এই জন্য "চ" এ শুরু করিতে হয়। কিন্তু উহাতে কাঁচা সুতা বাহির হওয়ার আশঙ্কা থাকে কাজেই তখন সুতা মজবুত করার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

(১০) "ট" ও "ঠ" এর যোগ্যতা প্রায় এক প্রকার। একটিতে তর্জনীর অংশ বিশেষের এবং অপরটিতে মধ্যমার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সুবিধা পাওয়া যায়। এই উভয় পদ্ধতির অভ্যাস এক-টানা কাটুনীর পক্ষে খুব কাজের হইয়া থাকে; কারণ; আঙুল অদল বদল করিয়া ইহাতে আরাম মিলে।

(১১) প্রথম ষোলটি পদ্ধতির অভ্যাসের ফলে যখন উত্তম মজবুত সুতা কাটা রপ্ত হইয়া যাইবে, তখনই "থ" এর অভ্যাস শুরু করা উচিত। কারণ, সুতা ছিঁড়িলেই তকলি সজোরে মাটিতে পড়িয়া খারাপ হইয়া যায়। প্রথম বিশ পদ্ধতির মধ্যে "থ" এর একটি স্বতন্ত্র চতুষ্ক আছে।

(১২) "ড"-এর অভ্যাস ২১ হইতে ২৪ পদ্ধতির মধ্যে অত্যাবশ্যক।

(১৩) "আ" হইতে "ই" পর্যন্ত এই পদ্ধতিগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ অনেক অভিজ্ঞতার ফলে ইহাদের পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের সাহায্যে তকলির দ্রুতি প্রায় চরকার সমান করা যাইতে পারে।

(১৪) "আ" ও "ই" কেবল বসিবার ভঙ্গিমাত্র; কিন্তু ইহাদের দ্রুতিতে কিছু পার্থক্য আছে। "ই" তে পাক বেশী হয় বটে, কিন্তু অসুবিধাও অনেক। তবু অদল বদল করিয়া কাটার জন্য এই দুইটি পদ্ধতিই কার্যকরী।

কাটাই-পদ্ধতি সমূহের নাম ঃ—

উপরে তকলিতে সুতা কাটাই পদ্ধতির যে ২৪টি সূত্র দেওয়া হইয়াছে, পাটনা ট্রেনিং স্কুলের শ্রীনারায়ণ চৌধুরী হিন্দীতে এই সূত্রগুলির বিশেষ নাম-করণ করিয়াছেন যাহাতে উহাদের অর্থও ধরা পড়ে এবং মনে রাখিতেও সুবিধা হয়। এই সমস্ত নাম উপরোক্ত ধারা অনুযায়ী এখানে বাংলায় অনুবাদ

করিয়া দেওয়া হইল। ইহা ছাড়া আরও দুইটি নূতন পদ্ধতি "পায়ের তলা হাতের তালু" "খাড়া জাং হাতের তালু" ও যোজিত হইয়াছে।

নূতন পদ্ধতি **নাম**

প্রথম—১ম— বসিয়া মাটিতে চিমটি তর্জনী হাওয়ায় জড়াও ডান হাত
২য়— " " " " " " বাম হাত
৩য়— বসিয়া মাটিতে চিমটি মধ্যমা হাওয়ায় জড়াও ডান হাত
৪র্থ— " " " " " " বাম হাত

দ্বিতীয়—৫ম—বসিয়া হাওয়ায় চিমটি তর্জনী হাওয়ায় জড়াও ডান হাত
৬ষ্ঠ— " " " " " " বাম হাত
৭ম—বসিয়া হাওয়ায় চিমটি মধ্যমা হাওয়ায় জড়াও ডান হাত
৮ম— " " " " " " বাম হাত

তৃতীয়—৯ম—বসিয়া মাটিতে চিমটি তর্জনী মাটিতে জড়াও ডান হত
১০ম— " " " " " " বাম হাত
১১শ—বসিয়া মাটিতে চিমটি মধ্যমা মাটিতে জড়াও ডান হাত
১২শ— " " " " " " বাম হাত

চতুর্থ—১৩শ—বসিয়া হওয়ায় চিমটি তর্জনী মাটিতে জড়াও ডান হাত
১৪শ— " " " " " " বাম হাত
১৫শ—বসিয়া হাওয়ায় চিমটি মধ্যমা মাটিতে জড়াও ডান হাত
১৬শ— " " " " " " বাম হাত

পঞ্চম—১৭শ—খাড়া হাওয়ায় চিমটি তর্জনী হাওয়ায় জড়াও ডান হাত
১৮শ — " " " " " " বাম হাত
১৯শ—খাড়া হাওয়ায় চিমটি মধ্যমা হাওয়ায় জড়াও ডান হাত
২০শ— " " " " " " বাম হাত

ষষ্ঠ—২১শ—বসিয়া জাং হাতের তালু মাটিতে জড়াও ডান হাত
২২শ— " " " " " " বাম হাত
২৩শ—বসিয়া পিণ্ডি হাতের তালু মাটিতে জড়াও ডান হাত
২৪শ— " " " " " " বাম হাত

নূতন পদ্ধতি

সপ্তম—২৫শ —খাড়া জাং হাতের তালু হাওয়ায় জড়াও ডান হাত

২৬শ— ” ” ” ” ” ” বাম হাত

২৭শ—বসিয়া তলা (পায়ের) হাতের তালু মাটিতে জড়াও ডান হাত

২৮শ— ” ” ” ” ” ” ” বাম হাত

ব্যাখ্যা ঃ—

বসিয়া = বসিয়া বসিয়া কাটা।

মাটিতে চিমটি = মাটিতে ঠেকাইয়া জোর দেওয়া।

চিমটি তর্জনী = বুড়া আঙ্গুল ও তর্জনীতে জোর দেওয়া।

চিমটি মধ্যমা = বুড়া আঙ্গুল ও মধ্যমায় জোর দেওয়া।

হাওয়ায় চিমটি = হাওয়ায় অর্থাৎ না ঠেকাইয়া জোর দেওয়া।

হাওয়ায় জড়াও = হাওয়ায় অর্থাৎ না ঠেকাইয়া সুতা গুটানো।

মাটিতে জড়াও = মাটিতে ঠেকাইয়া সুতা গুটানো।

খাড়া = খাড়া হইয়া সুতা কাটা।

জাং হাতের তালু = জাং এ হাতের তালু দিয়া জোর দেওয়া।

পিণ্ডি হাতের তালু = পায়ের পিণ্ডিতে হাতের তালু দিয়া জোর দেওয়া।

তলা তালু = পায়ের তলায় হাতের তালু দিয়া জোর দেওয়া।

সরঞ্জাম ঃ—

(১) তকলি (২) পাঁজ, (৩) নাটাই (৪) ছাই, (৫) কার্ডবোর্ড বা দফ্তি (৬) কাপড়ের পট্টি, (৭) রঙীন ডোর এবং (৮) কাগজ, পেন্সিল ইত্যাদি।

তকলি ঃ

আগেকার এক অধ্যায়ে তকলির বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তদনুযায়ী তকলিটি নিখুঁত কিনা দেখিয়া লওয়া উচিত। আরম্ভে একটি তকলিতেই কাজ চলিবে, কিন্তু অভ্যাস বাড়িলে আরোও তকলির প্রয়োজন হইবে। কোন কোন পদ্ধতিতে ১০ মিনিটেই তকলি ভরিয়া যায়। একটি মাত্র তকলি থাকিলে বারে বারে নাটাইয়েতে সুতা গুটাইয়া উহা খালি করিতে হয়। এই ভাবে আধ

ঘণ্টাও এক নাগাড়ে কাটাই চলিতে পরিবে না, ফলে কাটাইতে দ্রুতিও বাড়িবে না। সাধারণত তিনটি তকলিই যথেষ্ট—ছয়টি হইলে তো কথাই নাই।

পাঁজ ঃ—

পাঁজ সম্পর্কেও পূর্বেই আলোচনা করা হইযাছে ; কাজেই বেশী লেখার প্রয়োজন নাই। এখানে এটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে, সুতাকাটাইর দ্রুতি অনেক কিছুই পাঁজের ভালো মন্দের উপর নির্ভর করে। পাঁজের সম্বন্ধে যত বেশী সাবধান হওয়া যায়, ততই ভালো। নির্দোষ পাঁজ তকলির পক্ষে পথ পরিষ্কারক বস্তু। ঐরূপ পাঁজ দিয়াই তকলিতে প্রতি ঘণ্টায় ৪০০ তারের দ্রুতিতেও সুতা কাটা যাইতে পারে।

নাটাই ঃ—

নাটাইয়ের লম্বাই, চওড়াই ও মোটাই এরূপ রাখা দরকার যেন মিল রাখিয়া জড়াইয়া দুই চক্করে ঠিক ৪ ফুট সুতা গুটাইয়া লওয়া যায়। নাটাইয়ের প্রচলিত মাপ ১১$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি ×৩$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি×$\frac{৩}{৮}$ ইঞ্চি।

দুইটি নাটাই রাখা উচিত। আরম্ভে ডান ও বাম হাতের সুতা একই নম্বরের হয় না। কাজেই উহা পৃথক পৃথক রাখার জন্য দুইটি নাটাই প্রয়োজন। অভ্যাসের পরে যখন উভয় হাতের সুতা এক প্রকারের বাহির হইতে থাকিবে, তখন একটি নাটায়েই সুতা গুকানোর কাজে লাগিবে। মাত্র একটি নাটাই রাখিলে ভিন্ন ভিন্ন নম্বরের সুতা একত্রে মিশিয়া যাইরে এবং সুতা ভিজাইয়া শুকানোর ও সুযোগ মিলিবে না, নইলে, সুতা শুকনো পর্য্যন্ত কাটাই বন্ধ রাখিতে হইবে।

নাটাইয়ের চারিটি শিরই গোল থাকা দরকার। গোল হইলে সুতা সহজেই বাহির হইয়া আসে, জোর দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। একটি শির গোল হইলেও চলিতে পারে। কিন্তু নাটাইয়ের উভয় পার্শ্ব সম মাপের (symmetrical) করিয়া তৈরী করার জন্য শিরই গোল করা প্রয়োজন, আর এই জন্যই উহার দুই পাশেই ধরিবার কান ও মাথার উপর ছিদ্র রাখা হয়। ভিজা ন্যাকড়া জড়ানো নাটাই শুকানোর জন্য গোঁজের সঙ্গে ঝুলাইয়া দিতে হয় ; নাটাইয়ের গায়ে ছিদ্র সেই কাজে লাগে। উভয় পার্শ্ব একই রকম আকৃতির হইলে নাটাই সুন্দর দেখায় এবং থাকেও আরামে।

ছাই :—

রুটি বেলিবার সময় শুকনা আটার যে কাজ, সুতা কাটার সময় ছাইয়ের ও তাই। হাত পায়ের ঘামে তকলির ডাঁট ভিজিয়া যায়, মসৃণ ডাঁটটি হাতে ঠিক মত ধরা যায় না। উহা পিছলাইয়া যায় এবং তকলির পক্ষে পুরা শক্তি মিলে না। ছাই লাগাইলে চামড়ার স্বাভাবিক মসৃণতা ও ভিজা ভাব কমিয়া উহা খানিকটা রুখা হইয়া উঠে; ফলে আঙুলের শক্তি খুব জোরে ডাঁটটিকে ঘুরাইয়া দেয়। যেমন পিছল জায়গায় মোটরের চাকা ঘুরিতে পারে না, কেবল ফস্‌কাইতে থাকে, সেইরূপ মসৃণ চামড়ার উপর তকলিও ফস্‌কাইয়া যায়। ছাইতে এই পিছলানো দূর হয়।

এই ছাই বেশ পরিষ্কার ও মিহি হওয়া দরকার। উহাতে মাটি, দলা বা কাঁকর মোটেই থাকা উচিত নয়। ছাই সাদা রং-এর হইলে সুতা কালো হয় না। উহাতে বালি না থাকিলে চামড়ায় ঘষা লাগানো এবং দলা না থাকিলে উহা তাড়াতাড়ি উঠানো যায় না।

কাঠ কয়লার ছাইয়ে উল্লিখিত সমস্তগুণ বিদ্যমান। ছাইয়ে যেন ক্ষার খুব বেশী না থাকে, কারণ তাহাতে চামড়ায় ফোস্কা পড়িতে পারে। কাজেই ভালো ছাই যাহাতে বালি, মাটি, দলা, কাঁকর, ও ক্ষার ইত্যাদি না থাকে অর্থাৎ চামড়ায় যেন ফোস্কা না জন্মায়, অথচ যাহাতে তকলির পিছল ভাব দূর হইতে পারে।

এই ছাই ডিবার মধ্যে রাখা উচিত। ডিবাটি অগভীর ও অপ্রশস্ত হওয়া দরকার। সুতা কাটিবার সময় কাগজের উপর ছাই রাখিলে উহা উড়িয়া যাইবে এবং জায়গাও ময়লা হইবে। যে হাতে তকলির দ্রুতি দেওয়া হয়; সেই হাতের কাছে ছাইয়ের ডিবা রাখিতে হয়; তবেই সুবিধা মতন উহা তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কার্ডবোর্ড বা দফ্‌তি :—

ফরাশের উপর বা মাটিতে ঠেকাইয়া তকলি কাটিলে অনি ভোঁতা হইয়া যায় এবং মাটি চৌরস না থাকিলে এদিক ওদিক সরিয়া যায়। ফরাশের বদলে খোলা মাটির উপর রাখিয়া কাটিলে অনি মাটিতে ঢুকিয়া যায়, তকলির দ্রুতি কমে এবং জমি খারাপ হইয়া যায়। এই সমস্ত অসুবিধা দূর করার জন্য কার্ডবোর্ডের প্রয়োজন হয়। আদ্র বাতাস ইত্যাদিতে কার্ডবোর্ড তেড়া হইয়া

যায়। উহা যাহাতে তেড়া না হয় এবং উহাতে যেন ভাঁজ না পড়ে, সেই উদ্দেশ্যে কার্ডবোর্ডের তলায় কাঠের পাতলা তক্তা লাগানো হয়। যেরূপ ঘুন্টিদার পেরেকে দিয়া চিত্রকর বোর্ডের উপর ছবি আটকায়, সেইরূপ পেরেক দিয়া কার্ডবোর্ডটি তক্তার উপর সাঁটিয়া দেওয়া উচিত। তবেই উহা তেড়া হইতে পারিবে না, উহাতে ভাঁজ পড়িবে না এবং উহা টুটিতে বা ফাটিতে পারিবে না। কিছুদিন পর তকলির অনির আঘাতে ছিদ্র খারাপ হইয়া গেলে, টাকু দিয়া উহা তুলিয়া—উলটাইয়া লাগাইয়া দেওয়া উচিত।

কার্ডবোর্ডটি যেন খুব মোটা না হয় এবং উহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যেন এক তা কাগজ যেরূপ পুরু তাহার চতুর্গুণ হওয়া উচিৎ। প্লাই-উড্ হাল্কা পাতলা ও মজবুত, কাজেই ইহার তক্তা বানানোই সঙ্গত। ঘুন্টিদার পেরেক সহজে লাগানো ও বাহির করা যায়। খালি কাঠের উপর তকলি আওয়াজ করে, এই কারণেই কাঠের উপর কার্ডবোর্ড লাগাইতে হয়। খালি কার্ডবোর্ড তেরচা হইয়া যায়, এজন্য উহাতে তক্তা লাগানো দরকার।

উল্লিখিত বিষয় সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অপর কোন বস্তু কাজে লাগাইলেও কোন ক্ষতি হয় না। সাধারণ একখানা বই-এ কাজ চলিতে পারে। কিন্তু বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা ভাল।

কাপড়ের পট্টি ঃ—

নাটাই হইতে সুতা বাহিরে খুলিয়া লওয়ার আগে একখণ্ড কাপড়ে পট্টি ভিজাইয়া উহার উপর জড়াইয়া দিতে হয়। এই পট্টিটি যেন চারি আঙুল চওড়া ও ২—২॥ হাত লম্বা থাকে। ইহা যেন রঙীন না হয়। রঙীন হইলে সুতার গায়ে রঙ্ লাগার ভয় থাকে। ফাঁক ফাঁক বুনট ঢুসুতি খাদির পট্টি একাজের পক্ষে উপযুক্ত।

রঙীন ডোর ঃ—

নাটাই হইতে সুতা করার পরে উহার যোগ বাঁধা আবশ্যক, নইলে সুতা আপনি আপনি গুটাইয়া যায় ও যোগ খারাপ হয়। যোগ বাঁধিবার ডোর পাকানো ও রঙীন হওয়া দরকার। সাধাসিধা সুতা পাকানো না থাকিলে ছিঁড়িয়া যাইবে আর সুতা রঙীন না হইলে শীঘ্র নজর পড়িবে না। বাম হাতের সুতার জন্য লাল ডান হাতের সুতার জন্য কালো রঙের ডোর কাজে লাগাইলে

দুই হাতের সুতা চিনিয়া লওয়া ও পৃথক রাখা সহজ। উভয় হাতের সুতা যখন একই রকমের বাহির হইতে থাকিবে, তখন এ কটি রঙেই কাজ চলিয়া যাইবে।

অন্যান্য জিনিষ :—

কোন কোন ব্যক্তি সুতা নাটানোর পরে অন্য কাজে লাগিয়া যায়, ফলে সে গোনা তারের সংখ্যা ভুলিয়া যায়। ঐ তার আবার গুণিতে হয়। এই ভাবে অতিরিক্ত সময় নষ্ট হয়। এক টুকরা কাগজে তারের সংখ্যা লিখিয়া সুতার ফাঁকে গুঁজিয়া রাখিলে সময়ের এই অপব্যয় সহজেই রক্ষা পাইতে পারে। সামান্য বিষয়ের জন্য স্মরণ শক্তির উপর জোর দেওয়া ঠিক নয়। কাজেই, কাটুনী সর্বদাই নিজের কাছে কাগজ, পেন্সিল রাখিবেন। দ্রুতির হিসাব রাখা এবং সুতা জড়াইতে কতটা সময় লাগিল তাহার হিসাব ইত্যাদি কাজেও ইহাদের ব্যবহার করা উচিত। এই সমস্ত জিনিষ সাবধানে রাখার জন্য একটা ছোট মতন টুকরি বা ছোট্ট বাক্স সঙ্গে রাখা সঙ্গত।

জায়গা ও আসন :—

সুতা কাটার জায়গা যেন এরূপ হয় যেখানে সেখানে সুতার ধাগার উপর যথেষ্ট আলো আসিয়া পড়িতে পারে ; অথচ সম্মুখ হইতে চোখের উপর আলো না পড়ে। উপর বা পার্শ্বদেশ হইতে আলো আসা ভালো। সামনের আলোয় চোখের কষ্ট হয় আর পিছনের আলোতে সুতার উপর নিজের ছায়া পড়ে। ধাগার সম্মুখ দিক খোলা বা সেখানে কাচের জানালা বা দরজা না থাকাই উচিত। সাদা ধপধপে ভূমির উপর সাদা রং-এর সুতার ধাগা দেখা যায় না। এই অবস্থায় সুতার দিকে খুব সূক্ষ্ম ভাবে নজর দিতে হয়। ফলে চোখ শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং উহা খারাপ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ধাগা ঠিক মত দেখা না গেলে সুতাও মোটা মিহি এবং খারাপ বাহির হওয়ার ভয় থাকে।

সুতা কাটার সময় ধাগার উপর হাওয়ার ঝাপটা লাগা উচিত নয়, অথচ তখন হাওয়া যেন যথেষ্ট থাকে। হাওয়ায় সুতা ছিঁড়ে না, ঝাপটায় ছিঁড়ে—একথাটি মনে রাখা দরকার। ইহার অর্থ এই যে, সুতা কাটার জায়গা যেন এরূপ থাকে যেখানে আলোর কমিবেশিতে চোখের কষ্ট না হয় এবং যেখানে হাওয়ার ঝাপটা লাগে।

বসিবার জায়গাটি পরিষ্কার ও খোলা থাকা উচিত। সামনের দিক যেন ভরতি

না থাকে। তকলি কাটার জন্য এক জন লোকে কমপক্ষে ৪॥ ফুট × ২॥ ফুট জায়গার প্রয়োজন।

বিছানোর জন্য সতরঞ্চি বা চাটাই থাকা সঙ্গত। খালি ফরাশ বা মাটির উপর বসা উচিত নয়। মাটির আদ্রতা, ধূলা ও পিঁপড়া ইত্যাদি কাটুনীকে কষ্ট দেয়, সে উশখুশ করিতে থাকে। পা রাখার জন্য যতক্ষণ সুবিধা মতন ব্যবস্থা না করা যায়, ততক্ষণ, উহা লোককে আরামে বসিতে দেয় না। কাজেই মাটির উপর একটা কিছু বিছানো প্রয়োজন। বিছানোর চাটাই বা সতরঞ্চি যেন আঁশ উঠানো না থাকে এবং এরূপ পাতলাও না হয় যে, কুঁচকাইয়া যাইতে পারে। এইজন্য মোটা সতরঞ্চি হইলেও ঠিক হয়।

খাওয়া দাওয়া, লেখা, পথা ইত্যাদি পৃথক পৃথক কাজের জন্য তদনুযায়ী বিভিন্ন রকমের বৈঠক করিয়া বসিতে হয়। এই বৈঠককে আসন বলে। শুধু বসাই আসন নয়। কোন বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে দেহকে কোন বিশেষ ভঙ্গীতে স্থাপনের নাম আসন। সুতা কাটার জন্যও বিশেষ আসনে বসা বা খাড়া থাকা প্রয়োজন হয়। বসিয়া বসিয়া তকলি কাটার জন্য তিনটি আসন আছে।—(২) সুখাসন অর্থাৎ পা ভাঁজ করিয়া বসা। (২) আধা পদ্মাসন অর্থাৎ এক পা জাং-এর উপর রাখিয়া বসার ভঙ্গী। এবং (৩) লেখাসন অর্থাৎ লেখার জন্য উভয় পা পিছনের দিকে মুড়িয়া বসা।

প্রথমকার দুইটি আসন বসিয়া বসিয়া সুতা কাটার সব্ কয়টি পদ্ধতিরই কাজে লাগিতে পারে। তৃতীয় আসনটি কেবল মাত্র শেষের দুইটি পদ্ধতির পক্ষে উপযোগী চতুর্থত, খাড়া হইয়া কাটার আসন; ইহা পঞ্চম চতুষ্ক অর্থাৎ ১৭ হইতে ২০ নং পদ্ধতি ও সপ্তম চতুষ্কের ২৫-২৬ নং পদ্ধতির জন্য। পা বদল করিয়া বসিলে সুখাসন, আধা পদ্মাসন ও লেখাসনের দুই দুইটি প্রকার ভেদ হইতে পারে।

এক নং আসন ডান হাতে কাটার এবং ২নং আসন বাম হাতে কাটার পক্ষে উপযোগী।

সুতা কি ভাবে কাটা হয়ঃ—

কাটাইয়ের কাজে দুইটি বিষয় প্রধান। এক, আঁশগুলি অবিরাম সম সুতা ভাবে টানা; অপর, সেই টানা আঁশ পাকানো। এই দুইটি কাজের মধ্যে কোন্‌টি আগের এবং কোন্‌টি পরের, সুতার গঠন কৌশলের খাতিরেই তাহা

নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বাম হাতে পাঁজ ধরিয়া ডান হাতের বুড়া আঙুল ও তর্জনীর চিমটি দিয়া পাঁজের লেজ হইতে খানিকটা আঁশ টানিলে তাহা ছুটিয়া চিমটির মধ্যে চলিয়া আসে। আঁশ বেশ লম্বা থাকিলে নিজের সঙ্গে আরো কতক আঁশও টানিয়া আনে। অথচ টানার কালেই যদি চিমটিতে-ধরা আঁশ-গুলিতে এক দিকে পাক দেওয়া হয়, তবে উহারা সুতার ধাগার রূপ নেয়। টানার কাজের সাথে সাথে পাকানোর কাজও চালাইতে থাকিলে পাক-খাওয়া আঁশগুলি পাঁজের অপর আঁশগুলির সহিত গাঁথিয়া যায় এবং উহারা আপনা আপনি টানা লইয়া চলিয়া আসে। টানা ও পাকানো কাজ সমান দ্রুতিতে চলিতে থাকিলে সুতা মোটেই ছিঁড়ে না। সুতা কাটার সময় প্রত্যেকটি আঁশ নিজে নিজে এবং আপন পার্শ্ববর্তী আঁশের চারিদিকে জড়াইয়া যায়। পাক না দিয়া টানা হইলে আঁশ যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। অনুরূপ ভাবে, প্রথমে টানিয়া পরে পাক দিলে ধাগা মোটা মিহি বাহির হইতে থাকে। অথচ প্রথমে পাক দিয়া পরে আঁশ টানিলে সুতা সমান মোটা বাহির হয়। পাক না দিয়া টানিলে তো আঁশ ছুটিয়া যায়, কাজেই ঐ ভাবে ধাগা তৈরি করা যায় না। এজন্য সুতা কাটার প্রথম প্রথম কাজ পাক দেওয়া ও দ্বিতীয় কাজ টানা ইহাই সিদ্ধান্ত হইল। সুতা কাটার এবং উহা পরিষ্কার ভাবে ও শক্ত করিয়া তৈরি করার ইহাই রীতি।

সলিতা পাকানোর সময় মেয়েরা কেবল হাতের আঙুলের সাহায্যেই সুতা বাহির করে, ইহা অনেকেই হয়তো দেখিয়া থাকিবেন। সুতা তৈরি করায় এই কাজটি তকলির সাহায্যেও শীঘ্র হইয়া থাকে। কাজেই যিনিই আদৌ আঙুলের সাহায্যে কাটা এই সুতার ধাগাকে তকলিতে চড়াইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে সুতা কাটা শিল্পে একটি খুব মহান্ আবিষ্কার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তকলি অভ্যাসের ধারাবাহিক ও বিশদ বিবরণ।

(প্রথম ভাগ)

প্রথম চতুষ্ক—পদ্ধতি—১, ২, ৩, ও ৪ ঃ—

এই কয়টি পদ্ধতি একটি চতুষ্ক। এই পদ্ধতি সমূহে কাটাইয়ের সময় তকলি ঠেকাইয়া এবং গুটানোর জন্য উহা উপরে আলগা করিয়া হাওয়ায় তুলিয়া লওয়া প্রথম দুইটি পদ্ধতিতে তর্জনী কাজে লাগে আর পরের দুইটি পদ্ধতিতে ম ্যমার ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া প্রত্যেকটি যুগলের মধ্যে আবার ডান হাত ও বাম হাতের হিসাব আছে। এই জন্য এই চারিটি পদ্ধতি এক রকম হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন।

দুইহাত ও তাদের কাজ ঃ—

গ্রামবাসীদের শন দিয়া দড়ি পাকাইতে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। একজনার হাতে ঘিরণী ও আরেক জনেক হাতে শন থাকে। ঘিরণী ও আরেক জনের হাতে শন থাকে। ঘিরণী ওয়ালা ঘিরণী ঘুরাইয়া পাক দিতে থাকে আর শন ওয়ালা দড়িতে শনের গুছি জুড়িতে জুড়িতে পিছন দিকে সরিয়া যায়। এই ভাবে দেখিতে দেখিতে খুব লম্বা দড়ি তৈরী হয়। সুতা কাটার সময় দুই হাতই এই দুই জন লোকের কাজ সামাল দেয়। তকলি ওয়ালা হাতে পাক দেয় আর পাঁজ ওয়ালা হাত আঁশ জুড়িতে জুড়িতে উপরের দিকে উঠিতে থাকে। আঁশে পাক দেওয়া আর পাকে আঁশ যোগানো সুতা কাটার কাজে এই দুইটিই প্রধান কথা এবং এক একটি হাতের উপর তাহাদেরই ভার দেওয়া হইয়াছে।

পাক দেওয়া ও সুতা কাটা একই কাজ ঃ—

উপরোক্ত রীতিতে সুতা কাটার কাজটীকে এই ভাবে বিভক্ত করা গেলে ও উভয় হাতের যোগাযোগে কিন্তু একটিই কাজ সম্পুর্ণ হয়। আবার যে হাতে পাক দেওয়া হইতেছে, সেই হাতে সুতা কাটা হইতেছে, একথা ও আমরা

বলিতেছি। কারণ, সুতা কি ভাবে তৈরী হয়। পূর্ব অধ্যায়ে তাহার আলোচনা কালে আমরা দেখিয়াছি যে, পাক দেওয়া ও আঁশ যোগান দেওয়া এই দুইটি কাজের মধ্যে পাক দেওয়া কাজটিই প্রাথমিক ও প্রধান। আঁশের মধ্যে স্বাভাবিক পাক না থাকিলে তো উহাদের পাকানই যাইতে পারে না।

আঙ্গুল দিয়া পাক দেওয়া ঃ—

তকলি দুইভাগে ঘুরানো যায়। আঙ্গুল দিয়া ও হাতের তালু দিয়া। প্রথম ২০টি পদ্ধতিতে আঙ্গুলের সাহায্যে এবং শেষের আটটি পদ্ধতিতে হাতের তালু দিয়া তকলি ঘুরানো হয়। আঙ্গুল দিয়া ঘুরানোর দুইটি রকম আছে—ঠেকাইয়া এবং আলগা করিয়া না-ঠেকাইয়া। ইহাদের সূচনা "চ" ও "জ" এ। প্রথম চতুষ্কে "চ"—এ অর্থাৎ ঠেকাইয়া ঘুরানো হয়।

তকলিতে সুতা কাটার পদ্ধতি অনেক রকমের হইলেও উহাদের কলা-কৌশল কিন্তু একই। এজন্য প্রথমে পদ্ধতি সমূহের আলোচনা কালে উহার সাথে সুতা কাটার কলা-কৌশলের পুরা বিবরণ আবশ্যক হইয়া পড়ে।

তকলি কোন্‌খান হইতে এবং কি ভাবে ঘুরানো হয় ঃ—

ডান হাতের তর্জনী ও বুড়া আঙ্গুলের চিমটির মধ্যে তকলির নাকের প্রায় দুই ইঞ্চি নীচে ডাঁটাটি ধরুন এবং উহা ডান দিকে অর্থাৎ ঘড়ীর কাঁটার মতো ঘুরান। ইহাকে ঢালে ঘোরা বলে। আরম্ভে তর্জনীর প্রথম পায়ের উপর ডাঁটটি বুড়া আঙ্গুলের মাথা দিয়া চাপুন আর চাপিতে চাপিতে উহাকে দ্রুত গতিতে বাহিরের দিকে ঘুরাইয়া দিন। ঘুরানোর প্রচেষ্টা শেষ হওয়া মাত্র তর্জনীর ডগা বুড়া আঙ্গুলের প্রথম গাঁটে আসিয়া থামিয়া যাইবে। অর্থাৎ ডান হাতে তকলি ঘুরানোর সময় তর্জনীটি দ্রুতবেগে ভিতর দিকে যায় আর বুড়া আঙ্গুলটি বাহিরের দিকে আসে।

এক চিমাটিতে তকলির দ্রুতি ঃ—

ধাগা টানার চেষ্টা করার আগে চিমটির সাহায্যে ঘুরানোর ভালো রকম অভ্যাস করা দরকার। এক চিমাটিতে তকলি ২৫।৩০ সেকেণ্ড পর্যন্ত ঘুরিতে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, উহার পুরা দ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। ইহার জন্য প্রথমে বাম হাতের তালুর উপর ডান হাত দিয়া উত্তমরূপে বারে বারে তকলিটি

ঘুরাইতে হয়। এক চিমটিতে পুরা দ্রুতি যতক্ষণ আয়ত্ত না হয়, ততক্ষণ ঘুরানোর মক্শ চালু রাখিতে হয়। ঘুরানোর পরে তকলিটি আল্‌গা না ঠেকাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। ছাড়িয়া দিলে উহা পড়িয়া যাইবে। ঘুরাইবার সময় তর্জণী মুড়িয়া যায়, কিন্তু মধ্যমা খালিই থাকে। উহার উপরেই তকলিটি ঠেকনা দিন যাহাতে উহা পড়িতে না পারে এবং ঘুরিতে থাকে। মধ্যমা দিয়া ঘুরানোর সময় উহাতে তর্জনীর ঠেকনা দেওয়া উচিত।

পাঁজ কি ভাবে ধরিতে হয় ঃ—

এক হাতে কাটিবার সময় অপর হাতে পাঁজ ধরা দরকার। প্রথম পদ্ধতিতে পাঁজ বাম হাতে ধরিতে হয়। পাঁজের লেজ (পাঁজের যে মাথা সরু ও যাহার আঁশ খোলা; তাহাকে লেজ বলা হয়) অনামিকা ও বুড়া আঙ্গুলের চিমটিতে ধরা উচিত এবং পাঁজের উপরি ভাগ মধ্যমা ও তর্জনীর ফাঁকে ধরিয়া বাকী পাঁজ আঙ্গুলগুলির পিঠের উপর ঝুলিয়া থাকিতে দিন।

চিমটি ও ধারণ ঃ—

পাঁজ ধারণের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঙ্গুলের ডগার পাব কাজে লাগে। সুতা কাটার সময় হাতের তালু আপন দিকে থাকে। পাঁজের লেজ ধরার জন্য যে সমস্ত আঙ্গুলের চিমটি তৈরী হয়। উহারা থাকে পরস্পর মুখোমুখি। কিন্তু পাঁজের উপরিভাগ মধ্যমা ও তর্জণীর মধ্যে থাকিয়া পিছনের দিকে বাহির হইয়া থাকে। কড়ে আঙ্গুলটি খোলা কিন্তু অনামিকা সাঁটিয়া থাকে।

চিমটি ও ধারণের কাজ ঃ—

চিমটি ও ধারণের কাজ হইল পাঁজ সামলানো এবং উহা সামনে সরানো। সুতা কাটার সময় পাঁজটি যেমন শেষ হইতে থাকে, বুড়া আঙ্গুলটি ততই অন্যান্য আঙ্গুলগুলির সাহায্যে উহা সামনের দিকে সরানোর কাজ করিতে থাকে। পাকের উপর নজর ও নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য কড়ে আঙুলটি খোলা এবং বুড়া আঙ্গুলটি পাঁজের পিছন হইতে একটু উপরের দিকে অনামিকায় ঠেকাইয়া রাখা দরকার।

প্রথম ধাগা (সুতার নাল) ঃ—

তকলিকে কি ভাবে গতিবেগ বা দ্রুতি দিতে হয় এবং পাঁজ কি ভাবে ধরিতে হয়, তাহা দেখিয়া লওয়ার পর সূতা কাটা কি ভাবে শুরু করিতে হয়, সে দিকে লক্ষ্য করা আবশ্যক। পাঁজের লেজে তকলির নাক ঢুকাইয়া তকলিটি কার্ডবোর্ড বা দফ্তির উপর ঠেকাইয়া ধীরে ধীরে ঘুরাইতে হয়। ঘুরানোর সাথে সাথে বাম হাত ধীরে ধীরে উপরে উঠানো উচিত। সুতা কাটার সময় আরম্ভে তকলি ডান হাতে ঘুরাইতে হয়। এই ভাবে তর্জণী ও বুড়া আঙ্গুলের ঘেরের মধ্যে তকলিটি সিধা হইয়া ঘুরিতে থাকে।

না ঠেকাইয়া গুটানো ঃ—

এই ভাবে তকলির বরাবর দুই ফুট ধাগা বাহির করিয়া পরে তকলির নাকে আটকানো ধাগার আগা চিমটি দিয়া নীচে সরাইয়া চাকতির সঙ্গে ভিড়াইয়া দিতে হয় এবং গুটানোর জন্য তকলিটি হাতে তুলিতে হয়। মধ্যমা ও উহার সাথের দুইটি ছোট আঙ্গুলকে বুড়া আঙ্গুলের কবজীর দিকে নিয়া আসুন এবং আঙ্গুলটিকে অপর পাশে নিয়া উনা দ্বারা তকলির মাথা চাপিয়া দিন। ইহাতে তকলিটি মধ্যমার সহযোগে উল্টাইয়া যাইবে এবং উহার ডাঁটটি মুঠোর মধ্যে চলিয়া আসিবে। আবার তর্জনীকেও অন্য আঙ্গুলগুলির পাশে লইয়া যান এবং চিমটি দ্বারা তকলিটি সোজা দিকে (ঘড়ির কাঁটার মত ডান দিকে) ঘুরান। কেহ কেহ তকলি হইতে হাত সরাইয়া এবং উহা উলটা করিয়া ধরিয়া একদম উপরে উঠাইয়া লয়। তর্জণী ও বুড়া আঙ্গুল তো তকলিতে ধাগা গুটানোর কাজ করে, কিন্তু বাকী আঙ্গুলগুলি উহার উলটা দিকে ঘুরের পক্ষে বাধা জন্মায়। গুটানোর সময় তকলিটি ভূমির সহিত সমান্তরালও থাকে না অথবা সমকোণেও থাকে না, পক্ষান্তরে ভূমির সতি ৫০°—৫৫° কোণ তৈরি করিয়া রাখা হয়। ধাগাটি ডাঁটের সমকোণ করিয়া রাখা দরকার। পাঁজের মাথা চিমটিতে চাপিয়া রাখা উচিত, যেন গুটানোর সময় ধাগা টান থাকে। টান ও এতখানি রাখা দরকার যেন তকলির উপর সুতা ফাঁপা হইয়া না জড়ায়। গুটানোর সময় পাঁজওয়ালা হাত তকলির কাছে নিয়া আসিতে হয়।

হাতের ধাগা ঃ—

তকলিতে কাটা সবখানি সুতা উহাতে গুটানো হয় না। প্রায় এক বিঘত

বা ৮।৯ ইঞ্চি ধাগা বাকী রাখিয়া অগুটানো অবস্থায় থাকিতে দেওয়া হয়। এরূপ না করা হইলে, নয়া ধাগা বাহির করার জন্য তকলিতে-দেওয়া-পাক ছোট ধাগায় সহ্য করিতে পারে না, ফলে উহাতে মোচড় লাগিয়া পাক পাঁজের মধ্যে ঢুকিয়া যায় এবং তকলি ঘেরা বন্ধ হইয়া যায়। নূতন শিক্ষার্থী প্রায়ই ইহাতে ভুল করিয়া বসে। এজন্য নূতন ধাগা বাহির করার সময় তকলির নাক ও পাঁজের মধ্যে এতখানি ব্যবধান রাখা উচিত যাহাতে পাক ভালো রকম বিস্তার লাভের সুযোগ পায়। তকলির বাহিরে রাখা এই ধাগাকে "হাতের ধাগা" বলা হয়। যোগ অঙ্ক করার সময় যেমন দশক সংখ্যাকে হাতের অঙ্ক পরবর্তী সংখ্যার সহিত তাহা যোগ করিয়া দেওয়া হয়, সেই ভাবে এই ধাগাটিকেও পরবর্তী নয়া ধাগায় মিলানো হইয়া থাকে। এই জন্য ইহাকে "হাতের ধাগা" বলে।

এই ভাবে কাটা সুতা গুটানোর পরে তকলিটি আবার নীচে ঠেকাইয়া দিতে হয়। এই সময় আঙ্গুলগুলির আবার স্থান বদলানো দরকার। এইবার তর্জনীকে বুড়া আঙুলের দিকে আনিয়া বুড়া আঙ্গুলটি বাহির করিয়া লইতে হইবে। এবং উহাকে অন্যান্য আঙ্গুল গুলির পাশে নিয়া উহার সাহায্যে তকলিটি মধ্যমার ঠেকনা উলটাইয়া দিতে হইবে; পরে অন্যান্য আঙ্গুলগুলি তর্জনীর পাশে লইয়া যাইতে হইবে। পরে আবার তকলিটি নীচে ঠেকাইয়া ঘুরানো হয়। সাথে সাথে ধাগা ও ডাঁটের মধ্যবর্ত্তী কোন যেন ১২০° হইতে ১৫০° পর্য্যন্ত বাড়িতে থাকে যাহাতে ধাগা ডাঁটের গায়ে সাপের মতো জড়াইয়া নিজে নিজেই নাকের সহিত আটকাইয়া যায়। ইহার পরে প্রথম বারের মতো চিমটি দ্বারা অল্প অল্প গতি দিতে হইবে ও অল্প সুতা কাটা শুরু করিতে হইবে। ধাগা ৪-৪½ ফুট লম্বা করিয়া বাহির করা উচিত অবশ্য, হাতের দৈর্ঘ্য অনুসারে ধাগার দৈর্ঘ্য কম বা বেশী হইবে। অর্থাৎ বালকদের ধাগা হইবে খাটো আর বয়স্কদের লম্বা। এখন এই দ্বিতীয় ধাগাটি গুটানোর সময় প্রথম প্রক্রিয়াটি ব্যতীত আর একটি কাজও করিতে হয়। তকলিটি একটু উল্‌টা দিকে ঘুরাইয়া নাকের নীচের ডাঁটের উপর মাপের মত জড়ানো সুতা খুলিয়া লইতে হয়। এই ভাবে খোলার জন্য ও তকলিটি প্রথমবারের মতো হাতে উলটাইয়া ধরিতে হইবে এবং ধাগাটি গুটাইয়া আবার কাটা সুরু করিয়া দিতে হইবে।

তকলিটি অল্প অল্প ঘুরাইয়া ও পাঁজ হইতে অল্প অল্প ধাগা টানিয়া বাহির করিবার রীতি আরম্ভে এমন দুই চার দিন চালু রাখিতে হয় যতক্ষন না সাধা-

রণতঃ ভালো স্থতা কাটা হইতে থাকে। এতখানি সাধিত হওয়ার পরে আবার তকলিটি একটু জোরে ঘুরাইয়া তাড়াতাড়ি নাক হইতে ৮—৯ ইঞ্চি উপরে ধাগাটি ধরিয়া ধীরে ধীরে টানিতে থাকা উচিত। পাঁজের ধাগা টান কমিয়া রাখিলে এবং তকলির অনি মাটির উপর ঠেকানো থাকিলে হাত সরাইয়া লইলে পরও তকলিটি সিধা ঘুরিতে থাকে এবং মাটির উপর পড়িতে পারে না।

তকলি ঘুরানোর পরে ধাগা বরাবর টানিতে থাকা উচিত। নিপুণ কাটুনী প্রায়ই দুইটি চিমটির মধ্যেই সমগ্র ধাগাটি বাহির করিয়া লয়, কিন্তু সব ধাগাটা বাহির করিতে নয়াকাটুনীকে কয়েকবার তকলি ঘুরাইতে হয়। একবার রানোর পরে ধাগা টানার সময় দ্রুতি কমিয়া আসে। সেই সময় আবার তকলি ঘুরাইয়া দেওয়া আবশ্যক এবং ঘুরানোর এই কাজ সমগ্র ধাগাটি বাহির হওয়া অবধি এই ভাবেই চালু রাখিতে হয়। এরূপ না করিলে তকলির ঘুর বন্ধ হইয়া যাইবে এবং ধাগা ছিঁড়িয়া যাইবে। যাহার তকলি ঘুরানো শিক্ষা ভালো হয় নাই, তাহার তকলি খুব তাড়াতাড়ি থামিয়া যায়। সে পাঁজের দিকে নজর রাখিয়া কাটিতে থাকে, এদিকে তকলির দ্রুতি মন্থর হইতে হইতে তকলি থামিয়া আবার উল্‌টা দিকে ঘুরিতে থাকে। এই ভুলের দরুণ পাক খুলিয়া স্থতা ছিঁড়িয়া যায়। দ্রুতি কখন কমে, তাহা জানার জন্য তকলির দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন নাই। ধাগায় লাগানো পাকের এবং পাঁজ সংলগ্ন ধাগার দৃঢ়তা দ্বারা এই ব্যাপারটি বুঝা যায়। ইহা ব্যতীত, তকলির নাকের উপরিতন ধাগা নিয়ামক ডান হাতের চিমটি ও এই ব্যাপারটি অনুভব করিয়া থাকে। দ্রুতি অর্থাৎ গতিবেগ যে হইতেছে, ইহা চিমটিতেই শীঘ্র জানা যায়। পাক দেওয়া, ধাগা ধারণ করা ও টানা ইত্যাদি কাজ এবং চিমটি চালানো, উহার চাপ কম বেশী করা, ডান হাতের চিমটি দিয়া স্থতা ফিরানো ইত্যাদি প্রক্রিয়া নয়া কাটুনী একই সাথে সম্পাদন করিতে পারে না। একটি কাজ করার সময় সে অন্য কাজ ভুলিয়া যায় অথবা উহাতে দেরী হইয়া যায়, ফলে কাটাই কাজে অস্থবিধা হয়। কিন্তু কাটাইয়ের কাজে হাতের যে সূক্ষ্ম প্রক্রিয়ার আবশ্যক হয়, তাহার প্রতি নজর রাখিয়া এবং সেই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কাটাই মক্‌শ করিলে অল্প দিনের মধ্যেই হাত অভ্যস্ত হইয়া যায় এবং স্থন্দর সাফ ও মজবুত স্থতা বাহির হইতে থাকে।

যতদূর সম্ভব একটি চিমটিতে পুরা ধাগা বাহির করার চেষ্টা করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে ঘষিয়া দ্রুতবেগে ও আঙ্গুলগুলির সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া পাক

দিতে হয়। অথচ তকলিতে ঝাঁকুনি লাগা উচিত নয়। হাতের আঙ্গুলগুলি যেন পরস্পরের উপর সিধা ও বরাবর থাকিয়া সরিতে থাকে যাহাতে ঝাঁকুনি না লাগে এবং তকলি ভালো মতন ঘোরে।

নজর কোথায় রাখা উচিত ?

কাটাইয়ের সময় নজর সর্ব্বদাই নূতন বাহিরে আসা ধাগার উপর অর্থাৎ পাঁজ ওয়ালা হাতের চিমটি হইতে নির্গত আঁশের উপর থাকা দরকার। গুটানোর সময় ডাঁটের উপর জড়ানো সুতার দিকে নজর রাখা উচিত! এই ভাবে লক্ষ্য রাখিলে ইচ্ছা মতন নম্বরের সুতা কাটা এবং সহজে শঙ্কু (কীলক)র আকারে সেই সুতা গুটানো যাইতে পারে।

পাঁজ ওয়ালা হাতে টানা :—

ডান হাতের চিমটি দিয়া ধাগা টানিলে প্রত্যেক টানের সাথে ধাগা সমানে ভাবে কাটা হয় না ; এজন্য সাথে সাথে পাঁজওয়ালা হাতে ও টানায় কাজ করিতে থাকিলে সুতার এই বৈষম্য দূর হয়। কিন্তু সব চেয়ে ভালো হয়, চরকায় সুতা কাটার মধ্যে যে ভাবে পাঁজ ওয়ালা হাতে ধাগা টানা হয়, যদি সেই ভাবে তকলিতেও সুতা টানা যায়। এই ভাবে টানিলে সুতা কোথাও মিহি থাকিতে পারে না তকলি বারে বারে ঘুরাইলে এবং ধাগা অল্প অল্প টানিলে সুতার মোটাই সমান থাকিতে পারে না, কারণ, তকলিওয়ালা হাতে এক সমানে টান দেওয়া যায় না। কারণ এই যে, ধাগার পাক উপর দিকে যাইতে দেওয়ার জন্য তকলি ওয়ালা হাতের ধারণ বারে বারে ঢিলা করিতে হয়। এজন্য টানার কাজের ভার পাঁজ ওয়ালা হা তর উপরেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

দুই হাতের পৃথক পৃথক কাজ :—

(১) **পাঁজ ওয়ালা হাত :**—সুতা কাটার সময় পাঁজ ওয়ালা হাতে এক নাগাড়ে সমান ভাবে টানা দরকার, চিমটি সাহায্যে আঁশের উপর পুরা নিয়ন্ত্রণ রাখা উচিত, পাঁজের ভিতরে পাক ঢুকিতে দেওয়া উচিত নয়, আর গুটানোর সময় সেই হাতে ধাগা টান করিয়া রাখিতে হয়।

(২) **তকলি ওয়ালা হাত :**—তকলি ওয়ালা হাতে তকলি ঘুরাইতে হয়, সুতা কাটার সময় সেই হাতের চিমটিতে ধাগা ধরিয়া উহা সিধা রাখা উচিত,

পাকের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা আবশ্যক, ধাগার মধ্যে চলিয়া আসা গাঁট, তুলার গোলা ও আবর্জনা ইত্যাদি বাছিয়া ফেলা দরকার এবং সেই হাতেই কাটা ধাগা তকলিতে গুটাইতে হয়।

পাকের নিয়ন্ত্রণ ও প্রসারণ :—

গরুর গাড়ীতে যে ভাবে গরুর পিছনে গাড়ীর চাকা দৌড়াইতে থাকে, সেই ভাবে আঁশ ছাড়িয়া দেওয়া চিমটির পিছে পিছে পাক ও এক নাগাড়ে দৌড়িতে থাকে। এই ধাবমান পাককে ঠিক ঠিক বশে রাখা এবং তাহা নিয়ন্ত্রণ করা অর্থাৎ বাহির হওয়া ধাগার পুরা দৈর্ঘ্যের বরাবর পাক সমান ভাবে ছড়াইয়া দেওয়ার কাজ তকলিওয়ালা হাত আপন চিমটির সাহায্যে সাধন করিয়া থাকে। ধাগা টানা কালে চিমটির আঙ্গুলগুলি ইহাকে ঢিলা করিয়া সিধা দিকে ফেলিতে থাকে, ফলে পাকের পাঁজ অবধি পৌছনোর সুযোগ মিলে। চিমটির ধারণ শক্ত থাকিলে পাক উপর অবধি যাইতে পারিবেনা, ধাগা বাহির হওয়া থামিয়া যাইবে, চিমটি ও তকলির নাকের মধ্যবর্তী ধাগায় বেশী পাক পড়ায় উহাতে মোড়া পড়িবে এবং কোথাও কোথাও খুব অতিরিক্ত পাক হওয়ায় নাকের কাছ হইতে ধাগা ছিঁড়িয়া যাইবে। এই জন্য ডান হাতের চিমটি ঢিলা রাখা এবং উহা সোজা দিকে ঘুরাইতে থাকা একান্ত দরকায়।

পাক ও টানের মিলন :—

পাঁজ ওয়ালা হাতের উপর দিকে উঠা এবং পাকের দ্রুতি এই দুইটি ব্যাপারের যথাযথ মিলনের উপরেই সুতার সাফাই, দৃঢ়তা ও নিকাশ অর্থাৎ বাহির হওয়া নির্ভরশীল। পাঁজওয়ালা হাত ধীরে ধীরে চলিতে থাকিলে অথচ পাকের দ্রুতি বেগযুক্ত হইলে পাক পাঁজে ঢুকিয়া এত বেশী আঁশ ধরিয়া লইবে যে, সুতা টানা মুশকিল হইয়া পড়িবে। জোর জবরদস্তি করিলে সুতা ছিঁড়িয়া যাইবে। অথবা খুব মোটা ও এবড়ো-খেবড়ো হইয়া বাহির হইবে। এরূপ অবস্থায় পাঁজের ভিতরে পাক ঢোকার আগেই তকলি ওয়ালা হাতের চিমটি দিয়া উহাকে মাঝ-পথেই কোথাও আটকাইয়া রাখিতে হয় এবং পাঁজ ওয়ালা হাত তাড়াতাড়ি বাড়াইয়া পাক ছড়ানোর জন্য জায়গা করিয়া দিতে হয়। অনুরূপ ভাবে, পাঁজ ওয়ালা হাত তাড়াতাড়ি চলিতে থাকিলে অথচ পাক পিছনে পড়িতে থাকিলে আঁশ ভালো রকম পাক খাইবে না অর্থাৎ সুতা দুর্বল

ও পাতলা হইয়া হয়তো ছিঁড়িয়াও যাইবে। এরূপ অবস্থায় পাঁজওয়ালা হাত ধীরে ধীরে উপরে উঠানো দরকার এবং তকলি তাড়াতাড়ি জোরে ঘুরাইয়া ধাগার আবশ্যক পাক পৌছনো আবশ্যক। ইহার অর্থ এই যে, তকলির দ্রুতি কমিতেই উহা ঘুরাইয়া দেওয়া, পাক বেশী হইয়া থাকিলে উহা পাঁজের ভিতরে ঢুকিলে না দেওয়ার উদ্দেশ্যে মাঝ পথেই আট্‌কাইয়া দেওয়া এবং তকলি সিধা রাখিয়া এক সমান ভাবে পাক ছাড়িতে থাকা—এই ভাবে তকলি ওয়ালা হাতের চিমটিকে তিন রকম কাজ করিতে হয়।

ভাল বা খারাপ সুতা :—

নয়া কাটুনী মনে করে যে, সুতা যত মিহি হয়, ততই ভালো। এজন্য মিহি সুতা কাটাকে সে ভালো সুতা কাটার অর্থ বলিয়া মনে করে এবং সেই জন্য অল্প পাক দিয়াই খুব দ্রুতবেগে ধাগা টানিয়া যাইতে থাকে। ইহাতে সুতা মিহি হয় ঠিকই, কিন্তু উহা কাঁচা ও সরু মোটা হইয়া থাকে। সুতা যত মিহি হয়, ততই উহাতে বেশী পাক দিতে হয়, একথা সে জানে না। এই কাঁচা সুতা তকলিতে কড়া করিয়া গুটানো যায় না ; এজন্য নয়া শিক্ষার্থী উহা ঢিলা করিয়া গুটায়। ইহাতে সুতার গুটি ফাঁপা হয় এবং কাটাইয়ের সময় উহা ঢিলে ঢিলে হইয়া যায়, উহাতে হাওয়া ঢোকে এবং এই বিষয়ের জন্যই তকলির পুরা দ্রুতি কোন ভাবেই মিলে না। এই সুতা গুটানোর সময় বারে বারে ছিঁড়ে এলো মেলো হইয়া যায় এবং উহা বুননের কাজে লাগানো খুব মুশকিল হইয়া পড়ে।

ফুস্‌ফুসা সুতা :—

কোন কোন কাটুনী প্রথমে কাঁচা সুতা বাহির করে ও পরে উহা খুব পাক দিয়া শক্ত করে। কিন্তু এই রকমের সুতা খারাপ, উহা পরিষ্কার হয় না, উহাতে স্থিতি স্থাপকতা তথা শক্তি থাকে না এবং উহার আঁশ বিশ্রী ভাবে পাকায় অর্থাৎ উহা ফুস্‌ফুসা হয়। এই ধরণের সুতা খুব কষ্টে বুনানো হয়। খালি সুতা তৈরির জন্য তো আর সুতা কাটা হয় না, উহা তৈরী হয় কাপড় বুনানোর জন্য। অর্থাৎ যে সুতা বুনানোর উপযুক্ত না হয়, তাহা অকেজো মনে করা উচিত। বুনানোর উপযোগী সুতা মজবুত, সমান, স্থিতিস্থাপক ও পরিষ্কার হওয়া দরকার। এই কথা নয়া শিক্ষার্থী প্রায়ই ভুলিয়া যায়। সে এই আনন্দেই মত্ত হয় যে, তাহার সুতা কাটাতো হইতেছে।

মোচড় খাওয়া সুতা ঃ—

ইহার বিপরীত, কোন কোন লোক আবার খুব পাক দিয়া সুতা কাটে। ইহাও ঠিক নয়। এই ধরনের সুতায় এক নূতন দোষ জন্মে। উহা মোচড় খায় এবং উহাতে এমন পাক পড়িয়া যায় যাহাতে সুতার একান্ত প্রয়োজনীয় স্থিতিস্থাপকতা গুণ নষ্ট হইয়া যায়। মাড় লাগাইলে এই ধরনের সুতা কুঁকড়ে যায় এবং ছিঁড়েও খুব বেশী, ফলে ইহা বুননের উপযুক্ত হয় না।

উৎকৃষ্ট নিখুঁত সুতা ঃ—

ঠিক রীতিতে অর্থাৎ আরম্ভেই আবশ্যক পাকদিয়া কাটা সুতায় উল্লিখিত দোষগুলি মোটেই থাকে না। কারণ টানা হওয়ার আগেই আঁশের উপর পাকের ধারণ কায়েম হইয়া থাকে। পাকের এই ধারণ হেতু টান খাইয়া বহিয়া আসা সমস্ত আঁশ ভালো রকম পাক খায়, ফলে সুতা পাকানো, মসৃণ ও সাফ হইয়া থাকে। উহার গায়ে খোলা আঁশ দেখা যায় না, এবং উহা ছুঁইলে ফুস্‌ফুসা বা চ্যাপটা বোধ হয় না। এরূপ সুতায় প্রয়োজনের চাইতে বেশী বা কম পাক হয় না। টানের সময় পুরা পাক থাকায় ধাগাটিকে পরে আরও অতিরিক্ত পাক দেওয়ার আবশ্যকতা পড়ে না। পরে পাক দিলে উহা মোচড় খাইতে থাকে।

এজন্য পুরা পাক দিয়াই সুতা বাহির করা উচিত। পরে পাক দিয়া মজবুত করা সুতা ফুস্‌ফুসা, মোচড় খাওয়া ও নিম্নস্তরের হইয়া থাকে। এরূপ খারাপ সুতা তাঁতী কখনও পছন্দ করে না।

সুতা মোটা মিহি কেন হয় ঃ—

ইহার বিশেষ কারণ তিনটি ঃ—(১ কমবেশী পাক, (২) পাঁজের উপর চিমটির চাপ ও ধাগার টান কম বেশী হওয়া এবং (৩) পাক দেওয়া ও টানা প্রক্রিয়ার মধ্যে মিল না থাকা। তুলার এবং ধুনাইর দোষের জন্য ও সুতা মোটা মিহি হয়। তকলি ঠিক না থাকিলেও সুতা খারাপ বাহির হয়। কিন্তু সুতা মোটা মিহি হইয়া কেন আসে তাহার প্রধান কারণ তিনটিই। এজন্য সেই সম্পর্কেই আলোচনা করিব।

কারণ

তকলিকে একবার দ্রুতি দেওয়ার পরে উহা অনেকক্ষণ পর্যন্ত আবার না ঘুরানো হইলে উহার চালে ঢিম পড়ে। ইহাতে আরম্ভে সুতার পাক তো

ভালোই জোটে, কিন্তু পরে গিয়া উহা কমিয়া যায়। অর্থাৎ আরম্ভের ধাগা পাকযুক্ত এবং শেষের ধাগা মিহি ও দুর্বল হয়। পরে আবার তকলি ঘুরাইলে পুরা পাক মিলে এবং সুতা ও ঠিক হইতে থাকে। কিন্তু আবার দ্রুতি কম পড়িলেই সুতা ছড়াইয়া পড়ে ও দুর্বল হয়। এই ভাবে পাকের জোয়ার-ভাটা হেতু সুতা কোথাও মিহি, কোথাও মজবুত এবং কোথাও দুর্বল বাহির হয়। এই দোষ হইতে মুক্তির উপায় একটিই, —তকলির দ্রুতি সমান রাখা। তকলির দ্রুতি ঢিলা হইতে না হইতেই উহা আবার ঘুরাইয়া দ্রুতি বজায় রাখা উচিত। জাং অথবা পিণ্ডির উপর পাক দিলে দ্বিতীয় বার ঘুরানোর প্রয়োজন হয় না।

উপায়—১নং

পাঁজ ওয়ালা হাতের চিমটির সাহায্যে পাঁজের উপর সমান চাপ রাখা উচিত। চিমটি ঢিলা করিলে আঁশ বেশী বাহির হইয়া সুতা মোটা হইয়া আসিতে থাকে। চিমটি শক্ত রাখিলে মিহি সুতা বাহির হয়, কারণ, তখন আঁশ অল্প অল্প আসে। চিমটি কখনো কড়া ও কখনো ঢিলা করিলে আঁশের উপর সমান চাপ থাকে না এবং সেই কারণে সুতাও এক সমান আসে না। এজন্য এক সমান সুতা কাটার জন্য চিমটির ধারণ এক-সমান রাখা দরকার।

উপায়—২ অ

সুতা কাটার সময় তকলি ওয়ালা হাতে টানার কাজ, যতদূর সম্ভব, না করাই উচিত। এই কাজ পাঁজওয়ালা হাতেই করা দরকার, ইহাতে ধাগার উপর এক সমান টান থাকিবে এবং সুতাও মোটা মিহি হইতে পারিবে না। এই কথা ঠিক নয় যে, কেবল ঠেকাইয়া কাটার সময়ই এরূপ ভাবে কাটা যায়। তকলি না-ঠেকাইয়া ঝুলাইয়া কাটার সময়ও তকলি ওয়ালা হাতের বদলে পাঁজ ওয়ালা হাতে টানার কাজ চালানো যাইতে পারে।

উপায়—২ আ

সুতা একসমান বাহির হওয়া পাকের উপর বা টানার উপর ততখানি নির্ভরশীল নহে, যতটা এই উভয়ের মিলের উপর। ধাগা টানার আগে আঁশের উপর পাশের ধরণ সমান রাখিলে সুতা মোটা মিহি হয় না, কিন্তু নয়া শিক্ষার্থীর পক্ষে আরম্ভে এই ব্যাপার সাধন সম্ভবপর হয় না। সে হয়তো পাক বেশী দিয়া দেয় অথবা সুতা তাড়াতাড়ি টানে। প্রায়ই সে পাক বেশী চড়াইয়া দেয় অথবা ইহা বলা ঠিক হইবে যে, তাহার পাঁজ ওয়ালা হাত খুব ধীরে ধীরে উপরে উঠে। আরম্ভে হাত সাধা

উপায়—৩

না থাকিলে ঝট্পট্ কাজ হয় না। কাটার সময় ছোট বড় অনেক রকমের প্রক্রিয়া পর পর বিনা বিলম্বে করিতে হয়। দেরী করিলে কাজ নষ্ট হইয়া যায়। কাটার দিকে বরাবর মন দিতে হয়। প্রথমে তকলি ঘুরাইতে হয় ও পরে দ্রুতি অনুসারে ধাগা টানিতে হয়। তকলি দ্রুতবেগে ঘুরিলে টানার কাজও তাড়াতাড়ি চালানো উচিত। নয়া কাটুনী তাড়াতাড়ি ধাগা টানিতে পারে না, এইজন্য তাহাকে আপন অভ্যাস মত তকলি ঘুরাইতে হয়। ইহাতে কাজ অবশ্য কম হইবে, কিন্তু কাজ ভালো হইবে। টানায় যেমন যেমন ক্ষিপ্রতা বাড়িতে থাকিবে, তেমনি তেমনি তকলিরও বেশী বেগ দেওয়া সহজ হইতে থাকিবে। এই সব কথা বিবেচনা করিয়াই প্রথমে আঙ্গুল দিয়া, পরে জাং-এর উপর এবং সব শেষে পিণ্ডির উপর পাক দেওয়ার পরম্পরা ব্যবস্থিত হইয়াছে।

গুট্‌লিদোষ সারানো ঃ

এক সমান সুতা বাহির করার দিকে মন দেওয়ার পরেও অন্যান্য দোষের জন্য প্রথম প্রথম সুতার গুটলি পড়িবার অনেক কিছু সুযোগ থাকে। তাহা কি ভাবে দূর করিতে হয়, উহা জানিয়া লওয়া সঙ্গত।

গুট্‌লি ছোট মতন হইলে কাটিতে কাটিতেই তকলি ওয়ালা হাতে উহার লাগাও ধাগা ধরিয়া ধীরে ধীরে টানিয়া উহা পাতলা করিয়া দেওয়া উচিত। ফুস্‌ফুসা অর্থাৎ ফাঁপা গুট্‌লি এভাবে সহজেই পাতলা করা যাইতে পারে।

ফুসফুসা গুটলি

এই গুট্‌লি বা গোলা প্রায়ই ফুস্‌ফুসাই হয়। উহার আঁশ গুলি ভালো করিয়া নিজের মধ্যে পাকানো হইয়া থাকে না। গুটলির দুই পাশের সুতা প্রায়ই একদম পাতলা হইয়া যায় এবং উহা অল্প টানেই না ছিঁড়িয়া থাকিতে পারে না। কাটার সময় ধাগার মোটা অংশটুকু আঙ্‌ুলগুলির প্রভাবে চাপিয়া গোল হইয়া যায় এবং উহার স্থূলতা অবশিষ্ট সুতার স্থূলতার সমান হইয়া পড়ে। গুটুলি টানিয়া পাতলা করার সময় পাঁজ ওয়ালা হাতের কড়ে আঙ্‌ুল ও বুড়া আঙ্‌ুলের চিমটি দিয়া পাক আট্‌কাইয়া উহার পাঁজে ঢুকা বন্ধ করিতে হয় অর্থাৎ কাটাই একটু বন্ধ বা ঢিলা করিয়া দেওয়া উচিত। আরম্ভে ইহা আবশ্যক মনে হইবে। কিন্তু অভ্যাস হইয়া গেলে কাটাই চালু রাখিয়াও গুট্‌লি ঠিক করা যাইতে পারে।

নয়া কাটুনীর সুতায় অতিরিক্ত পাকের দরুণ যে গুট্‌লি পড়ে, তাহা এত

সহজে দূর হয় না, কারণ, এই গুটলির দুই মাথাতেই পাক খুব বেশী থাকে। এজন্য কাটা বন্ধ করিয়া দুই হাতের চিমটি দিয়া গুটলির উভয় প্রান্ত ধরিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী পরস্পরের উল্‌টা দিকে ঘুরাইয়া পাক খুলিয়া লইতে হয় এবং উভয় দিকে ধীরে ধীরে টানিয়া গুটলি পাতলা করিয়া বাকী সুতার সমান মোটা করা দরকার। এই ভাবে সুতা সমান হইয়া যাইবে।

পাকানো গুটলি

গুট্‌লি বাহির করিয়া ফেলা :—

কখনো কখনো পাঁজ হইতে গুটলি ছুটিয়া যায়, ফলে ধাগা ছিঁড়িয়া যায়। ইহার কারণ খারাপ ধুনাই। ধুনাই সমান রকম না হইলে পাঁজের ভিতরে আঁশের গুটলি থাকিয়া যায়। এই গুটলি অবধি পৌছানো পাক পিছনের আঁশে গিয়া পৌছিতে পারে না, ফলে উহা আশ্রয় অভাবে পাকের টানে বাহির হইয়া আসে। উত্তম ধুনাই হইলেই এই দোষ দূর হয়। অথচ পাঁজের উপর চিমটির ধারণ এবং নজর ভালো ভাবে রাখিলে ও ইহার প্রতিকার করা যাইতে পারে। পাঁজের মধ্যে অবস্থিত গুটলি ও বীজ ইত্যাদি খারাপ জিনিষ তো চিমটিরই অনুভব হইতে থাকে। এই সুবিধার দিকে একটু সতর্ক থাকিলে কাজ ঠিক মত সম্পন্ন হইতে পারে।

পাঁজ হইতে ধাগা বাহির হইয়া পড়িলে অর্থাৎ ছুটিয়া গেলে, এলোমেলো হইবার আগেই পাঁজ ওয়ালা হাতে তুলিয়া পাঁজের উপর রাখিয়া তৎক্ষণাৎ কাটা শুরু করিতে হয়। খেই তুলিয়া লওয়ার সময় তকলির দ্রুতি যেন বন্ধ হইতে না দেওয়া হয়।

ছুটা ধাগা তোলা

এই ভাবে সুতা কখনো কখনো খুব সরু হইয়া যায়। সেই সময় ধাগা ছিঁড়িয়া যাওয়ার অপেক্ষা না করিয়া নিজেই উহাকে পাঁজ হইতে বাহির করিয়া এবং সরু অংশ টুকু পাঁজের উপর রাখিয়া কাটা শুরু করা উচিত। এইরূপে বেশী আঁশ জড়ানোর ফলে সেই সরু সুতা ও বাকী সুতার মত মোটা হইয়া যায়। এই কাজ করার সময় তকলি নীচে রাখার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সতর্কতার সহিত এই কাজটি করিয়া লইতে হয়।

সুতা ছিঁড়িয়া এলা

ছিঁড়িয়া যাওয়া ঃ—

এপর্যন্ত যে সব কথা বলা হইয়াছে, সে সব দিকে মনোযোগ দিয়া কাটিলে সুতা বেশীর ভাগ ছিঁড়িবেই না। কিন্তু কাটাইয়েতে সতর্কতা এবং নিখুঁত যন্ত্রপাতির মিলন ঘটানো সব সময়ে সম্ভব নয়! এজন্য কাটার সময় সুতা অল্প বিস্তর ছিঁড়েই। বারে বারে ছিঁড়িলে কাটুনীর উৎসাহ চলিয়া যাইতে থাকে এবং উহার মনও আর সুতা কাটিতে চাহে না। ছিঁড়িলে সুতা খারাপ বাহির হয়, দ্রুতি কমিয়া যায়, তুলা খারাপ হয় ও কাটাইয়ের উন্নতি হয় না।

ফল

ইহার অর্থ এই যে, ধাগা ছিঁড়িলে কাটুনীর আর্থিক ও মানসিক উভয় দিকেই ক্ষতি হইয়া থাকে। এজন্য অটুট সুতা কাটার দিকে যতটুকু মন দেওয়া যায়, ততটুকুই লাভ।

তকলিতে কাটার সময় ধাগা প্রধানতঃ তিন জায়গায় ছিঁড়ে। (১) তকলির নাকের পাশে। (২) নীচের চিমটি ও পাঁজের মধ্যে এবং (৩)

জায়গা

পাঁজের মধ্য হইতে। চিমটি দিয়া ধাগা শক্ত করিয়া ধরিলে পাক উপরে চড়িতে পারে না এবং নাক হইতে চিমটির মাঝখানে পাক বেশী না থাকায় উহা নাকের বা চিমটির পাশে ছিঁড়িয়া যায়। চিমটির উপরের ধাগা কাঁচা মোটা বা মিহি হইলে বা উহার আবশ্যক পাক না মিলিলে উহা ছিঁড়িয়া যায়। কম পাকের দরুণ ধাগা পাঁজ হইতে বাহির হইয়া আসে। ভালো ধুনাই না হইলেও কিন্তু ধাগা বারে বারে পাঁজ হইতে খসিয়া ছিঁড়িয়া যায়। পাঁজের মধ্যে অ-ধুনা তুলার ছোট-বড় ফুসড়া থাকিলে ধাগা বারে বারে পাঁজ হইতে খসিয়া পড়ে, কারণ ফুসড়া আঁশ আলগা আলগা সিধা ও সমান্তরাল না হওয়ায় এবং পাঁজের বাকী আঁশের সহিত মিলিয়া না থাকায়, একলাই বাহির হইয়া আসে, ফলে, ধাগা ছিঁড়িয়া যায়।

কারণ

পাঁজে কচড়া (আবর্জনা) থাকিলেও ধাগা ছিঁড়ে; বিশেষতঃ ভাঙা বীজের টুকরা থাকিলে তো উহা না ছিঁড়িয়াই পারে না। সাফতুলা লওয়া এবং উত্তম ধুনাই করা—ইহাই ইহার প্রতিবিধান।

তকলিতে উলটা পাক লাগিলে, উহা আড় হইলে অথবা উহাতে ঝাঁকুনি লাগিলে ধাগা ছিঁড়িয়া যায়। কাটার সময় ধাগা ছিঁড়িবার ইহারাই প্রধান প্রধান কারণ। কারণ বুঝিয়া লইলে উহাদের প্রতিকার সহজে করা যাইতে পারে।

জোড়া দেওয়া ও মোড়া লাগানো ঃ—

ছেঁড়া ধাগা কি ভাবে জুড়িতে হয়, এখন সে বিষয়ে আলোচনা করিব। ধাগা ছিঁড়িবামাত্রই কাটাই বন্ধ করা উচিত এবং ছেঁড়া খেই দুইটি ধরিয়া লওয়া উচিত। খেই-এর পাকখোলা থাকিলে অর্থাৎ উহার আঁশ বাহির হইয়া থাকিলে উহাদের ২-৩ সুত পরস্পরের উপর বিছাইয়া দেওয়া দরকার এবং পাঁজওয়ালা হাতের চিমটিতে সেই খেই-এর জোড়া ধরিয়া তকলিটি একটু ঘুরাইয়া উহাদের পরস্পরের সহিত পাক দেওয়া উচিত। এইভাবে খেই দুইটির খোলা আঁশ স্বভাবতঃই মিশিয়া এক হইয়া যায়। ইহাকে জোড়া দেওয়া বলা হয়। কাটার সময় যতদূর সম্ভব জোড়া দিয়াই কাজ চালানো উচিত। কারণ এই প্রণালীতে ধাগা বে-মালুম জোড়া লাগিয়া যায় এবং সুতার স্থূলতায় কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না, ফলে কাপড়ও পরিষ্কার বুনা যায়।

জোড়া দেওয়া

ধাগা পাঁজের পাশে ছিঁড়িলে, পাঁজ-সংলগ্ন ধাগার ছোট খেইটি বাহির করিয়া পাঁজের উপর লম্বা করিয়া বিছাইয়া দেওয়া উচিত এবং তকলির ধাগার খেই পাঁজের উপর রাখিয়া কাটা শুরু করা উচিত। ইহাতে ধাগার টুকরা নিজে নিজেই কাটাইয়ের মধ্যে চলিয়া আসে এবং জোড়া দেওয়ার পরিশ্রম ও সময় বাঁচিয়া যায়। পাঁজের উপর বিছানো টুকরার মাথা যেন পাকানো না থাকে। পাকানো থাকিলে উহার পাক খুলিয়া লওয়া ভালো; ইহাতে উহা অন্যান্য আঁশের সহিত সহজে মিলিতে পারিবে।

জোড়া দেওয়ার যে প্রণালী উপরে বলা হইল, মোড়া লাগানোর কাজ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। জোড়াতে উভয় খেই ঠিক বে-মালুম মিলিয়া যায়, কিন্তু মোড়াতে উহা পরিষ্কার দেখা যায়। জোড়া একহারা থাকে, কিন্তু মোড়া তেহারা অর্থাৎ জোড়া অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ মোটা হয়।

মোড়া লাগানো ঃ—

মোড়া তখনই লাগানো দরকার যখন জোড়া দেওয়া সম্ভব হয় না। মোড়ার খেই-এর আঁশ ফুসফুসা ও খোলা থাকা উচিত নয়। খোলা থাকিলে উহা মোড়ার সময় বার বার ছিড়িয়া যায়। এজন্য উহাদের আধ-আধ ইঞ্চি পরিমাণ ছিঁড়িয়া ফেলা উচিত, যাহাতে নয়া খেই যথেষ্ট পাকানো ও মজবুত হইয়া বাহির হইতে পারে। অথবা খোলা খেই-ই অল্প পাক দিয়া মজবুত

করিয়া লওয়া উচিত। খেই ছিড়িয়া ফেলিলে ইহার ডগায় খোলা ও নয়া আঁশ আসে। উহা মোড়া চেপ্‌টা করিয়া মিলাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে খুব কায দেয়। মোটা সুতার মোড়া ভালো ভাবে লাগে না। মিহি সুতার মোড়া ভালো ভাবে সাঁটিয়া ও শক্ত হইয়া লাগে। পৃথক পৃথক স্থূলতার ধাগা মোড়া লাগানো উচিত নয়।

মোড়া কি ভাবে লাগানো উচিত?

জোড়ার সময় ধাগার খেই দুইটি হাতে হাত মিলানোর মতো পরস্পরের সামনা সামনি থাকে। কিন্তু নমস্কার করা ব্যাপারে যে রূপ হাত জোড় করা হয়, সেইরূপ মোড়া লাগানোর সময় ধাগার খেইগুলি একই দিকে সাঁটিয়া রাখা হয়। মোড়ার খেইগুলি আধা বা পৌনে এক ইঞ্চি আন্দাজ বাহিরে রাখিয়া বাম হাতের বুড়া আঙুল ও তর্জনীর চিমটির মধ্যে ধরিতে হয়। একটি খেইকে অপর খেই হইতে দুই এক সুত আগাইয়া রাখিতে হয় যেন মোড়ার বাঁধনের ডগাটি ধাগার উপর শক্ত করিয়া জড়াইয়া যাইতে পারে। বাঁধনের ডগাটি আঁটিয়া না বসিলে অর্থাৎ আলগা থাকিলে মোড়া তাতাতাড়ি উঠিয়া আসে। চিমটির বাহিরে আগাইয়া থাকা খেই মিলিয়া থাকা দরকার। কিন্তু পিছনের দুইটি সুতার খণ্ডই যেন আল্‌গা আল্‌গা থাকে। তকলির সহিত জড়িত ধাগা পায়ের বুড়া আঙুলের নীচে চাপিয়া বা অন্য রকমে টান রাখিয়া বাম হাতের মধ্যমা ও উহার নীচের দুইটি আঙুলে উহা ধরিয়া থাকা দরকার। মোড়া লাগানো কালে উভয় ধাগা টান থাকা উচিত। প্রথমে চিমটি হইতে বাহিরে আগাইয়া থাকা খেইগুলি ডান হাতের চিমটি দিয়া পাক দিতে হয়। পাকের সময় বুড়া আঙ্গুল তর্জনীর মধ্যম গিঁট হইতে বা উহারও পিছন হইতে শুরু করিয়া প্রথম গিঁঠ অবধি আসে এবং তর্জনীর পাশ দিয়া পিছলাইয়া সামনের দিকে আগাইয়া যায়; পরে আবার ফিরিয়া সেই আঙুলের প্রথম পায়ের মাঝ অবধি পিছনে সরিয়া আপন কাজ শেষ করে। (৫ম মোড়াদেখুন) বুড়া আঙ্গুল যতক্ষণে ঐ আঙ্গুলের প্রথম গিঁঠের উপর আসে, ততক্ষণে চিমটির বাহিরের খেইগুলি আঁটিয়া মিলিয়া যায়। ইহার পরে তকলির সহিত সংলগ্ন ধাগা ছাড়িয়া পাঁজের সঙ্গে লাগাও ধাগার উপর বাম চিমটিটা একটু পিছনে সরাইতে হয়। এই দোহারা পাকানো মুড়ি তকলি-যুক্ত টানা ধাগার উপর জড়ানোর জন্য নীচের দিকে মুড়িয়া

পুনরায় বুড়া আঙ্গুল ও তর্জনীকে আগেকার মতো সরাইতে হয় এবং মুড়িটি যেন ধাগার সহিত সম্পূর্ণরূপে জড়াইয়া যায়। পরে বুড়া আঙ্গুলটি ভিতরের দিকে টানিয়া মোড়া শেষ করিয়া দিতে হয়।

ধাগার উভয় খেই ঘুরিতে না দিলে ও মাঝখানে ধরিয়া উহাকে সোজা দিকে পাক দিলে চিমটির উপরিভাগে পাক চড়িতে থাকিবে এবং নীচের দিকে পাক খুলিতে থাকিবে। দোহারা পাকানো ধাগা তকলির ধাগার উপর আঁটিবার সময় এই রূপই ঘটিয়া থাকে। মোড়া লাগানো অংশ এবং উহার উপরিভাগ অতিরিক্ত পাকানো হয় এবং পাক খুলিয়া যাওয়ার দরুণ নীচের দিক দুর্বল হইয়া পড়ে। খুলিয়া যাওয়া পাক আবার লাগানোর জন্য বুড়া আঙুলটি ভিতর দিকে টানিয়া কিছু উল্টা পাক দিতে হয়। ইহাতে উপরের অতিরিক্ত পাক কমিয়া নীচের দিকে চলিয়া যায় এবং মোড়ার উপরে ও নীচে সমান পাক মিলিয়া থাকে।

মোড়া লাগানোর পরে উহাকে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি তকলিতে গুটাইয়া লইতে হয়, যেন মোড়া খুলিয়া যাইবার অথবা টানের গেঁটে ছিঁড়িয়া যাইবার ভয় না থাকে।

মোড়ার গুরুত্ব ঃ—

সুতা কাটা শেখার সময় আরম্ভেই মোড়া লাগানো শিখিয়া লওয়া উচিত। নয়া শিক্ষার্থী কাটা তো শিখে কিন্তু মোড়া লাগাইতে জানে না। এজন্য সে ছেঁড়া ধাগা যে ভাবে খুসি জোড়াইয়া তকলিতে গুটাইয়া লয় নাটাইবার সময় মুস্কিল হইলেও কোন রকমে সে উহা নাটাইয়া লয়। কিন্তু কাটুনীর এই বেপরোয়া কাজের ফল তাঁতীকে ভুগিতে হয়। এই বে-মোড়া সুতা বারে বারে ছিঁড়ে খুলিয়া আসে এবং এলোমেলো হইয়া যায়, ফলে তাঁতী উত্যক্ত হয়। কাজেই প্রথম দিনেই মোড়া লাগানোর শিখিয়া লওয়া উচিত এবং ছোঁড়া সুতা মোড়া লাগানো ব্যতীত ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নয়। টানা প'ড়েণের জন্য নাটাই হইতে তোলার সময় যে সুতা সব চেয়ে কম ছিঁড়ে অর্থাৎ যাহা সহজে তুলিয়া লওয়া যায়, সেই সুতাই উৎকৃষ্ট মনে করা হয়; তাঁতী উহাই পছন্দ করে।

ধাগা কি ভাবে ও কতটা লম্বা বাহির করিতে হয়?

তকলির বরাবর সোজা ধাগাটি টানিলে সমগ্র ধাগার উপর সমান

পাক বিনা-বাধায় ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু তেরছা টানিলে উহা তকলিওয়ালা হাতের চিমটির কাছ হইতে মুড়িয়া যায়, ফলে চিমটির নীচের ধাগার তুলনায় উপরের ধাগায় পাক সিধা পৌছায় না। তকলির বরাবর ধাগা কাটার সময় হাত খুব উঁচুতে তুলিতে হয়, ফলে মাধ্যাকর্ষণের ফলে উহা শীঘ্রই থামিয়া যায়। হাত উপরে উঠানোর তুলনায় পাশের দিকে লইয়া আসা সহজ। ইহা ছাড়া, তকলিতে ধাগা গুটানোর জন্য হাত তো একদিকে নিতেই হয়। এজন্য প্রথমেই তেরছা করিয়া নিয়া একটা প্রক্রিয়া কমে এবং হাতেরও ততটুকু আরাম মিলে। ধাগা তেরছা টানিলে আর একটি লাভও হয়। তাহা এই যে, ইহাতে তকলির ভার পাঁজের লাগাও দুর্বল ধাগার উপর পড়ে না। পাঁজ সংলগ্ন ধাগা এই হেতু দুর্বল থাকে যে, ধাগাটি যেখান হইতে মোড় ফিরে, তাহার উপরাংশে পাক সিধা পৌছে না। একদিক দিয়া তো ইহা ভালোই, কারণ, ধাগা বাহির করার সময় আরম্ভেই একদম যে অতিরিক্ত পাক মিলে, তাহা শেষ করিবার জন্য এবং টানার সুবিধার খাতিরে পাঁজের নিকটস্থ ধাগায় কিছু কম পাক হওয়া খারাপ নয়। কাজেই তেরছা ধাগা বাহির করা ব্যাপারে অনেক কিছু সুবিধা থাকার দরুণ তাহাই আমলে আনা উচিত। ধাগা তেরছা বাহির করার সময় উহা চোখ হইতে বেশী উঁচুতে নেওয়া উচিত নয়, কারণ, তাহাতে ঘাড় উপরে তুলিতে হয় না, ধাগা দৃষ্টির সামনে থাকে এবং মাটির পশ্চাদ্‌পট মিলায় উহা পরিষ্কার দেখা যায়।

ধাগা এতখানি লম্বা বাহির করা উচিত, যেন উহা গুটাইতে অসুবিধা না হয়। পাঁজওয়ালা হাত কাঁধের উপর লইয়া যাওয়া উচিত নয়। হাত ছড়ানোর সময় উহাকে কুনুই ও কবজীর যাহাতে ঘাড় বেশী বাঁকাইবার প্রয়োজন না হয়। এবং ধাগা ও সহজে গুটানো যায়। এই ভাবে কাটা ধাগা কাটুনীর উচ্চতার অর্ধেক অপেক্ষা কম এবং পৌনে এক ভাগের বেশী হয় না। উহার মধ্যে প্রায় এক ফুট "হাতের ধাগা" এবং বাকী তিন ফুট "নয়া ধাগা।"

একবারে ৪ ফুট ধাগা

কুণ্ডলীর আকার ও ওজন—

কি ভাবে তকলিতে সুতা গুটানো উচিত, তাহা পূর্বে লেখা হইয়াছে। এখন উহার কিরূপ আকার এবং ওজন কতটুকু হওয়া উচিত, তাহাই আলোচনা করিতে হইবে।

শঙ্কুর আকার—

ঘুরানোর সময় তকলি হাওয়ায় বাধা প্রাপ্ত হয়। এই বাধা যত কম হইবে, তকলি ততই দ্রুত বেগে ঘুরিবে। কাজেই তকলিতে এই ভাবে ধাগা গুটানো উচিত, যেন কুণ্ডলীর উপর বাতাসের বাধা সব চাইতে কম হয়। কোন বস্তুর যত কম বা বেশী স্তরের উপর হাওয়া লাগিবে, ততখানি কম বা বেশী উহার উপর হাওয়ার ঘর্ষণ লাগিবে। শঙ্কুর আকৃতি এইরূপ যে, উহার উপর হাওয়ার ঘর্ষণ খুব কম লাগে, কাজেই এই আকৃতিটি সর্বোত্তম মনে করা হয়। প্রায়ই গাজরের আকারে, পিঁয়াজের আকারে বা নলীর মত করিয়া তকলিতে সুতা গুটানো হয়। গাজরের মত তলা হইতে শুরু করিয়া উপরের ঝুঁটি পর্য্যন্ত গোল ও ক্রমসূক্ষ্ম আকারকে "শঙ্কু" বলে। নদীর বালিতে যে শঙ্কু অর্থাৎ ছোট শঙ্খ পাওয়া যায়, তাহা হইতেই হয়তো এই নাম হইয়া থাকিবে। অন্যান্য সকল আকারের তুলনায় এই শঙ্কুর আকার হাওয়াতে সব চাইতে কম আটকায়। এই জন্য এই আকারেই তকলিতে সুতা গুটানো শিখিয়া লওয়া উচিত। 'কলের চাকুতে কাটা পেন্সিলের মতো কুণ্ডলী কড়া ও পরিষ্কার হওয়া দরকার। পেন্সিলে যেমন সীসার চারিদিকে কাঠ থাকে, তকলির ডাঁটের চারিদিকেও সেইরূপ পরিষ্কার ভাবে সুতা গুটানো থাকা উচিত। এইভাবে সুতা গুটাইলে উহা এলো-মেলো না করিয়া, না আটকাইয়া এবং প্রায়ই না ছিঁড়িয়া নাটাইয়েতে জড়ানো যাইতে পারে।

চাক্তির উপর উহারই সমান মাপে কুণ্ডলীর তলা বানানো হয় আর ডাঁটটিকে বেড়িয়া ক্রমসূক্ষ্মাকারে উহা উপরে বাড়ানো হইয়া থাকে। ভিতের পাশে কুণ্ডলীর ব্যাস চাকতির সমানও রাখা যাইতে পারে অথবা উহা ঊর্ধ্ব দিকে খানিকটা বাড়ানোও যায়। কিন্তু কুণ্ডলীটি মধ্যস্থলে মোটা করিয়া শঙ্কুর আকার বিকৃত করা ঠিক নয়। কুণ্ডলীর ঝুঁটি একবারে সরু করাও উচিত নয়; উহা ১—১½ ইঞ্চি লম্বা রাখা দরকার অর্থাৎ শঙ্কুর শীর্ষ কোণটি ৩০°র করা উচিত।

কি ভাবে শঙ্কু বানাইতে হয়?

কুণ্ডলী ঠিক মত তৈরী করার জন্য প্রথমে চাকতি হইতে ১—১½ ইঞ্চি ফাঁক রাখিয়া ধাগা গুটানো উচিত এবং সেখান হইতে নীচের দিকে গুটাইতে গুটাইতে উহা চাকতির সঙ্গে ভিড়াইয়া দেওয়া দরকার। এইখানে খানিকটা

বেশী গুটাইয়া যেখান হইতে প্রথমে গুটানো শুরু করা হইয়াছিল সেখান অবধি দু'বার গুটানো ধাগার প্রথম স্তরের উপর দ্বিতীয় স্তর চাপাইয়া দেওয়া উচিত। এইভাবে চাকতির পাশে বেশী ও ডগার দিকে কম করিয়া গুটাইলে আপনা আপনি সুতার শঙ্কু তৈরী হইতে থাকে। কুণ্ডলীর আকার একবার শঙ্কুর মত তৈরী হইলে পর উহার ঝুঁটি ক্রমশঃ উপরের দিকে বাড়াইতে হয় এবং প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা কুণ্ডলী তৈরী করা উচিত। কুণ্ডলীর আকার ঠিক মত তৈরী হওয়ার পর কাটা ধাগা আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত লইয়া আসিতে এবং গোড়া হইতে আগা পর্যন্ত ফিরাইয়া দিতেই খরচ হইয়া যায়। এইরূপে সুতার শঙ্কু সহজে পরিষ্কার ও সমান ভাবে তৈরী হইয়া থাকে। কুণ্ডলীর ক্রমসূক্ষ্মভাগে যেন স্ফীতি ও স্তূপ না হইতে পারে এবং উহা যেন সমান ও সুন্দর হয়। শঙ্কুর বনিয়াদ চাকতির সমান চওড়া হওয়ার পর ঝুঁটির দিকে খানিক সুতা গুটাইয়া উহা ডাঁটের উপরের দিকে বাড়াইতে থাকা উচিত। শঙ্কুর বনিয়াদ যতই সামনের দিকে বাড়িতে থাকে, ততই ঝুঁটিও ১—১½ ইঞ্চি সামনে সরিতে থাকে।

তকলি কতখানি ভরতি করা উচিত ?

তকলির ওজন প্রায় দুইতোলা হওয়ার পরেই কাটাই বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ইহার চাইতে অধিক সুতা গুটাইলে উহার দ্রুতি কমিয়া যায় এবং আগের দিকে সুতা গুটানোর জন্য উহাতে জায়গাও থাকে না। ঘুরানোর জন্য তকলির ডাঁটের প্রায় তিন চারি আঙুল খোলা রাখিতে হয় ; সুতা গুটানোর সময়ও ডাঁট ধরার জন্য খালি জায়গা থাকা প্রয়োজন। খালি তকলির ওজন ১।০—১॥০ তোলা থাকে ; উহার উপর সাধারণত আটআনা আন্দাজ অর্থাৎ আধতোলা ওজনের সুতা গুটানো উচিত। আটআনা ওজনে ১০নং-এর ৮০, ১২নং-এর ৯৬, ১৬নং-এর ১২৮ এবং ২০নং-এর ১৬০ তার সুতা হয়। এই পরিমাণ তার তকলিতে নৈপুণ্যের সহিত ও শক্ত করিয়া জড়ানো যাইতে পারে। সুতা গুটানোর ইহা শেষ সীমানা মনে করা উচিত। ইহার পৌনে গুণ অর্থাৎ তিন চতুর্থাংশ পরিমাণে তকলি ভরতি করাই খুব ভালো। এতখানি সুতাও গুটানোর ভালো মতন অভ্যাস হইলেই ভরতি করা সম্ভবপর। ইহার অর্ধেক অর্থাৎ চার আনা ওজনের কম সুতা দিয়া তকলি ভরতি করা উচিত নয়।

তকলি কখন বদলানো উচিত ?

পূর্বোক্ত কথার অর্থ এই যে, তকলিতে এই পরিমাণ সুতা গুটানো উচিত যাহাতে উহার দ্রুতিতে বেশী পার্থক্য না ঘটিতে পারে। একটি তকলি ভরিয়া যাওয়ার পর আরেকটি লওয়া উচিত। কোন কোন লোক ৪০-৫০ তার গুটানোর পরেই তকলি বদলায়। আরম্ভে ইহা সঙ্গত বটে, কারণ, দ্রুতি দেখার সময় ইহার ব্যবহার হয়। কিন্তু উল্লিখিত আদর্শ পর্যন্ত পৌছানোর চেষ্টা করা উচিত। তকলি বদলানোর পর আবার শুরু হইতে নয়া ধাগা বাহির করার আবশ্যকতা নাই। প্রথম তকলি হইতে আন্দাজ দুই ফুট ধাগা নিয়া নয়া তকলিতে লাগানো উচিত এবং তাড়াতাড়ি কাটা স্থরু করা উচিত। ইহাতে সময়ও বাঁচে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তকলি অভ্যাসের ধারাবাহিক ও বিশদ বিবরণ

(দ্বিতীয় ভাগ)

২য়, ৩য়, ও ৪র্থ পদ্ধতি।

বাম হাত ও সিধা ঘুরানো ঃ—

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি শুরু করার আগে তকলি বাম হাতে সিধা দিকে ঘুরানোর ভালো রকম্ অভ্যাস করা উচিত। ডান হাতে কাটার সময় চিমটিতে যে ভাবে তকলি ধরিতে হয়, বাম হাতে কাটার সময় তাহা হইতে সম্পূর্ণ উল্‌টা ভাবে অর্থাৎ বুড়া আঙুলের প্রথম গিঁঠের উপর তর্জনীর ডগা দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয় এবং বুড়া আঙুলকে ভিতর দিকে ঠেলিয়া তর্জনী বাহিরের দিকে সরিয়া যায়। এই ভাবে ঘুরাইলে তকলি সিধা দিকে ঘুরিতে থাকে। (ঘুরানোর আগে ও পরে আঙুলগুলি কি ভাবে থাকে, তাহা ছবিতে দেখানো হইয়াছে।)

বাম হাতে সিধা ঘুর কেন ?—

তকলি ঘুরানোর সময় বুড়া আঙুল ও অন্যান্য আঙুলগুলি পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরের উলটাদিকে সরিয়া যায় কিন্তু বুড়া আঙুলই বিশেষ ভাবে

ঘুরানোর কাজ করে আর অপর আঙুলগুলি উহার সহায়কের কাজ দেয়। কিন্তু এই সমস্ত পদ্ধতিতে অর্থাৎ বাম হাতে ঘুরানোর পদ্ধতিতে বুড়া আঙুলকে ভিতর দিকে মোড় ফিরিতে হয়, ফলে সে নিজের সামর্থ্য ও নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে পারে না। এই জন্য "অ ঘ-"র পদ্ধতি সমূহ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য এই সমস্ত পদ্ধতির অভ্যাস খুব মেহনতের সহিত করিলেই দক্ষতা জন্মাইতে পারিবে। এই কারণে "ঘ" এর অভ্যাসের জন্য অধিক সময় দিবার কথা প্রথমেই বলা হইয়াছে। "ঘ"-এর অর্থাৎ বাম হাতের এই সব পদ্ধতিতে বাম হাত এখন ডান হাতের কাজ করে। ডান হাতের কাজ বাম হাতে সহজেই শিখিয়া লইতে পারে, কিন্তু মুশকিল ঘটে ডান হাতের নকল করিবার বেলায় শরীরকে সুডৌল করার জন্য যেমন উভয় পার্শ্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সমান কসরত করাইতে হয়, বাম হাতে উল্‌টা ঘুরাইয়া এখানেও সেইরূপই করা যাইতে পারে। কিন্তু উল্‌টা ঘুরানি কেন দেওয়া হয় না? ইহার কারণ এই যে, ডান বাম হাতের সিধা উলটা পাক দেওয়া সুতা পরস্পর মিশিয়া গেলে বুননের কাজে যে বিশৃঙ্খলা ঘটে, তাহা হইতে বাঁচানো দরকার। যে ভাবে আলো ও আঁধার মিলিতে পারে না, সেই ভাবে সিধা ও উলটা পাকের সুতার মিল হইতে পারে না। সিধা পাক-যুক্ত সুতার তলায় উল্‌টা পাক-যুক্ত সুতা ভুলক্রমে মিলিয়া গেলে সর্বনাশ হইয়া গেল, মনে করিতে হইবে। আগাগোড়া সেই সব টানা অনর্থক নষ্ট হইয়া গেল, এই ধরণের কোন ঘটনাই ঘটিয়াছে।

উভয় হাতে সিধা দিকে ঘুরানোর কারণ ঃ–

চরকার মত তকলিতেও একটানা আট ঘণ্টা সুতা কাটা যাইতে পারে, এই ধারণা হইতেই আলোচ্য পদ্ধতি সমূহের জন্ম। কাটার সময় হাত মাটির আকর্ষণের বিরুদ্ধে বারে বারে উপরে উঠাইতে হয়। রোজ রোজ একটানা আট ঘণ্টা একই হাত তুলিতে থাকা মুশকিল; ইহাতে হাত খুব ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কাজেই অপর হাতে কাটা শুরু করিতে হইয়াছে। ওয়ার্ধা আশ্রমে আদিতে বাম হাতে উলটা ঘুরানি দিয়াই কাটা শুরু হয়। এই জন্য পৃথক পৃথক সরঞ্জামাদি রাখিতে হইত। কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও কয়েকবার সব কিছু গোলাইয়া যায়। ইহাতেই খেয়াল হয় যে, উভয় হাতেই এক রকম পাক দেওয়া প্রয়োজন। তার পরেই বাম হাতেও সিধা দিকে ঘুরাইয়া কাটা শুরু হয়। উভয় হাতে একই দিকে পাক দেওয়ার ইহাই কাহিনী। এই রূপান্তরের

ফলে বুনাই সম্পর্কে তকলি কাটাতে একটা অভিনব ব্যাপার ঘটিয়া গেল। উলটা পাকের গতিতে যে গোলমাল ঘটিতেছিল, তাহা বন্ধ হইয়া ঠিক মত কাজ হইতে লাগিল। জাঁতা পেষাই মত সুতা কাটিতেও উভয় হাতের উপর সমান মেহনত পড়িতে থাকে। পিষাইতেও দুই হাত একই দিকে ঘুরাইতে হয়। কেবল পার্থক্য এই যে, জাঁতা ঘুরানো ব্যাপারে ডান হাত বাম হাতের অনুসারে চলে আর সুতা কাটাতে বাম হাত ডান হাতের নকল করে।

উভয় হাতের সমান নৈপুণ্য ঃ—

একটি হাতকে একই কাজ শিখাইলে উহা সেই কাজে পটুতা অর্জন করে। ইহাকে লোকে বিশেষত্ব লাভ করণ (Specialisation) বলে। কিন্তু সেই কাজে অপর হাতটিকেও কাজ শিখাইলে অপর হাত উহার আশ্রিত হইয়া থাকে, কিন্তু উভয় হাতকে সমান নিপুণ করিয়া দিলে উভয়ের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয়। বামহাতকে সুতা কাটা শিখানোর মধ্যে শিক্ষার এই দিকটাই মনে রাখা হইয়াছে। ইহাতে বামহাত ডানহাতের খাঁটি সহায়কে পরিণত হয়।

আঙুলের সহায়তা ঃ—

কোন কোন লোক তকলি ঘুরানোর সময় বুড়া আঙুলের সহিত খালি একটিই আঙুলের সাহায্য লয় না, পক্ষান্তরে তর্জনী দিয়া ঘুরানোর মধ্যে মধ্যমার ও মধ্যমা দিয়া ঘুরানো ব্যাপারে অনামিকার সহায়তা লইয়া থাকে।

আঙুলগুলির কাজ ঃ—

যে আঙুলের পাবের সহিত বুড়া আঙুল সহজে জুটিতে পারে, সেই আঙুলের সাহায্যে চিমটি তৈরি করিতে হয়। তর্জনী বুড়া আঙুলের খুব নিকটে, কাজেই বুড়া আঙুল উহার কাছে ভালো রকমে ভিড়ে না। অনামিকার সহিত বুড়া আঙুল সহজেই ভিড়িয়া যায়, কিন্তু উহা দূরে অবস্থিত। মধ্যমা দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও দৈর্ঘ্য বুড়া আঙুলের প্রায় তুল্য। এজন্য ইহার সহিত ভালো চিমটি তৈরী হয়। ইহার সাহায্যের জন্য পাশের যে কোন আঙুলের সহায়তা লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু আসল কাজ মধ্যমার-ই হওয়া দরকার। কেহ কেহ তর্জনী দিয়াই বেশী কাজ আদায় করে।

মধ্যমার কাজ ঃ—

প্রথম দুইটি পদ্ধতি বর্ণনার পরে এত টুকুই বলা বাকী আছে যে, প্রত্যেক চতুষ্কের দ্বিতীয় যুগলে তর্জনীর পরিবর্তে মধ্যমার ব্যবহার করা উচিত।

দ্বিতীয় চতুষ্ক—৫, ৬, ৭ ও ৮ নং পদ্ধতি।

তকলি ভূমিতে না ঠেকাইয়া কাটা—ইহাই এই চতুষ্কের বৈশিষ্ট্য। যখন উভয় জাতের উভয় আঙুল দিয়া তকলি ঘুরানোর ভালো মতন অভ্যাস হইয়া যায় এবং সুতা পরিষ্কার বাহির হইতে থাকে অর্থাৎ কাটাইয়ের সমস্ত কৌশল যখন আয়ত্ত হইয়া যায়, তখন পরবর্তী পদ্ধতিগুলি খুব সহজ হইয়া আসে।

সিধা ও তেড়া-বাঁকা ঘুর ঃ—

আলোচ্য পদ্ধতি সমূহে তকলি দফ্‌তির (কার্ডবোর্ডের) উপর না ঠেকাইয়া কাটিতে হয়। কাজেই হাওয়ায় আলগা ঘুরাইলে তকলি যাহাতে না লাফায়, অথচ সিধা হইয়া এবং না হেলিয়া দুলিয়া ঘুরিতে থাকে। সেই বিষয়ে বিশেষ মন দেওয়া দরকার। এইজন্য পাক দেওয়ার সময় চিমটির আঙুলগুলি পরস্পরের উপর সিধা ও বরাবর সরিতে থাকা উচিত। নইলে তকলি তেড়া-বাঁকা হইয়া ঘুরে এবং শীঘ্রই চাল ঢিমা হইয়া আসে। তেড়া-বাঁকা ঘুরিলে তকলিতে ঝাঁকুনি লাগে, ফলে মোটা মিহি সুতা বাহির হয় এবং উহা বারে বারে ছিঁড়িতেও থাকে। কাজেই তকলি এমন ভাবে ঘুরানোর প্রয়োজন, যাহাতে উহার চালে থরথরানি না আসে।

কাটাইয়ের কলা ভেদ ঃ—

কাটিতে কাটিতে বাড়িতে থাকা সুতার বুরুজে তকলি ভারী হইয়া যায়; ফলে ধাগার উপর একসমান টান থাকে না। উহা ও বাড়িতে বাড়িতে চলিতে থাকে। কাজেই সুতার নম্বর সমান রাখার জন্য খুব অভ্যাস ও সতর্কতার প্রয়োজন হয়। যেমন যেমন ওজন বাড়িতে থাকে, তেমন তেমনই তকলি ঘুরানোর জন্য বেশী সামর্থ্য লাগাইতে হয়। নম্বর ঠিক রাখার জন্য পাঁজের চিমটি খানিক শক্ত করিতে হয় এবং ধাগা টানার কাজও কিছু ধীরে ধীরে চালাইতে হয়। সব পদ্ধতিতেই, কিন্তু বিশেষতঃ না-ঠেকাইয়া আলগা কাটার পদ্ধতি সমূহে কাটাইয়ের কলার পার্থক্য এই যে, ঝুলিয়া থাকা তকলির ক্রমবাড়ন্ত

ওজন ও টানের দ্রুততা—এই উভয়ের সহিত পাঁজ হইতে বাহির হওয়া আঁশের এবং ধাগার দৃঢ়তার সর্বদা সামঞ্জস্য রাখা দরকার। পাক ও টানের সংগতি বজায় রাখার কৌশল তখনই লাভ হয়, যখন উভয় হাতের আঙুলগুলির স্পর্শমাত্রেই আঁশ ও সুতার টান উপলব্ধ হয় এবং তদনুযায়ী স্নায়ু সমূহের ও তাড়াতাড়ি বা দেরীতে কাজ করিবার স্বভাব জন্মিয়া যায়। ঘুরানো ও টানা এই দুই ব্যাপারেই আঙুলগুলির ও স্নায়ু সমূহের স্পর্শ দ্বারা অনুভূতির সামর্থ্য বাড়ানো খুব আবশ্যক।

তৃতীয় চতুষ্ক—৯, ১০, ১১, ও ১২ নং পদ্ধতি

ঠেকাইয়া গুটানো ঃ—

যে নূতন কথা এই পদ্ধতি সমূহে শিখিতে হয়, তাহা হইল ঠেকাইয়া গুটানো। গুটানোর জন্য ভূমির উপর ধাগার ৬০°—৬৫° কোণ তৈরি করা দরকার। এই ভাবে তকলি তেরছা রাখিলে তকলির তলার দিকে চাকতির উপর সুতা গুটানো সহজ হইয়া যায়। অন্যান্য পদ্ধতির মত এই সময় ধাগাটি তকলির ডাঁটের সহিত সমকোণে (৯০°) থাকে ; কিন্তু ভূমির সহিত উহার ২৫°—৩০° কোণ বানাইতে হয়। ভূমির সহিত তকলির কোণ যত ছোট হইবে, সেই হিসাবে পাঁজ ওয়ালা হাত ততই কম নীচে নিয়া আসিতে হইবে।

অল্পে অল্পে ধাগা গুটানো ঃ—

আরম্ভে সম্পূর্ণ তারটি এক ঝটকায়ই গুটানো যাইবে না, কাজেই প্রথমে তিন ঝটকায় গুটানোর অভ্যাস করা উচিত। চিমটি দিয়া তকলিটি সামান্য একটু ঘুরাইয়া কাটা ধাগার এক চতুরংশ প্রথমে গুটাইয়া লইতে হইবে, পরে আবার অল্প দ্রুতি দিয়া অপর চতুরংশ গুটাইয়া লওয়া উচিত, পরে আবার একবার শেষ ঘুরানি দিয়া তৃতীয় চতুরংশ গুটাইতে গুটাইতে তকলির নাকে আটকাইয়া দেওয়া দরকার। বাকী চতুরংশ নয়া ধাগা বাহির করার জন্য তকলির উপরেই বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। গুটানোর সময় ধাগা এই ভাবে টান করিয়া রাখিতে হয়, যেন তকলির আকর্ষণ অনুযায়ী উহা বিনাবাধায় নিকটে চলিয়া আসে। বেশী টান করিয়া রাখিলে তকলি টান হইয়া পড়িয়া যাইবে, থামিয়া যাইবে অথবা ঢিমা চালে চলিতে থাকিবে। ফলে, ঠিক মতো গুটানো

যাইবে না অথবা গুটাইতে দেরী লাগিবে। বেশী ঢিলা রাখিলে সুতা ফাঁপা হইয়া গুটাইবে, ফলে বার বার মোড়া পড়িবে এবং কাটাই গুটানো ও নাটানোতে বাধার সৃষ্টি হইবে। উহার ফল এই হইবে যে, সুতা কম কাটা হইবে।

তকলি কত দ্রুত সুতা গুটাইতেছে, কাটনীর পাঁজওয়ালা হাতের স্নায়ুতে অনুভূত টানেই তাহার আন্দাজ বুঝা যায়। তদনুযায়ী উহাকে আপন হাত তকলির দিকে নিয়া আসিতে হয়। এইরূপ করিলেই সুতা ভালো মতন গুটানো যায়।

গুটানোর সময় ধাগা ডাঁটের সমকোণে থাকে, কিন্তু নয়া ধাগা বাহির করার জন্য ধাগা নাকের দিকে নিয়া আসার সময় এই কোণটি ১২০° হইতে ১৩০° অবধি বাড়ানো দরকার। ইহাতে ধাগাটি এক বা দেড় সুত অন্তর অন্তর ডাঁটের উপর সাপের মত জড়াইয়া আপনা আপনি নাকে আটকাইয়া যায়। জড়ানোর আগে প্রায় ৪-৫ ইঞ্চি ধাগা খুলিয়া লইতে হয়। কাটার সময় পাঁজওয়ালা হাত পুরাপুরি টান না করিয়া খানিক বাঁকাইয়া রাখিতে হয় যাহাতে ধাগা খুলিয়া লওয়ার সময় উহা আরও ছড়ানো যাইতে পারে। খুলিয়া লওয়ার জন্য তকলিটি সামান্য একটু উলটা ঘুরাইয়া ডাঁটটি চিমটিতে কিছু ঢিলা করিয়া ধরিতে হয়। গুটানো সুতা যেমন যেমন খুলিয়া আসে, ঠিক তেমনই পাঁজওয়ালা হাত ছড়াইতে হয় এবং ধাগাটি কুণ্ডলীর মাথার উপর আসিলেই গুটাইতে হয়।

তিন ঝটকায় গুটানো অভ্যস্ত হইয়া গেলে দুই ঝটকায় গুটানো শুরু করিতে হয়, পরে এক ঝটকায় গুটানো অভ্যাস করা চলে। সুতা মজবুত হইলেই ঝটকা দিয়া গুটানো ভালো হয়। ঝটকায় কাঁচাসুতার ছিঁড়িবার ভয় থাকে। সঙ্কোচের সহিত গুটাইলে পরিষ্কার ঠিক ভঙীতে এবং এক ঝটকায় গুটানো যাইতে পারে না।

ঠেকাইয়া গুটানোর গুণ—

তকলিতে কাটার আজকাল এত যে উন্নতি হইয়াছে, ঠেকাইয়া গুটানোর পদ্ধতির জন্যই উহার অনেক কিছু সাফল্য, একথা বুঝা উচিত। কাজেই, যে কেহ আপন কাটাইয়ের দ্রুতি বাড়াইতে চায়, তাহাকে এই পদ্ধতি সমূহ ভালো রকম জানিয়া লইতে হইবে। দ্রুতবেগে গুটানো খুব নৈপুণ্যের কাজ। মন

লাগাইয়া অভ্যাস না করিলে উহা আয়ত্ত হয় না। যাহারা তাড়াতাড়ি ধাগা টানিতে পারে, অথচ গুটানোয় যাহাদের হাত সাধা নাই, তাহারা কাটাইয়েতে পিছনে পড়ে।

কুণ্ডলী নীচে ঠাসা—

এই সমস্ত গুটানোর পদ্ধতিতে না-ঠেকাইয়া গুটানোর মত ঠাস ও কড়া করিয়া গুটানো যায় না। ঝটকা দিয়া গুটানোর সময় সুতা বেশী টান করিয়া রাখা যায় না, কাজেই সুতা শঙ্কুর আকারের পরিবর্তে নলীর আকারের দিকে ঝোঁকে। ইহাতে সুতার কুণ্ডলী শীঘ্র উপরে বাড়িয়া যায় এবং তকলিতে সুতা কম গুটানো যায়। কাজেই তকলিটি নীচে ঠেকাইয়া বুড়া আঙ্গুল ও তর্জনীর চিমটি দিয়া মাঝে মাঝে কুণ্ডলী নীচে ঠাসিয়া রাখিতে হয় এবং উহার মাথার উপর দুই চার চক্কর জড়াইয়া বাঁধ লাগাইয়া দিতে হয় যাহাতে ঠাসা সুতা উপরে সরিয়া না আসে। ঠাসার ফলে কুণ্ডলীর ফাঁপাই করিয়া উহা ঠাস ও কড়া হইতে থাকিবে এবং সুতাও বেশী গুটাইতে পারা যাইবে। নীচে ঠেকাইয়া-গুটানোর পদ্ধতিসমূহে এই ধরণের কিছু ত্রুটি আছে বটে, কিন্তু দ্রুত বেগে গুটানোর গুণের সামনে কেহ তাহাদের গণণার মধ্যেই ধরে না।

চতুর্থ চতুষ্ক—১৩, ১৪, ১৫, ও ১৬ নং পদ্ধতি।

অভ্যাস সমূহের ধারা :—

এই চতুষ্কে নয়া বা অদ্ভুত কথা কিছু নাই। না-ঠেকাইয়া কাটা ও ঠেকাইয়া গুটানোর অভ্যাস পৃথক পৃথক ভাবে সাধিত হইয়াছে, এখানে উহাকে একসাথ করা। প্রথম ও দ্বিতীয় চতুষ্কের "অ"র জায়গায় "ছ" এর প্রয়োগ করিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ চতুষ্ক তৈরী হইয়াছে। প্রথম দুইটি চতুষ্কে "অ"এর অভ্যাস; উহা হাঁসিল করিবার পর "ছ"-এর অভ্যাস ব্যবস্থিত হইয়াছে। এই দুইটি সোপানে গুটানোর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। পরের দুইটি চতুষ্কের বিশেষ নৈপুণ্যের পদ্ধতিগুলির মধ্যে ইহাদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। ইহাদের অনুশীলন প্রথম হইতেই সাধিত হইয়া যাওয়ার পর, শিখিবার বাকী নয়া বিষয়ের দিকে পুরাপুরি মন দেওয়া যাইতে পারে। পদ্ধতি সমূহের ধারা এইভাবে তৈয়ার করা হইয়াছে যেন পিছনের পদ্ধতিগুলি সামনের পদ্ধতি সমূহে ঢুকিবার

দরজায় পরিণত হয়। এইভাবে শিখিবার বিষয় সমূহকে পৃথক পৃথক ভাগ করিয়া দেওয়ায় উহাদের অভ্যাস করা সহজ হইয়া যায়।

পঞ্চম চতুষ্ক—১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ নং পদ্ধতি।

খাড়া হইয়া কাটা,—ইহাই এই চতুষ্কের বিশেষত্ব। এই বৈশিষ্ট্যের দরুণ ইহাতে "ঝ" এর অভ্যাস আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ "চ" "ছ" এর পার্থক্যের ফলে স্পষ্ট সহজ ও মিশ্রিত সব পদ্ধতি ইহাতে বাদ পড়িয়া যায়।

খাড়া হইয়াও "আ" "চ", ও "ছ" এর অভ্যাস সাধন চলে। ইহার জন্য ২॥—২৮ ফুট উঁচা টেবিল কাজে লাগাইতে হইবে। জাং এর উপর তকলি ঘুরানোর সময় (ষষ্ঠ চতুষ্ক দেখুন) পা মাটি হইতে প্রায় এক ফুট উঁচুতে তুলিতে হয়। ইহাতে পা টলিতে থাকিলে উহা রাখার জন্য এক ফুট উঁচু একটা তে-পায়া কাজে লাগাইতে হয়। তে-পায়ার উপর পা রাখিয়া ঘুরানোর এবং তকলি ঠেকাইয়া ধাগা গুটানোর জন্য জাং কাজে লাগাইতে পারা যায়। কিন্তু জাং-এর উপর দফতি বাঁধিয়া লওয়া উচিত যাহাতে গুটানোর সময় তকলি না ফুটিয়া বসে।

বসিয়া বসিয়া কাটিলে মন যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সেই সময় পা কে আরাম দিবার জন্য এই পদ্ধতিগুলি কাজে লাগানো উচিত। একনাগাড়ে কাটাইয়েতে মন উত্যক্ত হইবার আগেই এক-এক বা দুই-দুই ঘণ্টা অন্তর আধ-আধ ঘণ্টা এই সমস্ত পদ্ধতির অনুশীলন করা উচিত হইবে।

এতগুলি পদ্ধতি অভ্যাসের পর আর ধাগা ছিঁড়িবার অবস্থা আসিবে না। তবু যাহাতে ধাগা ছিঁড়িয়া তকলি ফরাসের উপর পড়িয়া খারাপ না হইতে পারে। তজ্জন্য সর্বদা উহার নীচে মাটির উপর দফ্‌তি রাখা দরকার।

এই সমস্ত পদ্ধতিতে বেশ লম্বা ধাগা বাহির করার চেষ্টা যেন না করা হয়। কারণ অনেক লম্বা ধাগা গুটানোর বাধা পড়ে এবং সময়ও বেশী লাগে। দুই হাতই সম্পূর্ণ ছড়াইয়া দেওয়ার গাঁটের উপর জড়ানো '৪।৫ ইঞ্চি ধাগা খুলিয়া লওয়ার জন্য হাত আর বেশী ছড়ানো যায় না। কাজেই দুই বাহুর সম্পূর্ণ বিস্তৃতি অপেক্ষা একফুট কম লম্বা ধাগা কাটা ভালো। এই অবস্থায় ধাগা টান করিয়া রাখিয়া সহজে গুটানো যাইতে পারে। ভুলক্রমে ধাগাটি লম্বা বাহির হইয়া থাকিলে, আঙ্‌লের উপর, কুনুইয়ের উপর বা হাটুর উপর জড়াইয়া উহা আয়ত্তে আনা দরকার, পরে উহা তকলিতে গুটাইয়া লওয়া উচিত।

এক জায়গায় দাঁড়াইয়া অথবা ধীরে ধীরে চলিতে চলিতেও সুতা কাটা যাইতে পারে এবং এই দুইটি বিষয়েরই অল্প বিস্তর অভ্যাস অবশ্য করিতে হয়। খাওয়া দাওয়ার পর আঙিনায় বেড়াইতে বেড়াইতে সুতা কাটা খুব আমোদ-জনক হইয়া থাকে।

ককেসাসে এবং অন্যান্য দেশের কোথাও কোথাও জেলেদের মত জাং-এর উপর তকলি ঘুরাইয়া সুতা কাটা হয়। উহাদের তকলি আমাদের তকলি অপেক্ষা খানিকটা ভিন্ন ধরণের। উহার ডাঁটটি ১২ হইতে ১৫ ইঞ্চি লম্বা এবং দুইদিকে ক্রম সূক্ষ্মাকার। উপরের মাথার সুতা আটকানোর জন্য খাঁজ আছে। চাকতিটি ডাঁটের ঠিক মাঝখানে লাগানো হয়। জাংয়ের উপর তকলি ঘুরানোর জন্য চাকতির তলার ডাঁট কাজে লাগে না, উহার উপর কেবল সুতা গুটানো হয়। কাপাস ব্যতীত অন্যান্য আঁশ কাটাইয়ের জন্যই এই তকলির ব্যবহার বেশীর ভাগ করা হইয়া থাকে। কাপাসের মত উল, শন ও তিসির পাঁজ করা যায় না। কাজেই সেগুলি পাঁজের মত হাতে ধরিয়া কাটা মুশকিল। সেইজন্য এই সমস্ত আঁশ ৪।৫ ফুট লম্বা কাঠের উপর—যাহাকে ইংরেজীতে ডিস্‌টাফ (Distaff) বলা হয়—জড়াইয়া দেওয়া হয় এবং উহা বাম বগলে চাপিয়া ধরিয়া কাঁধের সহিত দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধা হয় অথবা উহার নীচের মাথা কোমরের পটিতে গুঁজিয়া লওয়া হয়। কখনো কখনো কাঠ বাদ দিয়া উলখানি বাম হাতে জড়াইয়া রাখা হয়। এই ফাঁপ-কাঠি (পাঁজ না বানাইয়া কাটার জন্য আঁশের ফাঁপ অর্থাৎ গোলা কাঠিটির উপর জড়ানো হয়, এই জন্য ইহাকে ফাঁপ-কাঠি বলা হয়) তকলির মতই খুব সাবেক আমলের। কিন্তু ভারতবর্ষে এখন ইহা সবাই ভুলিয়া গিয়াছে। আমাদের এখানে কেবল কাপাস বা উলের-ই কাটাই হয়, ইহাই হয়তো ইহার কারণ হইবে।

উল্লিখিত পদ্ধতি সমূহ ব্যতীত আরও একটি পদ্ধতি আছে। তাহাও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বা চলিতে চলিতে কাটার কাজে লাগানো হয়। এই পদ্ধতিতে বুড়া আঙুল ও অপর আঙুলের চিমটি দিয়া তকলি একটানা অল্পে অল্পে ঘুরানো হয় এবং ধাগা অল্প অল্প টানিয়া কাটা হইয়া থাকে। ইহাতে তকলি-ওয়ালা হাত তকলিতে ও পাঁজ-ওয়ালা হাত পাঁজের উপরই থাকে; আলগা করা হয় না। অর্থাৎ ইহাতে বিশেষ ব্যাপার কিছু নাই। কারণ, ইহাতে সুতা ও ভালো বাহির হয় না, কাটা ও তাড়াতাড়ি চলে না। ইহার একটি মাত্র বিশেষত্ব থাকিতে পারে; তাহাও এই যে, ইহাতে নাক-হীন

তকলি দিয়াও দাঁড়াইয়া বা চলিতে চলিতে সুতা কাটা যাইতে পারে। নাক-হীন তকলি দিয়া তকলির সিধা ধাগা টানা যাইতে পারে না, কিছু তেরছা টানিতে হয়।

যে যুগে ভালো ও সংস্কৃত তকলির কথা লোকে জানিত না, সেই সময়ে উল্লিখিত পদ্ধতি সমূহই যদি উত্তম বলিয়া গণ্য করা হইরা থাকে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু আজকাল ঐ সমস্ত পদ্ধতি বেশী আমল পায় না। তকলিতে সুতা কাটার অনেক রকম পদ্ধতিই কম বেশী পার্থক্য নিয়া দুনিয়ার অনেক কয়টি দেশেই প্রাচীন যুগ হইতে প্রচলিত ছিল এবং আজ কালও আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত যে সমস্ত পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেই এই সবের সার গৃহীত হইয়াছে, এরূপ বলিলে কোন ভুল হইবে না।

ষষ্ঠ চতুষ্ক—২১, ২২, ২৩ ও ২৪নং পদ্ধতি।

এই সমস্ত পদ্ধতি বহু বৎসরের অভিজ্ঞতার পরে অনুসন্ধানের ফলে বাহির হইয়াছে। ইহাদের জন্য তকলি কাটাইয়ের ঢঙ সম্পুর্ণ বদল হইয়া গিয়াছে এবং কাটার দ্রুতি ও কয়েকগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এই সমস্ত পদ্ধতির অসাধারণত্ব এইখানে যে ইহাতে হাতের তালু দিয়া দ্রুতি দেওয়া হয়। প্রথম যুগলে অর্থাৎ ২১ ও ২২নং পদ্ধতিতে জাং-এর উপর এবং দ্বিতীয় যুগলে পায়ের পিণ্ডির উপর হাতের তালু দিয়া তকলি ঘুরানো হয়।

রোম কাটা :—

যাহাদের পিণ্ডি বা জঙ্ঘার উপর ঘন ও কড়া রোম থাকে, তাহাদের উচিত প্রথমেই সেগুলি মেশিনে (Hair clipper) কাটিয়া লওয়া ; নইলে, সুতা কাটার সময় ধাগা বা তকলি উহার সহিত জড়াইলে রোমে টান পড়ে এবং খুব কষ্ট দেয়। ক্ষুর দিয়া রোম সাফ করা সংগত নয়, কারণ উহাতে চামড়া কোমল ও মসৃণ হইয়া যাইবে এবং তকলির ঘষায় সেখানটা জ্বালা করার আশঙ্কা থাকিবে। একবার রোম কাটিয়া দেওয়ার পর যদি প্রত্যেকদিন সুতা কাটা চালু থাকে, তবে আর সেই স্থানে লোম উঠিতে পারে না এবং সেখানকার চামড়া শক্ত হইয়া যায়। ২২ ও ২৩নং পদ্ধতিতে জাং বা পিণ্ডির লোমের গতির দিকে তকলি ঘুরানো হয় ; এই জন্য অনেকের ডান পিণ্ডির ও বাম জাং-এর লোম কাটার প্রয়োজন থাকে না।

পায়ের তালু ও চামড়ার পট্টি :—

লোম কাটাইয়েতে বা হাটু হইতে কাপড় সরাইতে যাহারা মিথ্যা শরম বোধ করে, তকলি ঘুরানোর জন্য তাহারা জাং-এর বদলে পায়ের তালু কাজে লাগাইতে পারে অথবা ৮"×৬½" ইঞ্চি মাপের চামড়ার একটি থলি বানাইয়া জাং-এর উপর তিন বকলস-যুক্ত পট্টি দিয়া কষিয়া বাঁধিয়া লইতে পারে। থলিটির মধ্যে একটি মোলায়েম দফতি ভরিয়া দেওয়া হয়, কারণ খালি চামড়ায় ভাঁজ পড়িবার সুযোগ থাকে। থলিটির ফাঁপাই এতখানি রাখা হয় যাহাতে উহার মধ্যে দফতিটি ঠিক বসিতে পারে। এই চামড়ার পট্টি কাপড়ের উপরও কসা যায়। কিন্তু এই চামড়ার পট্টিতে ভালো দ্রুতি লাভ হয় না।

এই পট্টির দাম কিন্তু বেশী, আর মেয়েরা সাড়ীর উপরে ইহা বাঁধিতে পারে না। সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় একটি চামড়ার পট্টি তৈরি করিয়াছেন। উহা বেশী হইলে দু' আনায়-ই তৈরী হইতে পারে এবং খুব সহজে পিণ্ডির উপর বা জাং-এর ধুতির উপর লাগানো যায়। এই চামড়ার পট্টি প্রায় ১০ ইঞ্চি লম্বা ও প্রায় ৩½ ইঞ্চি চওড়া থাকে এবং ইহার ছোট দুই ধারেই ভাঁজ থাকে যাহাতে ইজারের ফিতার মত দড়ি ঢুকাইয়া দেওয়া যায়। পিণ্ডির উপর কাটার জন্য এক দিকের দড়ির ফাঁদ হাঁটুতে আটকাইয়া লইতে হয়, আর অন্য দিকের ফাঁদ পায়ের গোড়ালিতে আটকানো হয়। জাং-এর উপর কাটার জন্য একটি ফাঁদ হাঁটুতে ঢুকাইয়া অন্যদিকের দড়ি কোমরে বাঁধিয়া লইতে হয়।

ঘুরানোর সময় হাতের তালুর চেহারা :—

তকলিটি হাতের তালুর মাঝখানে ও বুড়া আঙুলের মধ্যে ধরিয়া পিণ্ডি বা জাং-এর উপর ঘষা দিয়া ঘুরাইতে হয়। এই সময় হাতের তালু ভূমির সমকোণে এবং পায়ের সমান্তরালে থাকে। তালুর সামনেকার পায়ের খানিক অংশের উপর তকলি ঘুরাইতে হয় ; কাজেই ততটুকু অংশেরই রোম কাটিতে হয়।

কি ভাবে বসিতে হয় ?—

আসন গাড়িয়া বসিয়া কাটার সময় ২১নং পদ্ধতিতে বাম পা নীচে ও ডান পা উপরে রাখিতে হয়। ২২নং পদ্ধতিতে ইহার উল্টা অর্থাৎ ডান পা নীচে ও বাম পা উপরে রাখা উচিত। ইহাতে ঘুরানোর সময় তকলি মাটি নাগাল

পাইবে না এবং জাং একবার উপরে উঠাইয়া আবার নীচে রাখিবার প্রক্রিয়াও করিতে হইবে না।

হাতের তালু দিয়া ঘুরানো ঃ—

উল্লিখিত ভাবে তকলিটি হাতের তালু দিয়া ধরিয়া ডান হাতে কাটার সময় অর্থাৎ ২১ ও ২৩নং পদ্ধতিতে প্রথমে পিণ্ডি বা জাং-এ সাঁটিয়া ধরিতে হয়। পরে সেই হাত দ্রুতবেগে কোমরের দিকে টানিয়া আনিতে হয়। এবং তকলিটি আঙুলের শেষ প্রান্তে আসার পর সেখান হইতে হাত সরাইয়া ধাগাটি ধরিয়া লইতে হয় এবং সাথে সাথেই তকলিটি দফতির উপর ঠেকাইয়া দেওয়া উচিত। পরে প্রথমবারের মত কাটা শুরু করিতে হয়। কেবল আঙুল দিয়া যেন ঘুরানো না হয়। হাতের তালু দিয়াও কাজ আদায় করিতে হইবে। একথাও মনে রাখিতে হয় যে, তকলির নাক যেন চামড়ায় না ঢুকিয়া যায়। বাম হাতে কাটার সময় অর্থাৎ ২২নং ও ২৪নং পদ্ধতিতে তকলিটি উল্লিখিত প্রনালীতে ধরিয়া এবং জাং বা পিণ্ডির কাছে ভিড়াইয়া দ্রুতবেগে হাতটি হাটুর দিকে সরাইতে হয়। এই সময় কড়ে আঙুল হইতে কব্জি অবধি বাম হাতের তালু দিয়া ঘুরানোর কাজ করিতে হয়। এই চতুষ্কে ঘুরানোর পরে তকলিটি শরীর হইতে কিছু দূরে ঠেকানো উচিত যাহাতে গুটানোর সময় উহা তুলিয়া দূরে সরাইতে না হয়। তকলি ব্যবধানে রাখিলে ধাগার শরীর ছুঁইবার বা লোমের সহিত এলানোর ভয় থাকে না এবং গুটানোও সহজ হয়।

এই সমস্ত পদ্ধতিতে যে হাতে ঘুরানো হয়, সেই হাতে সুতা টানা উচিত নয় ; উহার কাজ চরকার মুহুরি (nut)-র মতন কেবল তকলি ঠিক মত ধরিয়া রাখা। সুতা বাহির করা অর্থাৎ ধাগা টানার কাজ পাঁজওয়ালা হাতের উপরই নির্ভর থাকে। এই সব পদ্ধতিতে তকলি খুব দ্রুততার সহিত ঘোরে বলিয়া ধাগা টানার প্রক্রিয়াও দ্রুত হওয়া দরকার। তকলিওয়ালা হাত উপরে উঠিতে উঠিতে ধাগা টানিতে পারে।

একবার ঘুরাইলে তকলির এই পরিমাণ ঘুরা উচিত যাহাতে ৫০ ইঞ্চি ধাগা সহজে বাহির হইতে পারে। কিন্তু এরূপ ঘুরানি যেন না দেওয়া হয় যাহাতে তকলিটি ঘড়ির দোলনের মতন ঝুলিতে থাকে। ঘুরানোর পরে তকলিটির দীপশিখার মতো সিধা এবং না হেলিয়া দুলিয়া অথচ পুরা দ্রুততার সহিত ঘুরিতে থাকা উচিত।

এই পদ্ধতি সমূহে তকলির দ্রুতি চরকার তুল্য পুরামাত্রায়ই হইয়া থাকে। কাজেই কাটা সুতা গুটাইয়া লওয়ার পর হাতের ধাগা এক ফুট অপেক্ষা কম এবং দেড় ফুটের চাইতে বেশী হওয়া উচিত নয়। বেশী রাখিলে ধাগা ছোট বাহির হয় আর কম রাখিলে উহা পাক নিঃশেষিত করিতে পারিবে না।

ধাগা তকলির বরাবরে কতটা টানা উচিত, কোথা হইতে মোড় দেওয়া উচিত এবং কতখানি লম্বা ও উঁচা করিয়া বাহির করিতে হয়—এই সমস্ত বিষয়ের চর্চা পূর্বেই করা হইয়াছে।

তার ছেঁড়ার পরে ঘূর্ণমান তকলি কি ভাবে থামানো যায়?

কিন্তু একটি বিষয়ে ধোঁকা খাওয়ার সম্ভাবনা আছে; কাজেই তাহার উল্লেখ আবশ্যক মনে হইতেছে। পাক খুব বেশী হইলে বা কম হইলে অথবা পাঁজ হইতে ফস্‌কাইলে ছেঁড়া ধাগা ঘুরন্ত তকলির গায়ে অত্যন্ত খারাপ ভাবে জড়াইয়া যায় এবং তাহা ছাড়াইতে যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়। এই অসুবিধার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য কাটুনী হড়বড় করিয়া তকলি ধরিতে গিয়া নাকের নীচে ধরার পরিবর্তে নাকের উপর হাত রাখে, ফলে চোখা নাক উহার হাতে ফুটিয়া যায়। কোন কোন লোকের বেলায় এরূপ ঘটিয়াছেও। তকলির নাক ছুঁচ-এর মতন নয় যে সহজে বাহির হইয়া আসিবে। উহা তীরের ফলার মত; ভিতরে ঢুকিয়া গেলে মাংস ফাড়িয়া বাহির হয়। কাজেই এবিষয়ে খুব সতর্ক থাকা উচিত। নয়া শিক্ষার্থীকে আরম্ভেই এই হাতিয়ারের সম্ভাবিত বিপদ সম্পর্কে সচেতন করিয়া দেওয়া দরকার। ঘুরন্ত তকলি বন্ধ করিতে হইলে ডাঁটাটি বুড়া আঙুল ও তর্জনীর মধ্যের ফাঁকে ধরিয়া বা তালু দিয়া পায়ের উপর ঝট্ করিয়া চাপিয়া থামানো সংগত।

পাঁজ বদলানো :—

কাটার দ্রুতি বাড়াইতে হইলে প্রত্যেক কাজে কি ভাবে সময় বাঁচান যাইতে পারে, তাহার উপায় চিন্তা করা দরকার এবং উহা আয়ত্ত করা উচিত। ইহা ছাড়া দ্রুতি বাড়া অসম্ভব। কাটার সময় পাঁজ শেষ হইয়া গেলে তকলি নীচে রাখিয়া সেই হাতে পাঁজ তুলিলে সময়ের অপচয় ঘটে। কাজেই পাঁজ এমন জায়গায় রখিতে হয়, যেন পাঁজওয়ালা হাত সহজে উহা তুলিতে পারে এবং কাটিতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। অর্থাৎ পাঁজগুলি পাঁজওয়ালা হাতের

কাছেই রাখিতে হইবে। অনুরূপ ভাবে পাঁজগুলি আল্‌গা আল্‌গা রাখাও নেহাৎ জরুরী, যাহাতে একটি পাঁজ উঠানোর সময় আরেকটি উহার গায়ে লাগিয়া উঠিয়া না আসে। পাঁজ শেষ হইবা মাত্র অন্তিম ধাগাটি গুটানোর সময় পাঁজ ওয়ালা হাতেই একটি পাঁজ তুলিয়া লইতে হয়।

তকলি বদলানো ঃ

তকলি বদলানোতেও সময় বাঁচানো দরকার। নয়া তকলির জন্য নয়া ধাগা ও নয়া পাঁজ লইবার প্রয়োজন নাই। প্রথম তকলি হইতেই পাঁজের মধ্যে লাগাও দুই ফুট ধাগা লইয়া কাটাই শুরু করিতে হয়।

পায়ের উপর কাটার জন্য বেশী জায়গার দরকার, কাজেই জায়গাটি খোলা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত যাহাতে হাতটি নিঃসঙ্কোচে ছড়ানো যাইতে পারে। কাটুনীদের দুই দুই হাতের ব্যবধান রাখিয়া বসিতে হয়। সব কাটুনীকে যদি একই পদ্ধতিতে সুতা কাটিতে হয়, তবে এই ব্যবধানই যথেষ্ট ; কিন্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির কাটুনীরা একই সাথে কাটিতে চায়, তবে তাহাদের ইহার চাইতে বেশী ফাঁক রাখিতে হইবে।

কাপড় যেন ঢিলা না থাকে ঃ—

বিছানোর আসন যেমন ফেঁকড়া যুক্ত না থাকা দরকার, সেইরূপ গায়ের কাপড় ও বেশী ঢিলা না থাকাই উচিত। ঢিলা ঢোলা কবজি অবধি আবৃত আস্তিনে এবং গোড়ালি পর্যন্ত লম্বিত ঢিলা ধুতিতে কাটাইয়ের কাজে খুব অসুবিধার সৃষ্টি করে। কাটার সময় ঢিলা কাপড়ের সহিত সুতার প্রায়ই মিলন ঘটে, এবং পাকের জন্য ধাগা উহাতে জড়াইয়া ছিঁড়িয়া যায়। কাজেই এবিষয়ে সতর্কতার প্রয়োজন। ধুতি ভালো রককে সাঁটিয়া লওয়া উচিত এবং আস্তিনও উপরে গুটাইয়া লইতে হয়। ইহার অর্থ এই যে, শরীরের কাপড় আঁট সাঁট রাখা ও সব চাইতে কম রাখা সঙ্গত।

জায়গা যেন সাফ থাকে ঃ—

কাটাইতে বা যে কোন ও কাজে মন লাগানোর পক্ষে কাজ করার জায়গাটি সম্পুর্ণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন। কোথাও ছেঁড়া সুতার ফেঁকড়া যদি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, আবর্জনা জমিয়া থাকে, মাছি ভন্‌ভন্

করে ও পিঁপড়ায় কামড়াইতে থাকে, তবে সেরূপ জায়গায় কর্মীর মন উচাটন হয়। কাজেই পরিষ্কার জায়গায় আসন পাতিতে হয়।

ছাই তোলা ঃ—

মধ্যে মধ্যে ছাই লাগাইতে থাকা একান্ত জরুরী ব্যাপার। সম্পূর্ণ ধাগাটি বাহির করার পরে, বা উহা গুটাইয়া লওয়ার পরে ছাই উঠানো ঠিক নয়। সম্পূর্ণ ধাগা বাহির করার পরে ছাই তোলা হইলে হাত ঐ ভাবেই উপরে উঠাইয়া রাখিতে হয়। এবং গুটানোর পরে ছাই লইতে হইলে নয়া ধাগা টানিতে দেরী হইয়া যায় এবং এই ভাবে দ্রুতি কম হইয়া থাকে। এই জন্য কাটিতে কাটিতে যখন পাঁজওয়ালা হাত অর্ধেক উপরে উঠে, তখন তকলিওয়ালা হাত ধাগা হইতে সরাইয়া তাড়াতাড়ি নিকটে রাখা ছাই ছোট থাবায় তুলিয়া লইতে হয়। চিমটি দিয়া যেন ছাই তোলা না হয়। পরে ধাগা পুরা টান করিয়া গুটাইয়া লইতে হয়। এই ভাবে ছাই উঠাইলে সময় বাঁচে, কাটাইও বন্ধ করার প্রয়োজন পড়েনা।

হওয়ার আর্দ্রতা ঃ—

খুব শুকনো হাওয়ায় আঁশগুলি খানিকটা কোকড়ানো ও কড়া হইয়া যায় এবং সুতা বারবার ছিঁড়িতে থাকে। হাওয়ার আর্দ্রতা থাকিলে সুতা ও ভালো বাহির হয় এবং অটুট ও থাকে। কাজেই বর্ষাকাল সুতা কাটার পক্ষে খুব উপযোগী। কিন্তু বুননের পক্ষে গ্রীষ্মের বা শীতের দিন বেশী উপযুক্ত। গ্রীষ্মের দিনে কাটাই ও ধুননের জন্য প্রাতঃকাল ভালো। ধুননের পক্ষে শুকনা আব-হাওয়া উত্তম। কাটাই ও ধুনাই এই উভরের পক্ষে শীত ঋতু ভালো। দ্রুত পরিবর্তনশীল আব-হাওয়া মোটা সুতায় বরদাস্ত করিতে পারিলেও ৪০।৫০ নম্বরের মিহি সুতার উপর উহার প্রতিক্রিয়া খুব খারাপ। কড়া রৌদ্রে মিহি সুতা কাটা যাইতে পারে না ; আর যদি কাটিতেই হয়, তবে হাওয়ায় আর্দ্রতা সৃষ্টি করা আবশ্যক। এই ব্যবস্থা কেবল শেষোক্ত পদ্ধতি সমূহের উপরেই চালু নয়, সব পদ্ধতির পক্ষেই কার্যকরী।

নীরবতা ঃ—

সুতা কাটার সময় চুপ করিরা থাকা খুব প্রয়োজন। কথাবার্তা দ্বারা মন

বিভক্ত হইয়া যায় এবং কাটাইয়েতে পুরা মন লাগে না, ফলে সুতা ছিঁড়িয়া যায় পরিণামে কাজ কম হয়। দ্রুতি বাড়ানোর পক্ষে আসক্তি একান্ত আবশ্যক। মন লাগাইয়া রোজ নিয়ম মত কাটিলে দ্রুতি যত বাড়িতে পারে, অন্য রকমে চার-চার ঘণ্টা কাটিলেও ততটা বাড়িতে পারে না। কিন্তু কেবল কথাবার্তা বন্ধ রাখিলেই মন লাগে না। সাথে সাথে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাতও বন্ধ করা দরকার।

ঘড়ি ধরিয়া কাটাই :—

ঘড়ি সামনে রাখিয়া সুতা কাটা উচিত। ইহা ব্যতীত দ্রুতির হিসাব রাখা যাইতে পারিবে না। কত সময়ে কত তার কাটা হইল, ইহা কাটুনীর জানা থাকা দরকার, নইলে অন্ধের মত কাজ হইতে থাকিবে।

লিখন ও লেখ (Graph) :—

রোজকার কাজ লিখিয়া রাখা উচিত। আধঘণ্টা বা এক ঘণ্টার দ্রুতিও রোজ লিখিয়া রাখা দরকার। এই সমস্ত বিষয় লিখয়া রাখিলে কাটাইয়ের উন্নতি না অবনতি হইতেছে, তাহা ঠিক বুঝা যাইবে। আধা বা এক ঘণ্টার দ্রুতি সমস্ত কাজের সহিত খাপ খায় কিনা, তাহাও জানিতে পারিবে এবং কাজে ঢিলামী হইতে থাকিলে উহাতে তাহাও শীঘ্রই বুঝা যাইবে। প্রত্যেকটি পদ্ধতির সর্বাধিক ও সর্বাল্প দ্রুতি কত, ইহাও বাহির করিতে পারিবে এবং কতদিনে কত দ্রুতি লাভ হইল, তাহারও সন্ধান মিলিতে পারিবে। অন্যান্য লোকের দ্রুতির সহিত নিজেরটারও তুলনা করা যাইবে। এই ভাবে প্রত্যেক পদ্ধতির সর্বাল্প, সর্বাধিক ও মধ্যম দ্রুতি ঠিক মত জানা যাইতে পারে। এই লিখিত বিবরণও উহাদের লেখ (Graph) হইতে অনেক রকমের কাজ আদায় করা যাইতে পারে। কাটাইয়ের জ্ঞানের জন্য ইহাদের তীব্র প্রয়োজন আছে।

খারাপ অভ্যাস :—

কাটাইয়ের আরম্ভেই একটুও সুতা নষ্ট না করবার স্থির সংকল্প করিয়া লওয়া উচিত। সুতা ছিঁড়িয়া ফেলা এবং ছেঁড়া সুতা ফেলিয়া দেওয়ার খারাপ অভ্যাস একবার বদ্ধমূল হইয়া গেলে উহা ত্যাগ করা মুশকিল হইয়া পড়ে। কাটুনী

উহাকে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করে। কাজেই একটুও সুতা নষ্ট না করার এবং ছেঁড়া ধাগা তাড়াতাড়ি জোড়া দেওয়ার অভ্যাস শুরু হইতেই করা উচিত।

এ পর্যন্ত তকলি কাটাইয়ের ২৪টি পদ্ধতি এবং তৎসম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ঐ পদ্ধতি সমূহের আলোচনা সম্পূর্ণ করার জন্য নাটাইয়েতে সুতা নাটাইয়া তকলি খালি করা, নাটানো তারের ফেটি তৈরি করা, উহা পাকাইয়া ঠিক করিয়া রাখা ইত্যাদি বিষয়ের ও বর্ণনা আবশ্যক। কাজেই এখন সেই সমস্ত বিষয় আলোচিত হইবে।

পূর্ববর্তী বিষয় সমূহ

সুতা নাটানো, মিল বাঁধা, ফেটি তৈরি করা ইত্যাদি ঃ—

* নাটাই কি ভাবে ধরিতে হয় ?—

বাম হাতে নাটাই ও ডান হাতে তকলি ধরিয়া সুতা নাটানো উচিত। শুধু নাটাইয়ের কানটি হাতে ধরিতে হয়। কান ঠিক মাঝখানে থাকিলে নাটাই সিধা রাখা সহজ। আঙ্গুলগুলি কানের উপরেই থাকা উচিত, অন্যদিকে বাড়িয়া গেলে সুতা নাটানোর সময় উহারা মাঝে বাধার সৃষ্টি করে। নাটাই খাড়া ও সমান ভাবে ধরা উচিত এবং উহা আপন দিকে খানিক ঝুঁকাইয়া রাখা দরকার। উহার উপরে উঠানো অংশটা শরীর হইতে দূরে এবং ঝুঁকানো অংশটা শরীরের কাছে রাখা উচিত। এই ভাবে ধরিলে ভূমির সহিত উহার ৪৫° হইবে ৬০° কোণ তৈরী হয় এবং নাটানোর সময় হাত উপর নীচে হেলাইতে হয় না। একই জায়গায় কুনুই রাখিয়া কেবল কবজি হেলাইলে সুতা নাটানো যাইতে পারে।

---

* আলোচ্য অধ্যায়ে বিভিন্ন নাটাইয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। তকলি, চরকা ও তাঁতের কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাটাই ব্যবহৃত হয়। এখানে নাটাই নামেই সব কয়টির উল্লেখ করা হইলেও উহাদের স্বতন্ত্র নিজস্ব নাম থাকা প্রয়োজন। নিম্নোক্ত তিনটি নাম এই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইতে পারে। তকলির নাটাইয়ের নাম—অটেরন বা রীল (Reel)। চরকার নাটাই—চরকি এবং তাঁতের কাজের জন্য ব্যবহৃত নাটাইয়ের নাম—নাটাই।

নাটানোর সময় হাত কি ভাবে ঘুরাইতে হয় ঃ—

একা ডান হাতে সুতা নাটানো যায় না। এই কাজ উভয় হাতের যোগা-যোগে করিতে হয়। নাটানোর সময় বাম পাঞ্জা ঘড়ির দোলনের মত নড়িতে থাকে, আর ডান পাঞ্জা উপর নীচে উঠানামা করে। বাম পাঞ্জার নড়নে নাটাইটি উপর নীচ হইতে থাকে, যাহাতে ডান হাতের কুনুই এক জায়গায় স্থির রাখিয়া ছোট ঘের লইয়া সুতা নাটানো যায়। নইলে, কুনুই উঠাইয়া বড় ঘের লইতে হয়। ইহাতে আপনা আপনি মিল পড়িয়া যায়।

নাটানোর সময় তকলি কিভাবে ধরিতে হয় ঃ—

তকলিটি আড়াআড়ি ধরা উচিত। সুতার কুণ্ডলীর কাছে তকলির খোলা ডাঁটটি বুড়া আঙ্‌ল ও তর্জনীর চিমটিতে আল্‌গা ভাবে ধরিতে হয়। অনি বাম দিকে এবং নাক ডানদিকে রাখিলে তকলিটি নাটাইয়ের সমকোণে থাকিবে। এই সময় হাতের তালু উলটা থাকে, অর্থাৎ হাতের পিঠটি আপন দিকে থাকে। আঙ্গুলগুলি খোলা ডাঁটের উপর স্থাপিত থাকে এবং তাহারা তকলিটি ঘুরানোর ও ভূমির সহিত সমান্তরাল রাখার কাজ করে। আঙ্‌লগুলি বাহির করিয়া লইলে তকলিটি ভূমির সহিত সমকোণ তৈরি করিতে চায়।

সুতা কোন রকম নাটানো উচিত ?

উল্লিখিতরূপে তকলি ও নাটাই হাতে ধরার পর প্রথমে সুতার থেইটি বাম বুড়া আঙ্‌লে নাটাইয়ের কানে চাপিয়া তকলিটি নাটাইয়ের চারিদিকে গড়াইতে হয়। গড়ানোর সময় সুতা প্রথমে নাটাইয়ের উপরিভাগের বাম দিকে, পরে পিঠ বাহিয়া সোজা নীচে, পরে নাটাইয়ের পিঠের উপর দিয়া সিধা নীচে ডানদিকে এবং সব শেষে নাটাইয়ের পেটের উপর দিয়া উপরাংশের বাম দিকে লাগাইয়া নাটানো উচিত। এই ভাবে বরাবর চার ফুট সুতা নাটানো হয়। চার ফুটে একটি তার পূরণ হয়, কাজেই উহা এক বলিয়া গণনা করা উচিত। কানের উপরাংশে বাম দিকে লওয়া প্রথমকার ৫।৬ ইঞ্চি ধাগাটুকু শুরু করার জন্য লাগানো হয় বলিয়া উহা গুণতিতে ধরা উচিত নয়। এই ভাবে নাটাইতে নাটাইতে তার গুণিতে থাকা উচিত।

চিঠা লাগানো :—

পরে তার গুনিলে সময় অনর্থক নষ্ট হয়। গণনার পরে ভুলিয়া গেলেও তাহাই হয়। কাজেই কাটুনীর নিজের সঙ্গে কাগজ পেন্সিল রাখা উচিত। নাটানো তার চিঠায় লিখিয়া উহা সুতার ফাঁকে ঢুকাইয়া দেওয়া উচিত। ইহা হইতে যদি বাঁচিতে হয় অথবা লাছি অসম্পূর্ণ রাখিতে হয়, তবে আশি বা একশ বা অনুরূপ কোন পূর্ণ সংখ্যায় শেষ করা উচিত। লাছি পুরা হইলে উহা রঙীন ডোরে বাঁধিতে হয়, কাজেই তারের সংখ্যা মনে রাখার প্রয়োজন পড়ে না। ১৬০ তারে একটি লাছি।

নাটাই হইতে কত তারের ফেটি নামানো উচিত ?

সুতার নম্বর ১০-এর কম হইলে নাটাইতে এক লাছির বেশী তার জড়াইলে অসুবিধা হয়। কাজেই ১০ নম্বর অবধি সুতার এক একটি লাছিই নাটাই হইতে বাহির করিয়া লওয়া উচিত। ১০ হইতে ২০ নম্বরের সুতার দুই দুইটি লাছি এবং তাহা হইতে উঁচু নম্বরের সুতার এক একটি ফেটী নাটাই হইতে তুলিতে হয়। ইহাতে সুতা খুলিতে সুবিধা আছে। নাটাইয়েতে যখন একাধিক লাছি নাটানো হয়, তখন প্রত্যেকটি লাছি ডোর দিয়া মিল লাগাইয়া পৃথক রাখার প্রয়োজন নাই। কারণ নাটানোর সময় প্রত্যেকটি তারের মিল দিয়াই সেই কাজ সাধিত হয়। কিন্তু তার বা লাছি লিখিয়া রাখার জন্য কাগজ পেন্সিল অবশ্যই সঙ্গে রাখা উচিত। এরূপ না করা হইলে প্রত্যেকটি লাছি মিল দিয়া বাঁধা অথবা কোন নির্দিষ্ট সংখ্যায় লাছি অসম্পূর্ণ রাখা আবশ্যক হয়।

মিল :—

উল্লিখিত পদ্ধতিতে তার নাটাইলে নাটাইয়ের সামনের অংশে গুণ চিহ্ন (×) তৈরী হয়। ইহাকে মিল বলে। এই মিল নাটানোর সময় সামনে রাখা দরকার। নাটাইয়ের পিছন দিককার তার সমান্তরাল থাকে। নাটানোর সময় মিলে ভুল হওয়া উচিত নয়। এরূপ যেন না হয় যে ডান ও বামদিকের তার কাছাকাছি আসিয়া মিলের ছোট কোণটি মিলাইয়া যায়।

মাথার উপর মিল :—

নাটাইয়ের ঠিক মাঝখানে মিল লাগাইয়া সামনে দুইটি ছোট কোণ তৈরির

পরিবর্তে নাটাইয়ের নীচের মাথায় মিল লাগাইয়া সামনে ও পিছনে এক একটি ছোট কোণ তৈরী করিয়া তোলা ও নাটানোর একটি প্রণালী। কিন্তু উহা ঠিক নয়। উহাতে তার পরস্পরের উপর সমান্তরাল ভাবে পড়িতে পড়িতে নাটানো হয় না, ফলে ফেটি তোলার পরে তার অনেক দূর পর্যন্ত পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া থাকার দরুণ মিল তাড়াতাড়ি ঠিক হয় না।

মিল না লাগাইয়া নাটানো ঃ—

ইহা ছাড়া আরেকটি প্রণালী আছে। তাহাতে চরকার লাছির মত মিল না লাগাইয়া নাটানো হয়। এই পদ্ধতিতে ফেটিটি চরকার মত চার ফুটেরই তৈরী হয়। কিন্তু ইহাতে তকলি হইতে নাটাইয়ের চারিদিকে উল্টা সোজা চক্কর লাগাইতে হয়, ফলে নাটাইতে অনেক দেরী লাগিয়া যায়। এইভাবে নাটানো কিছু মুশ্‌কিল ও এই কারণে সময়ও বেশী লাগে।

তাড়াতাড়ি নাটানোর উপায় ঃ—

অন্যান্য ব্যাপারে তকলি প্রায় চরকার সমান হইয়া পড়িলেও সুতা নাটানোর ব্যাপারে কিন্তু উহা খুব পিছনেই থাকিয়া যাইতেছে ; কাটাইয়ের সময়ের এক চতুরংশ বা এক তৃতীয়াংশ নাটানোর ব্যয়িত হইয়া যায়। কাজেই এমন কোন উপায় বাহির করা আবশ্যক যাহাতে এই সময়ের পরিমাণ কিছু কমিতে পারে। নাটানোর সময় তকলির নাকটি বাহির করিয়া লওয়া যায়, এরূপ কোন উপায় হইলে চরকার টাকুর মত তকলির সুতাও চরকিতেই অল্প সময়ের মধ্যে নাটানো যাইতে পারিবে। যে ভাবে বর্শার ফলক ডাঁটে ঢুকাইয়া লাগানো হয়, সেই ভাবের একটি ফাঁপা নাক তৈরি করিয়া তকলির ডাঁটে পরানো যাইতে পারে। নাল বাড়ীতে ইহার পরীক্ষাও করা হইয়াছে। নাকে টুপি এবং প্যাঁচালো নাক লাগাইয়া কাটাই করা হইয়াছে। ডাঁটে খাড়া ছিদ্র করিয়া প্যাঁচালো নাক উহাতে প্যাঁচের মত কসিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ডাঁটটি সরু থাকার দরুণ উহাতে খাড়া ছিদ্র করা এবং ছিদ্রে প্যাঁচ কাটা মুশকিল। অনুরূপ ভাবে একটা ছোট মতন নাক বানাইয়া উহাতে প্যাঁচ কাটাও সহজ নয়। এই জন্য প্যাঁচালো নাক দিয়া ঠিক মত কাটা যায় না। ইহাতে ডাঁটটিও চরকার টাকুর মত ক্রম-সুক্ষ্ম করা যায় না ; ইহাও একটা মস্ত ত্রুটি। টুপি টিন দিয়া তৈরী

করিতে হয় এবং তাহাতে ঝালা লাগাইতে হয়। ঝালাইকর এই ধরণের টুপি বানাইয়া দিতে পারে। ইহার মূল্য প্রায় এক পয়সা।

টুপিওয়ালা তকলির সুতা নাটানোর জন্য নাটাই কাজে লাগে না। উহার জন্য চরকি (বড় নাটাই) ও চরকির বৈঠক (stand) কাজে লাগাইতে হয়। নাটাইয়ে ১৬০ তার জড়াইতে ৮-১০ মিনিট লাগে, অথচ চরকিতে তকলির সুতা জড়াইতে মাত্র ৩-৪ মিনিট লাগিবে। এই লাভ কম নয়। প্রত্যেকবার ৫-৬ মিনিট বাঁচিয়া গেল। অর্থাৎ ৩০ জন ছাত্রের একটি শ্রেণীর ২॥০ ঘণ্টা এবং স্কুলে ৪টি শ্রেণী থাকিলে এক স্কুলে ১০ ঘণ্টা বাঁচিবে। ইহা একটি লাছির হিসাব মোটের উপর ইহার চাইতে বেশী সময় বাঁচিতে পারে। কিন্তু এই লাভ আদায় করার জন্য প্রথমে একটি শর্ত পূরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ সুতা কড়া, ঠিক ঢঙে এবং শঙ্কুর আকারে গুটাইতে হইবে। না-ঠেকাইয়া গুটাইলে এই ব্যাপার ঘটিতে পারে। ঠেকাইয়া গুটাইলেও এরূপ করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা সব অবস্থায় বানানো যায় না, কারণ ধাগা ভালো রকম টান করিয়া রাখিয়া ঠেকাইয়া গুটানোয় উহা জমাট বাঁধিয়া বসে না এবং সুতা তকলির ডাঁটের উপর লম্বালম্বি গুটানোর ফলে শঙ্কুর আকারে ঠিক মত তৈরী না হইয়া নলীর আকার ধারণ করে।

নাটানোর প্রথম পদ্ধতির সহিত উল্লিখিত দ্বিতীয় পদ্ধতির তুলনা করিলে শেষোক্ত পদ্ধতিতে কোন বিশেষ লাভ দৃষ্টিগোচর হয় না। কাজেই টুপি-সংস্করণ ব্যবহারে লাগানো অলাভ। তকলি দুই আনায় মিলে কিন্তু চরকি ও উহার বৈঠকের জন্য চার আনা লাগিয়া যাইবে। সাদাসিধা তকলির সহিত এই আড়ম্বর খাপ খায় না।

দ্বিতীয় খণ্ড

ষষ্ঠ অধ্যায়

মিল লাগানোয় লাভ-লোকসান ঃ—

মিলে একদিকে লাভ থাকিলে ও অন্যদিকে আবার লোকসানও আছে। লাভ এই যে, ইহাতে খেই হারাইবার আশঙ্কা থাকে না ; আর ক্ষতি এই যে, ফেটি নাটাইয়েতে চাপাইয়া নলি ভরার সময় সুতা সমান ভাবে টানা যায় না, ফলে নাটাই ঠিক মত ঘোরে না। সুতা খোলার পক্ষে ফেটির ঘেরা যত বেশী হইবে, ততই ভালো। এই ব্যাপারেও তকলির নাটাইয়ের ফেটি সুবিধা জনক নয়। চরকির ফেটিতে এই অসুবিধা একটাও নাই। উহাতে মিলও রাখা যায়। কিন্তু তকলির সুতা চরকিতে গুটানো সহজ না হওয়ায় পরিণামে নাটাই-ই উপযোগী বলিয়া প্রমাণিত হয়।

হারানো ধাগা খুঁজিয়া বাহির করা ঃ—

নাটানোর সময় প্রায়ই ধাগাটি কুণ্ডলীর পাশে ছিড়িঁয়া উহাতে ঢুকিয়া যায়। কুণ্ডলী ফাঁপা হইলেই বিশেষ ভাবে এরূপ ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থায় ধাগাটি খুব সতর্ককার সহিত খুঁজিতে হয়। ধাগা যে যে জায়গায় হারাইয়া যায়। তাহার উপরের ধাগা ধরিয়া তকলিটি ধীরে ধীরে সোজা দিকে ঘুরাইতে থাকিলে হারানো খেই বাহির হইয়া আসিবে। ইতিমধ্যে অন্য ধাগা আসে তো, প্রথমটি ছাড়িয়া দ্বিতীয়টি ধরিয়া আবার তকলিটি প্রথমবারের মত ঘুরানো উচিত। তকলি যেন উল্‌টা ঘুরানো না হয় ; উহাতে ধাগাটি পিছনে চলিয়া যাইবে এবং হারানো খেই পাওয়া যাইবে না। ধাগা ছিঁড়িয়া সুতা এলো মেলো করা উচিত নয়। উহাতে সমস্ত সুতা নষ্ট হইয়া যাইবে। অনুরূপ ভাবে কখনও কখনও ধাগাটি নাটাইয়েতে ছিঁড়িয়া নাটানো সুতার মধ্যে হারাইয়া যায়। সেই সময় মিলের উপরের ধাগা তকলির ডাঁটের উপর তুলিয়া তকলিটি সোজা দিকে ঘুরাইতে হয়। তাহাতেই হারানো খেই বাহির হইয়া আসে।

সুতা ভিজানো

নাটাইয়েতে দুই লাছি সুতা গুটানোর পরে উহা নামানো উচিত নয়। এই

ভাবে নাটানো সুতার উপর ভিজা কাপড়ের পট্টি জড়াইয়া রাখা উচিত। উহা শুকানোর পরে লাছি খুলিয়া নামাইতে হয়। এভাবে ভিজাইয়া শুকাইলে সুতার আঁশ সব চাপিয়া বসে এবং পাক স্থায়ী হয়, খুলিয়া যায় না। ফলে, বহুদিন জমা থাকিলেও সুতার শক্তি কমে না। নাটাই হইতে খোলার পরে সুতা ভিজানো ঠিক নয়, কারণ, খোলা ফেটি কুঁকড়াইয়া থাকে। অথচ সুতা নাটাইয়েতে টান হইয়া থাকে, সেই সময় ভিজাইয়া শুকাইবার পরে ফেটি বাহির করিয়া লইলে উহা ইস্ত্রি করা কাপড়ের মতো কড়া ও সুশ্রী হইয়া যায়।

ফেটি পাকানোর আবশ্যকতা :—

ভিজাইয়া শুকানো সুতা নাটাই হইতে তোলার পরে উহার ফেটি বানাইতে হয়। ইহাতে সুতার উপর আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া বেশী হয় না, সুতা এলো মেলো হওয়ার ভয় থাকে না এবং আনা-নেওয়া ও সাবধানে রাখিয়া দেওয়ার সুবিধা হয়। কাপড় বুনিবার আগে কয়েকবার সুতাকে নাড়া চাড়া করিতে হয়। কাজেই সুতা যাহাতে খারাপ না হয় এবং সাবধানে থাকে, সেই উদ্দেশ্যে পাকাইয়া ফেটি তৈরী করা আবশ্যক।

নাটাই হইতে সুতা নামাইয়া আনা :—

নাটাই হইতে কি ভাবে সুতা নামাইয়া আনিতে হয়, তাহা বলা আবশ্যক করে না। যে কোন মাথায় একটু জোর দিয়া এক দিকে টানিলেই সেই মাথাটি বাহির হইয়া আসে এবং চার দিকের সুতা ঢিলা হইয়া সহজে অবশিষ্ট মাথাগুলি ও বাহিরে আসে। পরে হাটু দুইটি পরস্পরের কাছে আনিয়া ফেটির এক একটি আংটায় উহাদের ভরিয়া দিতে হয় এবং হাঁটু টান করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধাগা ভিতরের দিকে ঠেলিয়া মিল ঠিক করিয়া লওয়া উচিত।

মিল বাঁধা :—

মিল ঠিক করার পরে উহা রঙীন ডোরে বাঁধা প্রয়োজন। বাঁধিলে ধাগা এদিক ওদিক বাহির হইতে পারে না এবং মিল ঠিক থাকে। রঙ্গীন ডোর লওয়ায় সাদা সুতায় উহা নজরে পড়ে এবং খুঁজিতেও হয় না। বাম হাতের সুতার জন্য একটি রং কাজে লাগানো উচিত। ইহাতে ডান হাতের সুতা পৃথক করিয়া রাখার সুবিধা হয়। ধাগা দোহারা পাকাইয়া ডোর তৈরি করিতে

হয়। একটি ফেটির জন্য ছয় ইঞ্চি ডোর যথেষ্ট। ডোরের একটি মাথা বাম আংটায় উপর হইতে গলাইয়া নীচের দিকে বাহির করিতে হয় এবং বাম আংটার উপর অন্য প্রান্ত দিয়া উহার একটি হট্‌কা গিঁট লাগাইতে হয়। গাঁট যেন ঢিলা থাকে। কসিয়া বাঁধিলে ফেটি রঙানোর সময় বাঁধা ধাগায় রং লাগিবেনা।

ফেটি পাকানো :—

এই ভাবে মিল বাঁধার পরে হাটু হইতে ফেটিটি বাহির করিয়া উহার একটি আংটা বাম পায়ের আঙ্গুলে আটকাইয়া দিতে হয় এবং অপর মাথাটি উভয় হাতের তালুতে চাপিয়া উহা সোজা দিকে পাকাইতে হয়। প্রয়োজন মত পাক দেওয়ার পরে এই পাকানো ফেটিটি মধ্যে ভাঁজ করিয়া দড়ির মত পাকাইয়া বুড়া আঙ্গুলের দিকে পাকাইতে থাকা উচিত এবং সব শেষে যখন হাতে মাথাটির অল্প একটু বাকি থাকিবে, তখন পায়ের বুড়া আঙ্গুল হইতে আংটা বাহির করিয়া উহার ভিতরে গুঁজিয়া দিতে হয়।

ফেটি বেলা :—

শক্ত ও সমতল জমির উপর কাগজ বিছাইয়া তাহার উপর পাকানো সুতার ফেটিটি হাতের তালু দিয়া ভালো রকম বেলিতে হয় যাহাতে ইহার মুখ ঠিক হয় ও পাক ভালো ভাবে লাগিয়া যায়। বেলার সময় হাতের ময়লা যাহাতে সুতার উপর না লাগে, সে জন্য হাতটি প্রথমে ধুইয়া সাফ করিয়া লইতে হয়।

ফেটির কোষ্ঠী :—

এই ভাবে ফেটিটি পাকাইয়া ও বেলিয়া ঠিক মত তৈরি করার পরে উহাতে একখণ্ড ফর্দ ডোরের সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। এই ফর্দে কাটুনীর নাম, তারের সংখ্যা, ওজন, নম্বর, কাপাসের জাত, ডান বা বাম হাত, তারিখ ইত্যাদি বিষয় সমূহ লিখিয়া রাখা উচিত। অক্ষর যেন সুশ্রী ও সাফ হয়। ফর্দটি ফেটির মধ্যে গুঁজিয়া দেওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক বিষয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা মনে থাকা দরকার। এই ভাবে এই কোষ্ঠীটির সঙ্গে ফেটিটি সাবধানে রাখিয়া দিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

মিহি সুতা কাটাই।

তকলির অপূর্ব ইতিহাস ঃ—

মিহি সুতা কাটার ইতিহাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কাজেই এই পৃথক অধ্যায়ে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

কিন্তু তার আগে ১৯৩৭-এর ১৫ই মে-র "হরিজন" হইতে "হাওয়া দিয়া বুনানো মাকড়সার জাল" নামক একটি প্রবন্ধ যথাযথ ভাবে এখানে উদ্ধৃত হইতেছে। ইহা কিরকম সূক্ষ্মতম সুতা কাটা হইত। ওখানকার কারিগরেরা কিরূপ ছিল। উহাদের কলাকৌশল কিরূপ অদ্ভুত ছিল এবং উহাদের যন্ত্রপাতি —যাহাতে অতুলনীয় শিল্পের কাজ হইত—তাহা কিরূপ সাদাসিদা ও সাধারণ রকমের ছিল।

"১৮৫৮ সালে সর্বপ্রথম প্রকাশিত সার্জন জেনারেল বালফোর রচিত "হিন্দুস্থানী বিশ্বকোষ" হইতে নিম্নোক্ত বিবরণ গৃহিত হইয়াছে। একশ বছর আগে ঢাকায় কি রকমের মলমল তৈরি করা হইত, ইহা হইতে তাহারই এক অপূর্ব দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে। ঢাকার মলমল মানুষের হস্তশিল্পের অপূর্ব্ব বিকাশের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু আজ উহা অতীত যুগের একটি কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। ভারতের কারিগরদের এই পুরাতন শিল্পকলার আজ নূতন প্রাণ সঞ্চার হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু উপযুক্ত অবস্থা ও উৎসাহ মিলিলে হস্তশিল্প কতখানি উন্নতি করিতে পারে, তাহা দেখানোর জন্য যথেষ্ট প্রমাণ আমরা আজ দিতে পারি। আশ্চর্যের কথা এই যে, পরে মিহি সুতা কাটার যে বর্ণনা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে কাটাইয়ের যন্ত্র চরকা নয়, সামান্য তকলি। উহা দিয়াই "ভারতীয় মহিলারা" সব চাইতে মিহি সুতা কাটিতেন। ছোট মতন একটা তকলি কেমন বিরাট শক্তিতে ভরপুর, ইহার এই একটি প্রমাণ। তকলির এই সামর্থ্যকে পুনরায় কাজে লাগানোর জন্য আজ আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে।

"কিছুদিন আগেও ঢাকার অধিবাসীরা নিজেদের সাদাসিদা যন্ত্রেই মলমল তৈরি করিতেন। এসম্পর্কে ডাঃ য়ুর বলিয়াছেন—ইউরোপ বাসীর শিল্প নৈপুণ্য

ইহার সম্মুখীন হইতে পারে না। এই মলমল দেখিয়া একজন ওস্তাদ কাটুনী বলিয়া ওঠে—ইংলণ্ডে কাটা সর্ব্বাধিক নম্বরের সুতার চাইতেও অধিকতর মিহি সুতা কিভাবে পাঁজ ও তকলির সাহায্যে কাটা যায় এবং কোন্ যন্ত্রে উহা বুনা হয়, ইহা আমার জ্ঞানের অতীত।

"বেয়াল মাছের (Solurus Boalis) চেয়ালের হাড়ের দাঁতগুলি খানিকটা ভিতর দিয়ে বাঁকানো এবং ঘন। কাপাসের মধ্য হইতে মিহি ধুলা কণা এবং পাতা, আবর্জনা ইত্যাদি আলগা করিয়া বাছিয়া ফেলার জন্য ইহা কাজে লাগানো হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে ভারতীয় কাটুনী অটুট ধৈর্য্যের সহিত—এই জাতির ইহাই বৈশিষ্ট্য—কাপাসের প্রত্যেকটি ঢেঁড়ি পরিষ্কার করার শ্রমসাধ্য কাজ সুরু করে। এই কাজ সমাপনান্তে সে একটি লোহার বেলুন দিয়া বীজ হইতে তুলা পৃথক করে। একটি চৌরস পাটার উপর কাপাসের কয়েকটি ঢেঁড়ি বিছাইয়া তাহাদের উপর বেলনটি সামনে পিছনে চালানো হয়। পরে আঁতের দোহারা তাঁত, মুগা-রেশম অথবা কলা গাছের আঁশের পাকানো ডোর দিয়া সাজানো বাঁশের ধনুকে তুলা ধোনা হয়। ধুননের ফলে তুলার আঁশ যখন উলের মত আল্‌গা আল্‌গা হইয়া যায়, তখন উহা দিয়া আঙ্গুলের মত লম্বা লম্বা বাতি (পাঁজ) তৈরি করা হয়। সুতা কাটার সময় ঐ বাতি হাতে ধরে। সুতা কাটার জিনিষ পত্র ছোট ছোট ডালি বা সরাতে রাখে। এই ডালি বা সরা গ্রীসের পুরাতন কেথিটরের মতন (catheterae)। উহাতে একটি পরিষ্কার লোহার সরু টাকু থাকে। ঘুরানোর জন্য উহাতে একটি মাটির গোলার ভার লাগানো হয়। মাটিতে বসানো কাছিমের শক্ত খোলের উপর ঠেকাইয়া টাকুটি ঘোরানো হয়। এই যন্ত্র দিয়া ভারতীয় মহিলারা কাটাইয়ের আদর্শ কলানৈপুন্যের প্রায় নিকটে গিয়া পৌছে।

"এই যন্ত্রে যে ধাগা বাহির হয়, তাহা খুবই সরু। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহাদের এই অপূর্ব ক্ষমতা নির্ভর করে উহাদের দেহের কোমল গঠন ও উহাদের সুক্ষ্ম স্পর্শসচেতনতার (Sensibelity) উপর। অতি ভোরে সূর্যের তেজে শিশির শুকাইয়া যাওয়ার আগেই খুব মিহি সুতা কাটিতে হয়। কারণ, উহার আঁশ এতই কোমল যে, দিবাভাগের শুকনা ও গরম আবহাওয়ায় কাটিলে উহা ছিঁড়িয়া যায়। যে আঠালো রসে কাপাসের আঁশ পরস্পরের সঙ্গে আট্‌কাইয়া থাকে, তাহা গরম ও শুষ্ক হাওয়ায় শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই ভোরে যখন শিশির পড়ে না বা হাওয়ায় আর্দ্রতা থাকে না, তখন জল

ভর্তি চওড়া বাসনের উপর সুতা কাটিয়া কাটুনী আর্দ্রতার প্রয়োজন পূর্ণ করে।

"১৮৪৬ সালে ডাঃ টেইলর ঢাকায় একটি সুতার নমুনা পরীক্ষা করেন। উহার দৈর্ঘ ছিল ১৩৩৯ গজ আর ওজন মাত্র ২২ গ্রেণ। পাউণ্ডের হিসাবে এক পাউণ্ড ওজনের সুতার দৈর্ঘ্য ২৫০ মাইল হইতেও বেশী হইবে (অর্থাৎ এই সুতার নম্বর ৫০০ হইতেও অধিক এবং ৫১১ হইতে কিছু কম হইবে।) টানা দেওয়ার আগে এই মিহি সুতা দুই একদিন কয়লার মিহি গুঁড়া বা কাজল মিশানো জলে ডুবাইয়া ভিজানো হয়। পরে পরিষ্কার জলে ধুইয়া ও নিংড়াইয়া ছায়ায় শুকায়। শুকানোর পরে উহাতে খই, মিহি চুণ এবং জলে তৈরী মাড় লাগানো হয়। তাঁত এত হাল্‌কা থাকে যে, সহজে যেখানে খুসি উহা তুলিয়া নেওয়া যাইতে পারে। তাঁতে শানা, বীম, বেলন, নলি ইত্যাদি অনেক অংশ আছে।

"মলমল বুনাইবার ঢাকাই ছিল প্রধান স্থান। ঢাকার নামেই মলমল প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রাচীন যুগে উহাকে বাদে-বাফ্‌তা অর্থাৎ হাওয়ায় বুনানো জাল বলা হইত। ঢাকাই মলমল বিশেষ বিশেষ রকমের ছিল। ইর-ওয়াস, আবেরওয়ান, শবনাম, খাস, ঝুনা, সরকারআলী, তনজেব, অলাবুলী, নয়নসুখ, বদনখাস, তুরানদম, শরবতী, সরবন্দ ইত্যাদি। এই সমস্ত নাম হইতে মলমলের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য, মিহি-বুনট, বুনন স্থান বা কোন্ রকমের পোষাকের কাজে উহা লাগে, সেই সমস্ত বিষয় বুঝা যায়। মলমল-এ-খাস ছিল সর্বাধিক মিহি। মললল-এ-খাসের অর্থ রাজরাজড়া অথবা বড় বড় লোকের জন্য বুনা খাস মলমল। ইহার দৈর্ঘ্য হইত ১০ গজ এবং প্রস্থ ১ গজ। উহার টানায় ১৯০০ ধাগা থাকিত আর ওজন হইত ১০ সিক্‌কা (প্রায় ৩$\frac{3}{8}$ আউন্স (Avor-dupois) সব চাইতে মিহি মলমলের আধ থান—আজও যাহা দেখিতে পাওয়া যায়—৯ ভরি ওজনের ছিল আর তার দাম ছিল ১০০৲ টাকা। মলমলের অপর কয়েকটি প্রকার-ও তাঁত শিল্পকলার পরাকাষ্ঠা। যেমন আবেরওয়ান মলমল। যাহাকে বহমান জলের সঙ্গে ওখানকার লোকেরা তুলনা করিত,ভিজাইয়া রৌদ্রে শুকানোর জন্য বিছাইয়া দিলে যাহা শিশিরের মত দেখাইত, তাহাকে বলা হইত শবনম ! এইভাবে ঝুনা মলমল তৈরী হইত অভিজাত ও ধনী সম্প্রদায়ের জন্য এবং অন্তঃপুরচারিণী সুন্দরীরা উহা পরিধান করিতেন। উহা ঝুনা অর্থাৎ সূক্ষ্ম জালের মতন হাল্‌কা ও মিহি হইত। গ্রীক ও ল্যাটিন পুস্তকে সমূহ ইহাদের Telu

arenarum, Ventum texilis প্রভৃতি আদরের নাম দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত মলমল ২০ গজ লম্বা ও একগজ চওড়া করিয়া বুনানো হইত। কিন্তু প্রত্যেক রকমের টানায় ধাগার সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন থাকিত। ডোরাকাটা থান, চৌখুপী চারখানা এবং বুটিদার জামদানী ইত্যাদি মলমলের বিভিন্ন জাতে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিত। বুটিদার মলমলের চাহিদা ভারতে এবং বিলাতে খুব বেশী ছিল। ইহার বুনাই খরচ ঢাকার সব মলমল অপেক্ষা অধিক হইত। সবচেয়ে মিহি মলমলের এক চেটিয়া কারবার কেবল দিল্লীর বাদশাহদের উপরেই নির্ভর করিত। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের জন্য যে মলমল তৈরি করা হইত, তাহার আধ থানের দাম ছিল ২৬০৲ টাকা। কিন্তু ৮০ টাকার অধিক মূল্যের মলমল আজকাল কদাচিৎ তৈরী হয়।"

"এই পুস্তকের অপরাংশে ভারতবর্ষের কাটুনী, তাঁতি এবং রঞ্জকদের নৈপুণ্যের এই ভাবে প্রশংসা করা হইয়াছে।

"একটানা কাজ করিবার সামর্থ্যে এবং যে কোনও সূক্ষ্ম কাজে অন্য কোনও কোনও দেশের কাপড় ভারতীয় কারিগরদের সমকক্ষ নয়। উহাদের জিনিষে নূতনত্ব ও সৌন্দর্য থাকে। সুতা কাটার কাজে এবং আচার ব্যবহার অনুযায়ী পরিধানের জন্য সুতী ও রেশমী কাপড় বুননের কাজে ভারতীয় তাঁতীদের সহিত ইউরোপের কারিগরেরা প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। কলকারখানার সাহায্যে জিনিষপত্র অধিক সস্তায় তৈরী হয়, কিন্তু হাতে বানানো জিনিষ উহার চাইতে বেশী টেকসই। ভারতীয় চারখানা, ফুলতোলা বা ডোরাকাটা মলমল অত্যন্ত মজবুত এবং উহাদের রংও খুব পাকা। ভারতীয় কারিগরদের একটানা কাজ করিবার অভ্যাস, যথেষ্ট পরিশ্রম ও সূক্ষ্মতা প্রত্যেক ইউরোপীয় কারিগরের শিখা উচিত। একটানা কাজ করিবার অভ্যাস ও সূক্ষ্মতা উহাদের একটি বৈশিষ্ট্য। উহাদের সাহায্যে তাহারা শিল্পকলাকে সঞ্জীবিত করিয়া চোখের সামনে তুলিয়া ধরে। এই শিল্প নৈপুণ্যে উৎসাহ দেওয়া ভারত ও ইউরোপ উভয়ের পক্ষে লাভের কথা। ইহার ধ্বংসে দুনিয়ার সভ্যতায় অত্যন্ত আঘাত লাগিবে এবং জীবনের সুখ ও মূল্য কম হইয়া যাইবে। ভারতের কলা কৌশল সেখানকার লোকদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। ভারতীয় কারিগরদের ধৈর্য অটুট থাকার ফলে উহারা যে শিল্পকলায় খুসী তাহাতেই নিপুণ হইতে পারে। ইহা তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। পুরুষানুক্রমে একই রকমের হস্তশিল্পে লাগিয়া

থাকার ফলে বংশানুক্রমিক অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার ফলে ইহাতে এত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।'

"এই প্রসঙ্গে ঢাকাই মসলিন সম্পর্কে নিম্নোক্ত কথাগুলিও পাঠকের মনে লাগিবে।

তিনশ বছর আগে ১৫ গজ লম্বা এবং ৩ ফুট চওড়া, একখানা থানের ওজন মাত্র ৯০০ গ্রেণ হইত। কিন্তু বর্তমানে ওজন দ্বিগুণ না করিয়া এরূপ আয়তনের কোন বস্ত্র প্রস্তুতি সম্ভবপর নয়। ঢাকাই মসলিনের মধ্যে আবরোয়ান ও শবনাম দ্বিতায় ও তৃতীয় শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর মলমল ছিল "সওগাতি" অর্থাৎ যাহা সওগাত বা উপহার দেওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী হইত; "শরবতি" অর্থাৎ যাহা শরবতের মত শরীর স্নিগ্ধ করে। এবং "মলমল-এ-খাস" অর্থাৎ খাস বাদশাহের জন্য তৈরী। এই প্রথম শ্রেণীর মলমলের ১৫ গজ দীর্ঘ ও ১ গজ চওড়া থান একটি ছোট মতন আংটীর ভিতর দিয়া গলাইয়া দেওয়া যায়। এই রকম একখানা থান বুনাইতে কম পক্ষে ছয় মাস লাগে এবং ইহার মূল্য ৩০০৲ টাকা। টাভারনিয়ার বলেন, 'পারস্যরাজকে তাঁহার ভারতবর্ষস্থ রাজদূত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া এইরূপ ৩০ গজ মলমল উটপাখীর ডিম অপেক্ষা ক্ষুদ্র একটি নারিকেলের খোলের মধ্যে স্থাপন করিয়া উপহার দিয়াছিলেন। মিহি জমিন ও সূক্ষ্ম বুননে ইউরোপের সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রোৎপাদিত বস্ত্র ও এখন পর্যন্ত ঢাকার মসলিনকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। (T. N. Mukherjee Hand book of Indian products. Quoted by S. C. Mitter in "A Recovery plan for Bengal. pp. 292.,"

এই সঙ্গে আরও কিছু কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

যাট নম্বরের নীচের সুতা তকলিতে কাটা হইত না, উহা চরকায় কাটা হইত।

প্রথম উষার আলো ফুটিবার সঙ্গে আরম্ভ করিয়া প্রাতে বেলা ৯-১০টা অবধি এবং সন্ধ্যা ৩-৪টা হইতে সূর্য ডোবার এক ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত মিহি সুতা কাটাই চলিত। ৮০° ডিগ্রি তাপমাত্রা (farheneit) এবং খানিক আর্দ্র হাওয়া যুক্ত আবহাওয়া সুতা কাটাইয়ের পক্ষে উপযোগী বলিয়া গণ্য হইত। সর্বাধিক মিহি সুতা কাটুনী স্ত্রীলোকেরা ছিল ১৮ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্য বয়সী।

প্রাতের সমস্ত সময়টুকু সুতা কাটায় লাগাইয়াও কাটুনী সব চেয়ে মিহি সুতা বেশী পক্ষে আধ তোলা সারা মাসে কাটিতে পারিত। উহার কাটাইয়ের

দ্রুতি প্রতি ঘণ্টায় ৪০-৫০ গজের বেশী হইত না। সুতার দর লাগানো হইত ৮৲ তোলা। অর্থাৎ পুরা সময় কাজ করিলে উহার আয় সারা মাসে ৪৲ টাকা বা সারা বৎসরে ৪৮৲ টাকা হইত। সাধারণতঃ এই আয় ছিল ২০৲ হইতে ৪০৲ টাকা পর্যন্ত।

মলমলের জন্য যে কাপাস ব্যবহৃত হইত, উহা বাংলার অন্যান্য কাপাস অপেক্ষা অধিক মোলায়েম এবং লম্বা আঁশ যুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমান আমেরিকান বা সাগর দ্বীপের তুলনায় উহার আঁশ ছিল ছোট। জলে ধুইলে এই আঁশ ফুলিয়া যাইত এবং ইহা দ্বারাই ঢাকার তাঁতীরা উহার পরীক্ষা করিত। যে সমস্ত গাছ হইতে ঢাকার কাটুনীরা কাপাস পাইত, তাহাদের ভালো রকমে পরীক্ষা করার পরে একজন বিশেষজ্ঞ সে সম্পর্কে নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখিয়াছেন।

(১) গাছের ডালগুলি উপরের দিকে বেশী উঠানো এবং পাতার শীষ সমূহ অধিক তীক্ষ্ণ।

(২) সমস্ত গাছময় লাল রং-এর আভা দেখা যায়। (এই ছটার দরুণ) পাতার ডাঁট ও শিরাগুলিও মেটে রং-এর দেখায়।

(৩) ফুলের বোঁটা বেশী লম্বা এবং পাপড়ির উপরের প্রান্ত হাল্কা লাল রং-এর হয়।

(৪) বাংলার অন্যান্য কাপাসের তুলনায় এই কাপাসের আঁশ বেশী লম্বা, বেশী মিহি ও বেশী মোলায়েম হইয়া থাকে।

এই কাপাস চির সবুজ ও পাঁচ ফুট উঁচু হয়।

দেশী ও বিলাতী মলমলের পরীক্ষা ঃ—

মলমল	বেধ (ইঞ্চিতে)	প্রতি ইঞ্চিতে পাক
ফ্রেঞ্চ মসলিন (বিশ্ব প্রদর্শনী—১৮৬২)	'০০১৯	৬৮'৮
ইংরেজী মসলিন (নং ৪৪০)—১৮৫১	'০০১৮	৫৬ ৬
ঢাকাই মসলিন ভারতীয় যাদুঘর	'০০১৩৩৭৫	১২০'১
ঢাকাই মসলিন বিশ্ব প্রদর্শনী—১৮৬২	'০০১৫৬২৫	৮০ ৭

ইহাতে লক্ষ্য করিবার বিষয়—পাকের পার্থক্য। মেশিনে তৈরী কাপড় অপেক্ষা হাতে তৈরী কাপড় যে বেশী টেকসই, ইহাতেই উহা পরিষ্কার বুঝা যায়। বেধেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। অর্থাৎ ঢাকার সুতায় আঁশ খুব কম।

সাজ-সরঞ্জাম :—

(১) কাপাস (২) মাছের চোয়ালের হাড় (৩) শলাই-পাটা, (৪) ধনুক-ধুনকী (৫) পাটা (৬) শলাই (৭) তকলি (৮) নাটাই (৯) ছাই (১০) দফ্তি (কার্ডবোর্ড) ইত্যাদি।

কাপাস পরীক্ষা ও পরিষ্করণ :—

মিহি সুতা কাটাই ব্যাপারে ও কাপাস হইতেই শুরু করিতে হয়। তুলা লইলে কাজ চলিবে না। ভিত যখন মজবুত হয়, তখনই উপরের গৃহও ভালো করিয়া তৈরী হইতে পারে।

নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাপাস হইলে চলিবে না। খরখরে আঁশের কাপাস অকেজো। ছোট আঁশও কাজ দিতে পারে, কিন্তু উহা খুব মোলায়েম, মজবুত এবং কাপাসের অন্যান্য আবশ্যক গুণযুক্ত হওয়া দরকার। আগের এক অধ্যায়ে এই সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করা হইয়াছে, কাজেই এখানে আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নাই। কোন্ জাতের কাপাস মিহি সুতা কাটার কাজে লাগে, তাহাও বলা হইয়াছে। উহাদের মধ্য হইতে একটি কাপাস বাছিয়া লওয়া উচিত।

প্রথমে কাপাসকে কিছুক্ষণ, ২৫-৩০ মিনিট, রৌদ্রে রাখা উচিত এবং আগাছা, আবর্জনা ও খারাপ ঢেঁড়ি বাছিয়া সাফ করিয়া লইতে হয়। ইহার পরে আঁচড়ানো বা কোরানো ও চাক তৈরি করার কাজ করিতে হয়।

কোরানো বা চাক তৈরির কারণ :—

চাক বানাইলে বীজের গায়ে উলটানো আঁশ আলগা আলগা খোলা ও সোজা হইয়া যায়। উহাদের মধ্য হইতে আবর্জনা ও কাঁচা বা মোটা আঁশ পৃথক হইয়া যায় এবং ভালো বাছাই আঁশ থাকিয়া যায়। কোরানোর পরে আঁশগুলি দেখিতে সুশ্রী এবং ছুঁইতে রেশমের মতন মোলায়েম লাগে।

চাক বানানো ঃ—

এই কাজের জন্য কাপাসের ঢেঁড়ির এক একটি বুটি (টুকরা) পৃথক পৃথক করিয়া তুলিতে হয়। বীজের চারিদিকে আঁশ ছাড়াইলে অর্থাৎ চাক বানাইলে উহা সূর্যের ছবির মতন দেখায়।

মাছের চোয়ালের হাড় ঃ—

নাদেঁড়ের নিপুণ কাটুনীরা আঙুল দিয়া চাক তৈরি করে। অন্ধ্রের কাটুনীরা এই কাজের জন্য মাছের চোয়াল ব্যবহার করে। এই মাছ উড়িষ্যায় "বালিয়া" নামে এবং বাংলায় "বোয়াল" নামে পরিচিত। আগে যাহাকে বোয়াল (Solurus Boalis) বলা হইয়াছে, তাহা এই মাছই হইবে। কোরানোর কাজে-লাগে মাছের চেয়াল একটা ছোট ধনুকের মত। ইহার প্রস্থ প্রায় তিন ইঞ্চি। চোয়ালের ভিতর দিকে মোড়ানো ও পরস্পর গায়ে গায়ে লাগানো সরু সরু দাঁত আছে। এক একটি চোয়ালের দাম চার আনা হইতে এক টাকা পর্যন্ত। এই মাছের চোয়াল অন্ধ্র চরকা সঙ্ঘ, চিকাকোল, জেলা গঞ্জাম, B. N. R-এই ঠিকানায় মিলিতে পারে।

চোয়াল দিয়া চাক বানানোর প্রণালী ঃ—

চাক বানানোর জন্য কাপাসের একটি বুটি লউন। উহা বাম হাতের বুড়া আঙুল ও তর্জনীর চিমটিতে একটু আলগা ভাবে ধরুন এবং ডান হাতের এই দুইটি আঙ্গুলেরই চিমটিতে মাছের হাড় ধরিয়া উহা দিয়া বাম হাতে ধরা কাপাসের বুটির আঁস কোরাইতে থাকুন। হাড়টির কেবল সামনের দেড় ইঞ্চি জায়গাই কোরানোর কাজে লাগে এবং উহার মধ্যে ও মাত্র একটি প্রান্তই কাজের হয়। কোরানোর সময় হাতের পিঠ ভূমির দিকে এবং আঙ্গুলগুলি ভিতরের দিকে মুড়িয়া রাখিতে হয়। কোরানোর সময় কাপাসের বুটিটি ঘুরাইতে হয়, ফলে উহা আঁশ মেলিতে মেলিতে চলিতে থাকে। হাড়টি এই ভাবে ধরিতে হয় যেন উহার দাঁত ডান দিকে মুড়িয়া থাকে। যে সমস্ত আঁশ বাহির হইয়া দাঁতের উপর জমা হইতে থাকে। তাহা মাঝে মাঝে আলগা করিয়া দাঁতগুলি সাফ করিয়া লওয়া উচিত। মোট আঁশের মধ্য হইতে প্রায় অর্ধেক আঁশ,—কোন কোন জাতে তার চাইতেও বেশী আঁশ—বুটি হইতে আলগা বাহির হইয়া আসে। এই সমস্ত আঁশ ফেলিয়া দিলে যথেষ্ট লোকসান

হইবে, কাজেই সেগুলি পৃথক রাখিয়া দিতে হয় এবং মোটা সুতা কাটার কাজে লাগাইতে হয়।

হাত-চাক ও দাঁত-চাক ঃ—

নাদেঁড়ের কাটুনীরা কেবল আঙুল দিয়াই চাক তৈরি করে, মাছের চোয়াল দিয়া কোরায় না। হাতে চাক-তৈরি দাঁত-চাকের মতো তাড়াতাড়ি ও সুন্দর হয় না, কিন্তু হাতেও সাধারণ রকমের ভালো চাক তৈরি করা চলে। হাতে চাক তৈরি করিতে খুব নিপুণতার সহিত কাজ করিতে হয় আর তাহাতে খুব সাবধানতারও প্রয়োজন। অন্ধ্রের কাটুনীরা ১২০ নম্বর পর্যন্ত সুতা কাটে, নাদেঁড়ের কাটুনীরা বেশী হইলে ৮০ নম্বরের সুতা কাটে। ৬০ হইতে উচু নম্বরের সুতার জন্য মাছের চেয়াল দিয়া কাপাস কোরানো দরকার। হাত-চাক বানানোর জন্য সতন্ত্র যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না।

নাদেঁড়ের কাটুনী মাছের হাড় চাক বানানোর কাজে লাগায় না। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, প্রথম কথা, উহারা বৈষ্ণব পন্থী, দ্বিতীয়তঃ, নাদেঁড় শহর সমুদ্রতীর হইতে বহু দূরে অবস্থিত।

তুলা পেঁজার চাক ঃ—

নাদেঁড়ে চাক তৈরির দুইটি পদ্ধতি আছে। এক, পেঁজার চাক ; দ্বিতীয়, হাতের চাক। কাপাসের দুই একটি ঢেঁড়ি লইয়া উহা পিঁজিতে পিঁজিতে অর্থাৎ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া কোরাইতে কোরাইতে যে চাক বানানো হয়, তাহাকে পেঁজার চাক বলা হয়। পেঁজার জন্য প্রথমে উভয় হাতের তর্জনী, মধ্যমা ও বুড়া আঙ্গুলের চিমটি দিয়া কাপাস চাপিয়া ধরিতে হয়। বুড়া আঙ্গুলের শেষ পর্ব উভয় আঙ্গুলের ডগায় আড়াআড়ি ঠেকানো হয় এবং অন্যান্য আঙ্গুল গুলির প্রথম পর্বের পিঠ পরস্পরের গায়ে সাঁটিয়া লাগিয়া থাকে। পরে মধ্যমা ও অনামিকার উপরের ভাঁজ পরস্পরের সহিত ঠেকাইয়া সাঁটানো আঙ্গুলগুলি আলগা করিতে হয়। অর্থাৎ বাম হাতের আঙ্গুলগুলিকে বাম দিকে এবং ডান হাতের আঙ্গুলগুলি ডানদিকে টানিতে হয়। পিঁজিয়া আল্‌গা করা ডান হাতের কাপাস বুটি আবার বাম হাতের কাপাসের উপর রাখিয়া গোল গোল করিয়া ঘুরাইতে হয়। যতক্ষণ না সমস্ত আঁশ মেলিয়া খুলিয়া যায়, ততক্ষণ এই ঘুরানো প্রক্রিয়াটি বার বার চালানো উচিত। এই প্রণালীতে চাকটি হাত-চাকের মত

তত ভাল হয় না, কিন্তু উহার প্রস্তুতিতে সময় কম লাগে। লম্বা ও মোলায়েম আঁশগুলি কাজে আসে।

হাত-চাক ঃ—

কাপাসের ঢেঁড়ির একটি বুটি লইয়া দাঁত চাকের মত, অথচ চোয়াল ব্যবহার না করিয়াই, বুড়া আঙ্গুল ও তর্জনীর সাহায্যে উহার আঁশ বীজের চারিদিকে টানিয়া মেলিতে হয়। চাক তৈরি হইলে পর উহার বীজ ছাড়ানো উচিত।

বীজ ছাড়ানো—শলাই-পাটা।

চাকগুলির বীজ হাত-কেরকিতে ছাড়ানো হয় না। ইহার জন্য একটি অতি সাধারণ যন্ত্র কাজে লাগানো হয়,—উহাকে শলাই-পাটা বলে। শিশু, বাবলা, খয়ের ইত্যাদি গাছের কাঠের মজবুত পাটা এবং এক ফুট লম্বা একটি বেল মিলিয়া শলাই-পাটা তৈরি হয়। বেলনটির ব্যাস উভয় প্রান্তে এক-দেড় ইঞ্চি এবং মাঝখানে ৩-৪ ইঞ্চি থাকে। অর্থাৎ ইহার উভয় দিক ক্রম-সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। বেলনটি লোহায় তৈরী। উল্লিখিত মাপ অন্ধ্রের শলাই-পাটার। উহা হইতে অল্প বিস্তর পার্থক্য ও অন্যত্র থাকিতে পারে। পাটার মাপ ৬×৬×২ ইঞ্চি এবং শলাইটি ৩-৪ সুত মোটা ও এক ফুট লম্বা রাখা যাইতে পারে। পাটার আঁশ বা দানা (Grains) আড়াআড়ি থাকা প্রয়োজন। বীজ ছাড়ানোর সময় পাটাটি যাহাতে না পড়ে, সে জন্য উহার দৈর্ঘ্য এবং ওজন বেশী রাখা দরকার। এইরূপ শলাই ঘুরানোর নময় আঙ্গুল যেন মাটিতে ঘষা না যায়, সে জন্য পাটার উচ্চতা বা বেধ ও যথেষ্ট রাখা উচিত। কোথাও কোথাও পাটার মাঝখানটা কিছু গভীর থাকে। হয়তো প্রথমে উহা গভীর থাকে না, পরে বেলনের চাপে ঘসিয়া মধ্যস্থলে গভীর হইয়া যায়। শলাই বা বেলনের মধ্যভাগটি যে মোটা রাখা হয়, ইহার কারণ তিনটি। প্রথমত, মধ্যে যেন যথেষ্ট চাপ দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, কাঠ চাপ খাইলে ও পাটা এবং শলাইয়ের মধ্যে যেন ফাঁক থাকিতে না পায় ; তৃতীয়ত, শলাইয়ের উভয় প্রান্ত চাপা থাকায় উহা মধ্যে বাঁকিতে পারে না। বীজ ছাড়ানোর বড় কেরকির মধ্যকার লোহার ছোড়টিও এই ভাবেই খানিকখা মোটা রাখা হয়। অন্ধ্রের মতো নাদেঁড়ে ও শলাই পাটাই বীজ ছাড়ানোর কাজে লাগানো হয়।

পার্থক্য মাত্র এইটুকু যে , লোহার বেলনের পরিবর্তে নাদেঁড়ে কাটুনীরা কাঠের বেলন ব্যবহার করে।

শলাই-পাটায় বীজ ছড়ানো ঃ—

প্রথমে আপনার সামনে পাটাটি বসান। পাটার মসৃন উপর পিঠ উপরের দিকে রাখিতে হয়। পাটাটির উপর নীচের দিকে পাঁচ ছয়টি চাক বিছাইয়া দিন এবং শলাইটি হাতে লইয়া চাকগুলির পিছনে রাখুন। কাপাসের ঢেঁড়ির বীজ ছড়াইতে হইলে উহা আড়াআড়ি ভাবে রাখুন এবং বীজগুলির দুই কাতারের ঠিক মাঝখানে শলাইটি রাখুন। পরে হাতের তালুর সাহায্যে শলাইটির উভয় মাথায় চাপ দিয়া উহাকে ধাক্কা দিতে দিতে সামনের দিকে সরাইতে থাকুন। এই ভাবে বীজ আগের দিকে ও তুলা পিছনের দিকে বাহির হইয়া যায়। মেশিনে বীজ ছাড়াইলে আঁশের ক্ষতি হয়, উহাতে ঘা হইয়া যায় এবং উহা ফাটিতে ফুটিতে থাকে। কিন্তু শলাই-পাটায় আঁশের একটুও ক্ষতি হয় না, উহাদের স্বাভাবিক দৃঢ়তা ও ঔজ্জ্বল্য ঠিক মতই থাকিয়া যায়। শলাই-পাটার ইহাই বিশেষত্ব।

বীজ ছাড়ানোর দ্রুতি ঃ—

শলাই-পাটা দিয়া প্রতি ঘণ্টায় ২০ তোলা কাপাস ছাড়ানো যাইতে পারে। ইহা হইতে বেশী ছাড়ানোর প্রয়োজনও হয় না ; কারণ, ওস্তাদ কাটুনীও এক দিনে দুই তোলায় বেশী মিহি সুতা কদাচিৎই কাটিতে পারে। ঢাকার কাটুনী এক মাসে মাত্র আধ তোলা সুতা কাটিত, কারণ উহাদের সুতা খুবই উচ্চ শ্রেণীর হইত। সাধারণ ভাবে মিহি সুতা কাটার জন্য উল্লিখিত বীজ ছাড়ানোর দ্রুতি অপেক্ষা বেশী কাপাস ছাড়ানো যাইতে পারে। নিজের জন্য কাপড় বুনাইবার পক্ষে এই সামান্য যন্ত্রটি প্রত্যেক পরিবারের জন্য খুব কার্যকর।

শলাই-পাটার সুবিধা ঃ—

মিহি সুতা কাটাইয়ের জন্য শলাইয়ের জন্য শলাই-পাটার কেরকি ব্যবহারের কারণ এই যে, উহাতে আঁশের একটুও লোকসান হয় না এবং হাত কেরকির মত উহাতে আঁশ গোলাকার হয় না, বরং সিধা হইয়াই বাহির হয়। প্রত্যেক দিন তাজা কাপাস অল্প অল্প করিয়া ছাড়ানোর ইহাই উপযুক্ত যন্ত্র। হাত কেরকি অধিক পরিমাণে কাজ করিবার জিনিষ। গৃহের জন্য উহার আবশ্যকতা নাই।

তুলা সাফ করা ঃ—

বীজ ছাড়ানোর পরে তুলা সাফ করিয়া লইতে হয়। কিন্তু এই তুলা সাফ করার প্রয়োজন পড়ে না। যদিই বা ভাঙা বা চাপ-খাওয়া বীজ অথবা উহার ভাঙা খোসা কিংবা এই ধরনের কিছু আবর্জনা থাকে, তবে তাহা আলগা বাছিয়া ফেলিতে হয়। অন্ধ্রদেশে ছাড়ানো তুলাকে ঘন-বুনট টুকরিতে রাখিয়া বাঁশের দুইটি বাতা বা তাল পাতার ডাঁট দিয়া পিটাইতে হয়। এই ভাবে খুব পিটানোর পরে ধূলা, আবর্জনা ইত্যাদি যাহা কিছু বাকি থাকে, নীচে ঝরিয়া পড়ে।

ফাড়াই ঃ—

সাধারণ মিহি সুতার জন্য হাত কেরকিতে ছাড়ানো তুলাই চলিতে পারে। কিন্তু কাপাস ভালো জাতের হওয়া দরকার এবং রোজ উহা হইতে টাট্‌কা বীজ ছাড়াইয়া লওয়া উচিত। উহার চাক বানানোরও আবার প্রয়োজন নাই। এই ভাবে তুলা হইতে কাজ শুরু করিতে হইলে পেঁজার আগে তুলার ফাড়িয়া লওয়ার প্রয়োজন হইয়া থাকে। এক, দেড় আনা ওজনের তুলা বাম হাতের তর্জনী, মধ্যমা ও বুড়া আঙুলের কিছু ঢিলা চিমটির মধ্যে ধরিয়া ডান হাতের সেই আঙুলগুলির চিমটি দিয়া আঁশগুলিকে দুই এক সুত টানিতে টানিতে তুলার লম্বা পট্টি বানানো হয়। ইহাকে তুলা ফাড়াই বলা হয়। ইহাতে তুলা ছিঁড়িবার প্রাক্রিয়া করা হয় না। কেবল তুলার আঁশগুলি আঙুল দিয়া টানিয়া খোলা হয় এবং লম্বা করা হয়। তুলা ফাড়াই করিয়া লইলে পেঁজার কাজ সহজ হইয়া যায় এবং সময়ও কম লাগে। তুলা ফাড়াই করিয়া পেঁজার দ্রুতি প্রতি ঘণ্টায় দুই তোলা।

পেঁজা অর্থাৎ আঁশ সমান্তরাল করা ঃ—

ইহার পরে তুলার আঁশগুলি সমান্তরাল করা হয়, উহাকে পেঁজা বলে। ইহার মধ্যে দুইটি ব্যাপার - এক, ছাড়ানো ; দুই-কোরানো। চাক বানানোর সময় এই দুইটি প্রক্রিয়াই করিতে হয় কিন্তু, সেখানে চালাইতে হয় কাপাসের উপর আর এখানে তুলার উপর। চাক বানানোর সময় কাপাসের এক একটি বুটি কোরাইয়া পৃথক করিতে হয়, কিন্তু পেঁজায় আঁশগুলির একটি

প্রবাহ তৈরী করা হয়। প্রবাহে আঁশগুলি একই দিকে একসমান ভাবে বিছানো হয়। অর্থাৎ আঁশগুলি সমান্তরাল করা হয়।

কি ভাবে পিঁজিতে হয় ?—

প্রথমে বাম হাতে খানিকটা তুলা লউন এবং ১।১॥০ ইঞ্চি চওড়া ও ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা একটি পট্টি তৈরি করুন। তুলা ফাড়াইয়ের সময় যে ভাবে আঙুলগুলি রাখা হয়, সে ভাবেই পেঁজার সময়ও সেগুলি রাখিতে হয়। আঁশগুলির প্রবাহ বা পট্টি বানানোর সময় আঁশগুলি সামনে সরাইতে হয়। এই কাজটি ডান হাতের বুড়া আঙুলটি অন্যান্য আঙুল গুলির সাহায্য করিতে থাকে। এই সময় বাম হাতের চিমটি শক্ত রাখিতে হয়। উহাতে টানা আঁশগুলি সমান্তরাল ভাবে সজ্জিত হইতে থাকা উচিত। চিমটি ঢিলা রাখিলে আঁশ গুলি সমান্তরাল ভাবে সোজা হইবে না। তেড়া বাঁকা আঁশগুলি চিমটির পিছনে জড়ো হইতে থাকে। চিমটি ঢিলা রাখিলে তেড়া বাঁকা আঁশগুলি যেমনটি ঠিক তেমনই বাহির হইয়া আসিবে। মধ্যে মধ্যে আঁশের প্রবাহ ছিন্ন করিয়া আঁশগুলি ঠিক ঠাক করিয়া লইতে হয়। প্রবাহ ছিন্ন করার সময় বা আঁশ কোরানোর বা টানার সময় উহা সম্পূর্ণ টান করিয়া রাখা দরকার। বাম হাতের শক্ত চিমটির মধ্য হইতে আঁশগুলি টান খাইয়া সিধা ও সমান্তরাল হইয়া যায়। টানার সময় বুড়া আঙুল ও অন্যান্য আঙুলগুলির চিমটির চাপে আঁশের উপর এক রকমের ঔজ্জ্বল্য ও রেশমের মতন কোমলতা আসে।

এই ভাবে পিঁজিয়া তৈরি করা আঁশের পট্টি বাম হাতের বুড়া আঙুল ও তর্জনীর মধ্যে আধা ভিতরে ও আধা পিটের উপরে জড়ো করিতে হয়। হাতে তুলিয়া লওয়া তুলার এই ধরনের পট্টি তৈরী হওয়ার পরে উহাদের প্রবাহ না নষ্ট হইতেই উহাদের একত্র করিয়া আবার ছাড়াইতে হয় এবং পিঁজিয়া পট্টি তৈরি করিয়া প্রথমকার মত বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর মধ্যে জমা করিতে হয়। অতঃপর এই প্রক্রিয়া করিতে করিতেই সব পট্টি দিয়া একটি মোটা ও লম্বা পট্টি তৈরি করিতে হয়। তিন চার বার পেঁজা হইয়া যাওয়ায় আঁশগুলি সম্পূর্ণ সিধা সমান্তরাল হইয়া খোলা মোলায়েম, সাফ সুন্দর হইয়া যায়। ধুননের আগে তুলার উপর এই সমস্ত কাজ করিয়া লইতে হয়। ইহাতে মিহি সুতা কাটার জন্য আঁশের মধ্যে যে ব্যাপার প্রয়োজন, তাহা যথেষ্ট বাড়িয়া যায়। নিজে

না দেখিলে কেবল বর্ণনার সাহায্যে পেঁজার কাজ বুঝা মুশকিল। ইহার পরে ধুনাই করা খুব সহজ হইয়া পড়ে।

বাতি :—

পেঁজার সময় প্রায়ই আঁশের বাতি তৈরী হইয়া যায় অর্থাৎ আঁশগুলি মিলিয়া একটি ডোরার মত হইয়া যায়। এই সমস্ত বাতি এবং এই ধরণের আঁশের ডেলা বা গুটলি ইত্যাদি বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। আঁশ খারাপ হইলে, বা আঙুল গুলির আর্দ্রতার দরুণ অথবা পেঁজানো ঠিক মতন না হইলেই এই সমস্ত বাতি তৈরী হয়।

ছাই লাগানো :—

তুলা ফাড়াইয়ের সময় ও পেঁজার সময় আঙুল দিয়া মাঝে মাঝে ছাই লাগাইতে হয়। ছাই লাগাইলে আঙুলগুলির আর্দ্রতা বা মসৃণতা দূর হইয়া আঙুলের চামড়া এবং তুলা উভয়ই খানিক খরখরে হইয়া যায়, ফলে তাড়াতাড়ি পেঁজা চলিতে পারে। ছাই ব্যবহার করিলে পেঁজার সময় আঁশের বাতি তৈরী হয় না এবং কাজও চমৎকার হইতে থাকে।

ধনুক দিয়া ধুনন :—

এই ধুনাইর পদ্ধতি খুব সরজ। ইহার যন্ত্রও অতি সাধারণ। একগজ লম্বা বাঁশের ধনুকে কাজ চলিয়া যায়। ধনুক বানানোর জন্য কুলের বা বাঁশের ৪।৪½ ফুট লম্বা নমনীয় ও মজবুত পাতলা ছড়ি কাজে লাগানো হয়। ইহাতে তাঁত জুড়িয়া সাজানো হয়। ছড়িটির উভয় মাথায় খাঁজ কাটিয়া উহাতে তাঁতের ফাঁদ আটকাইয়া দেওয়া হয়। তাঁত বদলানোর প্রয়োজন না থাকায় উহা ধনুকে জড়াইয়া রাখা হয় না। তাঁত তিনতারী হওয়া উচিত। মোটা যেন না হয়। হাত-ধুনকী দিয়াও ধনুকের কাজ চালানো যাইতে পারে। ধুনাইয়ের জন্য মিহি সুতা কাটুনী ধনুকই কাজে লাগায়। কারণ, বেশী তুলা ধুনার প্রয়োজনই তাহার হয় না। ধনুকের আরো কয়েকটি গুণ আছে। উহা হালকা এবং উহা সাজাইতে "কাঁকর" ইত্যাদির আবশ্যকতা নাই। উহাতে তাঁতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থরথরানি থাকে। দাম তো কেবল এক দেড়গজ তাঁতের যাহা তাহাই, আর ছড়িটার বা দাম কত হইবে? ধনুক সাদাসিধা

ছোট-খাটো ও কোমল। কাজেই শলাই পাটার মত উহা ও গৃহস্থালিরই সামিল হইতে পারে। হাত-কেরাকিও হাত-ধুনকি চরকারই আত্মীয়। ধনুকের জন্য গোটিলারও প্রয়োজন নাই, আঙুলগুলি দিয়াই তাঁত ছট্‌কানো যায়।

ধুননের পাটা ঃ—

এই ধুনাইর জন্য চাটাইয়ের বদলে ২ ফুট × ২ফুট×৬ ইঞ্চি মাপের পাটা কাজে লাগানো হয়। কচ্‌রা (আবর্জনা) বা ছোট ছোট আঁশ ছাঁকিবার প্রয়োজন না থাকায় চাটাইয়ের প্রয়োজন পড়ে না। পাটাটি ভূমি হইতে খানিক উঁচা থাকিলে ধুনাইতে সুবিধা হয়। ইহাতে ঝুঁকিতে হয় না এবং ডান হাত ভূমির সঙ্গে ঘষা খাইতে পারে না।

ধনুক দিয়া ধুনাই ঃ—

পেঁজা তুলার পট্টি পাটার উপর সমান্তরাল ভাবে বিছাইয়া দিন। এই ভাবে রাখিলে অল্প অল্প তুলা ধুনিয়া সহজে আল্‌গা করা যাইতে পারে। ধনুকটি বাম হাতের মুঠোতে ধরুন। ধনুকটি মাঝখানে ধরিলেই ঠিক হইবে। প্রথলে সামনের তুলা ছটকান্। আকন্দের ফল পাকিয়া গেলে পর উহা ফাটিলেই ভিতরের গুটি আঁশ মেলিয়া উড়িতে থাকে, এই ভাবে পেঁজা তুলার আঁশ তাঁত ছটকানোর সাথে সাথেই ফুলিয়া যায়; অর্থাৎ এক-একটি আঁশ আলগা হইয়া সাদা মেঘের মত হইয়া যায়। বুড়া আঙ্গুল ও তর্জনীর চিমটি দিয়া তাঁত ছট্‌কানো উচিত এবং তুলার যে অংশ ধুনা হইতে থাকে। সে দিকেই ধুনরীর নজর থাকা উচিত। ধুননের সময় ধুনুকটি যাহাতে এদিক ওদিক না সরে, সেই উদ্দেশ্যে উহার এক মাথার পিঠটি পায়ের কাছে ভিড়াইয়া রাখা উচিত। এই ভাবে ধনুক ধরিলে ধনুকের ডাঁট ও তাঁত এক স্তরে থাকে না, উহাদের স্তরে খানিক পার্থক্য থাকে। তাঁতটি নীচে থাকে আর ডাঁটটি উপরে। একবার তুলা ধুননের পরে উহা ধীরে ধীরে উলটাইয়া দ্বিতীয়বার ধুনিয়া লউন। তুলা সবদিকে একসমানে ধুনাই হইতেছে কি না, তাহা সর্বদা নজর রাখা উচিত। এই ভাবে ভালো ধুনানো তুলার এক একটি আঁশ খুলিয়া যায় এবং উহা সাফ পাতলা এবং অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। উহাতে গাঁট, ফুটকি, বাতি বা কচ্‌রা ইত্যাদি কিছু থাকে না।

মিহি সুতার জন্য ভারী পাঁজ কি ভাবে বানায় ?

ধুননের পরে পাঁজ বানাইতে হয়। অন্ধ্রের কাটুনীরা আট আনা বা এক তোলা ওজনের পাঁজ বানায়। তাহারা ধুনানোর তুলার মধ্য হইতে প্রথমে এই পরিমাণ ওজনেরই ফাঁপ বা গালা অর্থাৎ পাতলা স্তর তুলিয়া লয় এবং উহার ১ ফুট×৬ ইঞ্চি অথবা ১ ফুট × ৮ ইঞ্চি মাপের স্তর তৈরি করিয়া পাটার উপর বিছাইয়া দেয়। ফাঁপের তিন চারটি পরত একটির উপর একটি বিছাইয়া প্রয়োজন অনুযায়ী মোটা স্তর বানাইয়া লয়।

পরত বিছানোর কাজ খুবই নরম হাতে করা হয়। আঁশগুলি এদিক-ওদিক যেন না থাকে। একত্র জড়ো হইয়া যেন না থাকে এবং উহাদের চাপ খাইয়া বা মুড়িয়া থাকাও উচিত্ নয়। স্তর বিছানোর পরে একটি সওয়া ফুট লম্বা, একটু মোটা ও গোল এবং মসৃণ কাঠের শলা সেই চৌকা ফাঁপের উপর দিকের কিনারায় রাখিয়া দুই হাতের তালু দিয়া বেলিতে বেলিতে নিজের দিকে নিয়া আসে। এই ভাবে সম্পূর্ণ ফাঁপটি শলাইয়ের উপরে জড়াইয়া গেলে উহা ডান হাতের তালু দিয়া চাপিয়া বাম হাত দিয়া শলাটি টানিয়া লয়। এই ভারী পাঁজ বাটা হয় না। বাটিলে পাঁজ কড়া হইয়া যায়। কড়া পাঁজে মিহি সুতা কাটা একটু মুশকিল হয়। এই পাঁজ ৮×২×১ ইঞ্চি বা ১২ × ২×১ ইঞ্চি মাপে তৈরী এবং উহার ঘের হয় ৫ ইঞ্চি। নাদেঁড়ের কাটুনীরা এই রকমের মোটা পাঁজ তৈরি করে।

ছোট ও মোটা পাঁজ ঃ—

আট আনা বা এক টাকা ওজনের পাঁজ বানাইতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। তবুও এক দিনের জন্য আবশ্যক কাপাস নিয়া উহা সাফ করা বীজ ছড়ানো পেঁজা এবং ধুনিয়া উহা দিয়া একটাই পাঁজ তৈরি করিয়া সারা দিনের মধ্যে তাহার সুতা কাটিয়া ফেলা ইহাই ওথানকার নিপুণ কাটুনীদের দৈনন্দিন কাজ। উহারা বাসী পাঁজ কাজে লাগায় না। যতটা ক্ষুধা, ততটাই রান্না, এবং যতখানি রান্না, ততখানিই খাওয়া—বাঁচানোর নাম নাই; এই রকম রোজ রোজ টাটকা খানা কে পছন্দ না করিবে? অন্ধ্র ও নাদেঁড়ের কাটুনীরা এই কাজই করে। উহারা চরকায় সুতা কাটে, কাজেই উহাদের এত বড় পাঁজ চলিতে পারে। তকলিতে কাটার জন্য কিন্তু এত বড় পাঁজের দরকার নাই। তকলির পক্ষে তো দুই চার আনা ওজনের পাঁজই ঠিক

হইবে। ছোট থাকার জন্য উহা শীঘ্র কাটিয়া শেষ করিতে পারা যাইবে। কাটার সময় ঘামে যেন পাঁজ খারাপ না হয় আর হাওয়ায় যেন ফুলিয়া না যায়। সে জন্য অন্ধ্রের কাটুনীরা কলাগাছের শুকনা বাসনায় বা কাগজ ইত্যাদিতে জড়াইয়া পাঁজটি ধরে। তকলিতে কাটার সময়ও আবশ্যক মত এই ঢাকনা কাজে লাগানো যাইতে পারে।

সুতা কাটা—মিহি সুতার জন্য কিরূপ তকলি দরকার ?

মিহি সুতা কাটার জন্য প্রচলিত তকলি খানিক দূর পর্যন্ত কাজ দিতে পারে ; উহা কিন্তু ঠেকাইয়া কাটাই প্রয়োজন হইবে। তকলির ভার মিহি সুতায় বরদাস্ত করিতে পারে না এবং সামান্য ঝটকায় উহা ছিঁড়িয়াও যায়। ঢাকায় যে তক্‌লি দিয়া মিহি সুতা কাটা হইত, উহার ওজন কত হইত, সে সম্বন্ধে কোথাও কোন লিখিত কিছু পাওয়া যায় না। তবুও উহার যে বর্ণনা পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, বর্তমানে যে তকলি কাজে লাগাই, ঢাকার তকলির ওজন তাহা হইতে বেশী হইত না। ঢাকার তকলিতে নাক ছিল না (নাক থাকার কথা কোথাও লেখা আছে বলিয়া জানা যায় না।) এই জন্য ধাগার উপর উহার ভার পড়িত না। কারণ ; নাকের সাহায্যেই তো তকলিটি ধাগার উপর ঝুলিয়া থাকিতে পারে। উচু নম্বরের মিহি সুতা কাটার জন্য নাক-হীন তকলিই ভালো। নাক না থাকায় তকলিটি ঠেকাইয়া কাটিতে হইবে। কাজেই ধাগার উপর ভার পড়ার প্রশ্নই থাকে না। ইহা ছাড়া নাকহীন তকলির আর একটি সুবিধা এই যে, উহার ডগা (নাক) চরকার টাকুর আগার মত ক্রম সূক্ষ্ম ও সরু থাকায় উহাতে মিহি সুতা কাটা খুব সহজ হয়। টাকুর আগা যদি অনেক খানি দৈর্ঘ্য পর্যন্ত ক্রম সূক্ষ্ম ও সরু না হয়, তবে সুতা মোটা বাহির হইতে থাকে এবং কাটার সময় টাকু হইতে পিছলাইয়া বাহির হইয়া আসিতে থাকে। নাক-ওয়ালা তকলির ডাঁট ক্রম সূক্ষ্ম থাকে না এবং উহাতে নোকও থাকে না, কাজেই এই তকলি নাক-হীন তকলির মতো মিহি সুতা কাটার কাজে লাগিতে পারে না। আরম্ভে বেশী হইলে ৫০ নম্বর পর্যন্ত সুতা কাটার জন্য নাক-ওয়ালা তকলি দিয়া কাজ চলিতে পারে, কিন্তু ইহার পরে উহাতে কাজ আদায় করা যায় না। ইহার অর্থ এই যে, যেমন যেমন নম্বর বাড়িতে থাকিবে, ততই উহা অকেজো হইয়া পড়িবে। নাক-ওয়ালা তকলিই যদি ব্যবহার করিতে হয়, তবে উহা হালকা ও

সরু হওয়া উচিত। আমাদের প্রচলিত ধাতুর তকলির ওজন বারআনা পরিমাণ ওজনের চাইতে কম করা যাইতে পারে না, কারণ খুব পাতলা চাকতি কুঁদানো মুশকিল। তবুও চাকতির ব্যাস কমাইয়া উহার বেধ বাড়োনো যাইতে পারে। পিতলের বদলে অন্য হালকা ধাতু ব্যবহার করিয়া ও চাকতির ওজন কমানো যাইতে পারে।

যন্ত্র সম্পর্কিত আপন প্রয়োজন নিজেই পূরণ করা ঃ—

কিন্তু খাপরা, শ্লেট বা নরম পাথরের চাকতি যুক্ত ও বাঁশের ডাঁট যুক্ত তকলিই সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাধিক সহজ। অতি সাধারণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যেকেই ইহা ঘরেই তৈরি করিতে পারে; কাজেই ইহা পূরা মাত্রায় স্বদেশী। এ সম্পর্কে আপন প্রয়োজন আপনি পূর্ণ করিয়া লওয়া খুব দরকার। কারখানাওয়ালা যখন দরকার তখনই তকলি বানাইয়া দিবে—একথা বলা যাইতে পারে না। কারণ, উহাদের লাগাম বিদেশী ব্যাপারীদের হাতে। ডাঁট বানাইবার জন্য যখন জার্মানী হইতে ইস্পাতের শলাকা আসিবে আর চাকতির জন্য বিলাত হইতে আসিবে পিতলের দণ্ড, তখন কারখানা-ওয়ালারা বিদেশী খরাদে (কুঁদে) যে কোন জায়গায় এই তকলি বানাইবে। জনগণের মধ্যে তকলি প্রচার আজ তো মাত্র শুরু হইয়াছে, তবুও কারখানা দ্বারা তকলির চাহিদা পূরণ হইতেছেনা। কাল হাজার হাজার স্কুলে লাখ লাখ ছেলের জন্য কোটি কোটি তকলি প্রয়োজন হইবে। কারখানায় তকলি তৈরী হইবে, তাহার পরে উহা পাওয়া যাইবে, উহার পরে আমরা কাটিতে শিখিব এবং শেখার পরে সুতা কাটিতে থাকিব, এই সব বাজে কথা। ইহাতে আমাদের অন্যের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে এবং সময় ও কত লাগিবে ইহার কোন ঠিকানা নাই। কিন্তু আমরা যদি সঙ্কল্প করি, তবে একই দিনে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘর ঘর তকলিতে তকলিতে ভরিয়া দিতে পারি। এজন্য ধাতুর তকলি যদি সময় মত না মিলে, তবে উহার পথের দিকে চাহিয়া থাকার আবশ্যকতা নাই। চাকতি বানানোর জন্য খাপরা ও শ্লেটের টুকরা এবং ডাঁটের জন্য বাঁশের অভাব নাই। এই সমস্ত জিনিষ দিয়াই তকলি বানাইয়া লওয়া দরকার। ইহার জন্য কারখানাওয়ালার মুখের দিকে চাহিয়া থাকার অথবা কারিগরদের খোসামোদ করার প্রয়োজন নাই। এবং এক পয়সা খরচেরও আবশ্যকতা নাই। ইহার আগাগোড়া স্বাধীনতা।

ধাতুর তকলি মিলিলেও শিক্ষার দিক দিয়া ঘরোয়া জিনিষে তকলি বানানো প্রয়োজন। মাটির চাকতি তৈরি করিয়া কুমারকে দিয়া উহা আগুনে পোড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সমস্ত চাকতি সর্বত্রই বানানো যাইতে পারে, আর খুব সস্তা ও হইতে পারে। আমরা যখন নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই পূরণ করিতে থাকিব, আমরা যখন আঁশ পাশের কাঁচা মাল হইতে মাথা খাটাইয়া এবং হাত লাগাইয়া প্রয়োজন মাফিক জিনিষ তৈরি করিতে থাকিব, তখনই আমরা আমাদের হারানো দৌলত ফিরিয়া পাইব। হস্তশিল্পের সাহায্যে শিক্ষার ইহাই অর্থ।

বাঁশের তকলি কি ভাবে বানানো যায়?

বাঁশের তকলি বানানো খুব সহজ। ইহার জন্য যন্ত্র দরকার চাকু, কম্পাস যন্ত্র ও ভোমর। ইহাদের মধ্যে চাকুতো সকলের কাছেই থাকে। বাকী দুইটি যন্ত্র লোহার পাতের টুকরা ও খিলের সাহায্যে বানাইয়া লইতে হয়। ভোমরের আগাটি তিন কোনা থাকে এবং উহা দড়ি দিয়া বা ধনুকের সাহায্যে ঘুরানো হয়। কিন্তু এখানে আমাদের দড়ি বা ধনুকের প্রয়োজন নাই। সাধারণ বাঁট লাগানো ভোমর দিয়া কাজ চলিবে। বাঁটটি হাতে ধরিয়া ভোমর এদিক ওদিক ঘুরাইতে ঘুরাইতে চাকতিতে ছেঁদা করা যায়।

যে জিনিষের চাকতি বানাইতে হয়, তাহা আগে সমতল ও খরখরে পাথরের উপর উভয় দিকে ঘসিয়া লউন। চাকতি বানানোর জিনিষে বালি বা কাঁকর থাকা উচিত নয়; নইলে, উহা গোল করা বা উহার মধ্যে ছেঁদা করা মুশকিল হইয়া পড়ে। কোন কোনটি তো ভাঙ্গিয়াই যায় আর সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়। পাওয়া গেলে শ্লেট বা নরম পাথরের টুকরা লইতে হয়। ইহাদের মধ্যে বালি না থাকায় তৈরি করিতে করিতে চাকতিটি ভাঙ্গার ভয় থাকে না। চাকতি বানানোর পক্ষে ঘিয়া পাথর (সংগ-জরাহত) সর্বোত্তম। চাকতির টুকরাটির উভয় পার্শ্ব মসৃণ করিয়া লওয়ার পরে উহা গোলাকার করিতে হয়। কম্পাসের একটি মাথা টুকরাটির মাঝখানে গড়িয়া অপর মাথা দিয়া একটি গোল বৃত্ত টানিতে হয়। বৃত্তের বাহিরের অংশ ঘসিয়া গোল চাকতি তৈরি করা হয়। পরে চাকতিটির কেন্দ্রে—যাহা গোল টানার সময় কম্পাসের মাথা দিয়া প্রথমেই তৈরি হইয়া থাকে—ভোমরের সাহায্যে প্রায় দুই সুত মোটা ছিদ্র তৈরি করিতে হয়। ছিদ্রটি সম্পুর্ণ সোজা হওয়া দরকার। এই ভাবে চাকতি তৈরি হইয়া যাইবে।

ডাঁট বানানোর জন্য পুরাতন শুকনা বাঁশের বাতা লউন। ডাঁটের মধ্যে যেন গাঁট না থাকে, সেই জন্য বাঁশের দুইটি গাঁটের মধ্যকার বাতা বাহির করিয়া লইতে হয়। বাতাটি চাকু দিয়া চাঁচিয়া প্রথমে চাকতির ছিদ্রের প্রায় দেড়গুণ মোটা এক আট-দশ ইঞ্চি লম্বা একটি শলাকা তৈরি করিয়া লউন। পরে উহাতে নাক বাহির করিতে হয়। নাক বানানোর কাজ খুবই সতর্কতার সহিত করা দরকার কারণ বাঁশের আঁশ খাড়া থাকার জন্য খাঁজ কাটার সময় উহা ফাটিয়া যাইবার ভয় থাকে। প্রথমে বারে খাঁজটি ঠিক মত তৈরি না হইলে সম্পূর্ণ ডাঁটটি যাহাতে ফেলিয়া দিতে না হয়, সেই জন্যই উহা একটু বেশী লম্বা রাখার জন্য বলা হইয়াছে। ডাঁটটি যদি লম্বা থাকে, তবে একটি খাঁজ খারাপ হইলে উহার নীচে আর একটি খাঁজ কাটা যাইতে পারে। খাঁজের খাতের আগাটি (নাক) ডাঁটের উপরের ও নীচের মাথার রেখায় আসা দরকার অর্থাৎ এই তিনটি নাক একই রেখায় থাকা উচিত, নইলে তকলি কাঁপিতে থাকিবে। খাঁজ কাটার দিকটা আগে ছাঁচিয়া খানিক চেপটা করার পরে খাঁজ বানানো উচিত। চেপটা অংশের প্রস্থ যেন পৌনে দুই সুত রাখা হয়। বেশী রাখিলে ডাঁটে চাকতি পরানো যাইবে না। নাক তৈরি হওয়ার পরে ডাঁটটি ৬$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি রাখিয়া বাকিটা কাটিয়া ফেলুন। পরে অপর প্রান্ত হইতে পৌনে এক ইঞ্চি পর্যন্ত ডাঁটটি দুই সুতের চাইতে একটু মোটা রাখিয়া সেখান হইতে নাক অবধি খানিক ছুঁচালো করিয়া তৈরি করুন এবং নীচে রাখা পৌনে ইঞ্চি অংশটুকু চাঁচিয়া উহার ছুঁচালো অনি তৈরি করুন। উহার পরে নাকের দিক দিয়া ডাঁট চাকতিটি পরাইয়া নাক হইতে ছয় ইঞ্চি ব্যবধানে উহা সিধা ও শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিন। বাস্, তকলি তৈরি হইয়া যাইবে। নাক-হীন তকলি তৈরি করিতে হয় তো, উহা খুবই সহজ। বাতা চাঁচিয়া নাক ছাড়া নোক বানাইয়া লউন এবং উহার মধ্যে চাকতি বসাইয়া দিন।

বাঁশের তকলির মাপ ঃ—

অপর একটি অধ্যায়ে ধাতুর তকলির যে মাপ দেওয়া হইযাছে। তাহা বাঁশের তকলির বেলায় পুরাপুরি খাটে না। শক্ত করার জন্য ধাতুর ডাঁটের তুলনায় বাঁশের ডাঁট মোটা রাখা দরকার। বাঁশের ডাঁটাটি যদি ধাতুর ডাঁটের সমানই মোটা রাখা যায়, তবে উহা তাড়াতাড়ি ভাঙ্গিয়া যাইবে।

অনুরূপ ভাবে, ভার বহিবার জন্য খাপরা বা পাথরের চাকতি পিতলের চাকতির তুলনায় বেশী মোটা বা বেশী চওড়া করিতে হইবে, কিন্তু ডাঁটের দৈর্ঘ্য বা চাকতির ওজন বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। মিহি সুতার উপযোগী নাকহীন তকলির ওজন ৳ হইতে ১ তোলা পর্যন্ত হওয়া উচিত, ইহা প্রথমেই বলা হইয়াছে।

বাঁশের তকলির মাপ সাধারণতঃ এই ভাবে লওয়া উচিত

ডাঁট—দৈর্ঘ্য ৬½ হইতে ৬¾ ইঞ্চি, ব্যাস—২ হইতে ২½ সুত। চাকতি ব্যাস ১ হইতে ১½ ইঞ্চি। বেধ বা মোটাই ½ হইতে ¾ ইঞ্চি ডাঁট ও চাকতির আকার বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ এবং ধাতুর তকলির ঠিক সমভাবাপন্ন না হওয়ায় বাঁশের তকলির দ্রুতি কিছু কম থাকে।

বাঁশের তকলির অনি :—

বাঁশের তকলির অনি লোহার তকলির অনির মত ছুঁচালো হয় না। অতখানি ছুঁচালো করিলে ও উহা ঘসা খাইয়া শীঘ্রই ভোঁতা হইয়া যায় এবং দফ্‌তির উপর ইতস্ততঃ নাচিতে থাকে ও জায়গায় খাড়া হইয়া ঘোরে না। কাজেই, হয় উহার তলায় দফতির পরিবর্তে নারিকেলের ছোবড়া ঐরূপ অন্য কোন বস্তু দিতে হয়, নয় তো, অনিতে টিনের ছুঁচালো টুপি পরাইতে হয়।

ঢাকায় বাঁশের তকলি :—

এই পুস্তকে আগে কয়েকবার বলা হইয়াছে যে, ঢাকাই তকলির ডাঁট ছিল লোহার। অথচ বাঁশের ডাঁটযুক্ত তকলির কথাও কোথাও কোথাও উল্লিখিত হইয়াছে (এন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা ২৫ শ খণ্ড ৬৮৫ পৃঃ দেখুন।) কাজেই বাঁশের তকলি দিয়া ও মিহি সুতা কাটা যাইতে পারে, এবিষয়ে সন্দেহর কোন কারণ নাই। *

ষষ্ঠ চতুষ্ক এবং মিহি সুতা কাটাই :—

ষষ্ঠ চতুষ্ক অর্থাৎ ২১।২৪ নং পদ্ধতিতে কাটিতে হইলে নাক-হীন তকলিতে কাজ চলিতে পারে না। এই সমস্ত পদ্ধতি অপেক্ষা প্রথমকার ১৬ টি পদ্ধতিই ৩০।৪০ নং এর বেশী মিহি সুতা কাটার পক্ষে সুবিধাজনক।

* বাংলা দেশে তকলির অপর ব্যবহার—ইহার পরে উল্লিখিত হইয়াছে।

নাকহীন তকলি দিয়া সুতা কাটা :—

নাক বাদ দেওয়ার পরে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া হাওয়ায় আলগা করিয়া কাটার সমস্ত পদ্ধতি বাতিল হইয়া যায়। সেই ভাবেই বাকী পদ্ধতিগুলির মধ্যেও একটা বড় পরিবর্তন ঘটাইতে হয়। তাহা হইল তকলি হইতে হাত না সরানো। নাক না থাকিলে তকলি ঘুরানার পর উহার ডাঁটাটি ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। প্রথম পদ্ধতিতে আদি ধাগা বাহির করার সময় যেমন বুড়া আঙুল ও তর্জনীর ঘেরের মধ্যে তকলি ঘুরাইতে হয়, সেই ব্যাপার এখানে সারা কাটাইয়ের মধ্যে করিতে হয় এবং ধাগাটি সর্বদা তেচচা রাখিতে হয়। নইলে, উহার পাক ঠিক মত লাগেনা এবং উহা ডাঁট হইতে ফস্‌কাইয়া বাহির হইয়া আসে।

মিহি সুতা কাটাইয়ের পদ্ধতিসমূহ :—

তকলি কাটার বিভিন্ন পদ্ধতি উত্তমরূপে অভ্যাস হইয়া যাওয়ার পর, মিহি সুতা কাটাই শুরু করা উচিৎ। এখানে কাটাইয়ের পদ্ধতির নয়, পক্ষান্তরে সুতার উৎকর্ষ সাধনের অভ্যাস আমাদের করিতে হয়। এজন্য ১, ৩, ৯ ও ১১নং পদ্ধতিগুলির মধ্য হইতে যে কোন একটি পদ্ধতিতে কাটিলেই ঠিক হইবে। মিহি সুতার জন্য পাক বেশী দিতে হয় এবং পাঁজের উপর চিমটির আয়ত্তি খুব সতর্কতার সহিত রাখিতে হয়। উল্লিখিত পদ্ধতিতে কাটার সময় সুতার শক্তির পরীক্ষা বরাবর হইতে থাকে। পাক কম পড়িলেই সুতা ছিঁড়িয়া যায় এবং "পাক কম দিতেছে এই খবর কাটুনীর নিকট পেঁছাইতে থাকে। মিহি সুতা কিন্তু তকলি ঠেকাইয়া কাটিতে হয়; এই কারণে উহাতে সুতার শক্তির পরীক্ষা হয় না। কাজেই, মিহি সুতা কাটার সময় সুতা ঠিকমত পাক দেওয়া হইতেছে কি না তাহা সর্বদা খেয়াল রাখা দরকার। সুতা সামান্য মাত্র ও কাঁচা হইলে সব অকেজো হইয়া যাইবে, কারণ, উহা বোনা যাইবে না।

মিহি সুতা কাটই কে করিতে পারে ?

চঞ্চল, চপল ও অধীর লোকদের দ্বারা মিহি সুতা কাটাই বা বুনানো চলিতে পারে না। কারণ, যদি একটি থানের জন্যও সুতা কাটিতে হয়, তবে সারা বৎসর ধরিয়া রোজ ঠিক মাপা সময় সেই কাজে দিতে হইবে। বুননের জন্য ও এই কথাই খাটে। একই থান ছয় মাস বসিয়া বুনন চলিতে থাকে। ইহাতে শান্তি সঙ্কল্প, ধৈর্য্য, আশক্তি, একটানা কাজ করা ও নৈপুন্যের পরীক্ষা হইয়া যায়।

মিহি সুতার দ্রুতি ঃ—

বেশ ওস্তাদ মিহি সুতা কাটুনীর দ্রুতি কত, তাহা নিম্নোক্ত অঙ্ক হইতে বুঝা যাইবে। এই হিসাবটি ১৯৪২-এ মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত তকলি কাটাই প্রতিযোগিতার।—

সময় (মিনিট)	গজ	নম্বর	প্রতি ঘণ্টায় দ্রুতি (গজে)
৩৫	১১৭	৫১	২০১
৩৫	১১৭	৪৬	২০১
৩৫	৯৭	৪১	১৬৩
৩৫	৬৯	৩৮	১১৮
		৪৫$\frac{১}{২}$	১৭০$\frac{৩}{৪}$

মিহি সুতা কাটাইয়ের পরীক্ষা ঃ—

সম্প্রতি কাপাস হইতে শুরু করিয়া সুতা কাটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পরীক্ষার কয়েকটি দৃষ্টান্ত পরে দেওয়া হইতেছে। এই সমস্ত পরীক্ষা খুব নিপুণ কাটুনীরা করে নাই, পক্ষান্তরে সাধারণ কাটুনী ও সুতা কাটা শিক্ষায় উৎসুক লোকে করিয়াছে। এই সমস্ত তালিকায় চাক বানানো, সুতাকাটা, গুটানো ইত্যাদি কাজের সাধারণ দ্রুতি ও বুঝা যাইবে। তুলা, ঘাট্‌তি এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতের কাপাসে বীজের হিসাব ও ইহাতে বুঝা যাইবে। এই পরীক্ষা কেবল পথ দেখানোর জন্য, ইহা হইতে পাকা ফল বাহির করা উচিত নয়।

(১) রোজিয়ম কাপাস—৫ তোলা।—

কাজ	ঘণ্টা মিনিট	জিনিষ…তোলা আনা
দাঁত-চাক……	১—৪৪	বীজ……৩—২
শলাই-পাটায়		
বীজ ছাড়ানো…	০—১৫	ঘাট্‌তি…১—২
পেঁজা…	২—৩৫	পাঁজ… ০—১২
ধুনাই…	০—২০	
	৪—৫৪	৫—০

তকলির দ্রুতি

	মিনিট………	তার	
সুতাকাটা			
	৩০………	১১০	
	৩০………	১০৮	
গুটানো	২৮………	১০২	
	১৬………	৩২০	নম্বর-২১
	১—৪৪		

(২) বনী কাপাস—৫ তোলা

কাজ…	ঘণ্টা মিনিট	জিনিষ…	তোলা আনা
দাঁত-চাক…	২—৩০	বীজ…	৩—১০
শলাই-পাটায়			
বীজ-ছাড়ানো….	০—২০	ঘাট্‌তি….	০—১১
পেঁজা…	০—২০	পাঁজ….	০—১১
ধুনাই…	০—২৫		৫—০
	৩—৩৫		

বাঁশের তকলির দ্রুতি

	মিনিট…	তার
সুতা কাটা…	৩০…	৮৫
	৩০…	৮৪
	২৭…	৭৭
গুটানো ‥	১৯…	২৪৬
	১—৪৬	

(৩) ভেরাম কাপাস—৫ তোলা

কাজ…	ঘণ্টা-মিনিট	জিনিষ…	তোলা আনা
দাঁত-চাক….	২—৫	বীজ=	৩—৮
শলাই-পাটায়			
বীজ ছাড়ানো…	০—১৫	ঘাটতি…	০—১৫
পেঁজা…	২—২	পাঁজ…	০—৯
ধুনাই…	০—২৩		৫—০
	৪—৪৫		

বাঁশের তকলির ক্রুতি

	মিনিট	তার
সুতা কাটা	৩০	৭৫
	৩০	৮৩
	৩০	৭৪
	৩০	৮৮
গুটানো···	১৯	৩২০
	২—১৯	

(৪) ভেরাম কাপাস—৫ তোলা

কাজ	ঘণ্টা মিনিট	জিনিষ	তোলা আনা
চাক তৈয়ার না করিয়া শলাই পাটায় ছাড়ানো	···০—৩৫	বীজ···	৩—৮½
পেঁজা···	৪—০	কচরা···	০—৩
ধুনাই···	০—৩৫	পাঁজ···	১—৪½
	৫—১০		৫—০

বাঁশের তকলির ক্রুতি

	মিনিট	তার
সুতা কাটা···	৩০···	৮৫
	৩০···	৭৩
	৩০···	৮৬
	২৯···	৭৬
গুটানো···	১৯···	৩২০
	২—১৮	

(৫) আমেরিকান কাপাস—৫ তোলা

কাজ···	ঘণ্টা মিনিট	জিনিষ	তোলা আনা
দাঁত-চাক···	১—৫০	বীজ	৩—৮
শলাই-পাটাই বীজ ছাড়ানো···	০—১৮	ঘাটতি	০—১৫½
পেঁজা ··	০—৪০	পাঁজ	০—৮½
ধুনাই··	০—৩৫		৫—০
	৩—২৩		

অষ্টম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

নম্বর, শক্তি বা মজবুতি, সমানতা ও ত্রুটি ইত্যাদি।

নম্বর :—

$$\frac{\text{দৈর্ঘ্য (৪ ফুটের ঘেরে)}}{\text{ওজন (আনায়)}} = \text{নম্বর।}$$

ইহাই নম্বর বাহির করার সূত্র। ইহার অর্থ এই যে, এক আনা ওজনের সুতায় ৪ ফুট ঘেরের যতটা তার থাকিবে, তাহাই সুতার নম্বর হইবে। নম্বর বাহির করার এই প্রণালী মিলের সুতার নম্বর বাহির করার পদ্ধতি হইতে লওয়া হইয়াছে। মিলে চরকির ঘের থাকে দেড় গজ। অর্থাৎ মিলে ৪½ ফুটে এক ঘের, ৮০ ঘেরে এক লাছি, এবং ৭ লাছিতে ১ ফেটি বা গণ্ডী হয়। গজের হিসাবে ১২০ গজ= ১ লাছি এবং ৮৪০ গজ= ১ ফেটি। একসমান সুতার ৮৪০ গজী ফেটি এক পাউণ্ডে (৩৯ তোলায়) যতটা ধরিবে, তাহাই সেই সুতার নম্বর। যেমন, এক পাউণ্ডে ২০ ফেটি ধরিলে সুতার নম্বর হইবে ২০।

প্রত্যেকটি ফেটির মাপ একসমান রাখিলে উহা ওজন করিলেই নম্বর বুঝা যাইবে। এই ভাবে নম্বর ও ওজন বুঝা গেলে সুতার দৈর্ঘ্যও সহজেই পাওয়া যায়। অর্থাৎ মাপ, ওজন বা নম্বরের মধ্য হইতে যে কোন দুইটি বিষয় জানা থাকিলে তৃতীয়টি বাহির হইয়া আসে। নীচে আলোচিত প্রশ্ন সমূহ হইতে এই বিষয়টি পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

প্রশ্ন—১মঃ—১০ নম্বরের ১ পাউণ্ড সুতার দৈর্ঘ্য কত হইবে এই প্রশ্নটি লউন। ইহার উত্তর খুব সহজ। আমাদের জানা আছে যে, যত নম্বর, তত ফেটিই এক পাউণ্ডে ধরে এবং এক ফেটি ৮৪০ গজে হয়। অর্থাৎ ৮৪০×১০ =৮৪০০ গজ।

প্রশ্ন—২য় :—১২ নম্বরের ৪ ফেটির ওজন কত হইবে? এক পাউণ্ডে ১২ নম্বরের ১২টি ফেটি ধরিবে। কাজেই এক ফেটির ওজন $\frac{১}{১২}$ পাউণ্ড এবং ৪ ফেটির $\frac{৪}{১২}$ পাউণ্ড অর্থাৎ $\frac{১}{৩}$ পাউণ্ড হইবে।

প্রশ্ন—৩য় :— ৬০ ফেটির ওজন আধ পাউণ্ড হইলে সুতার নম্বর কত হইবে? আমরা জানি যে, এক পাউণ্ডে যত ফেটি ধরিবে, সুতার নম্বর তত

হইবে। আধ পাউণ্ডে ৬০ ফেটি, কাজেই এক পাউণ্ডে ১২০ ফেটি হইবে অর্থাৎ নম্বর হইবে ১২০।

অল্প পরিমাণ সুতার নম্বর বাহির করিতে হইলে "এক পাউণ্ডে যত ফেটি, তাহাই উহার নম্বর" এই হিসাব সুবিধা হয় না; কারণ, ইহার জন্য গজকে ফেটিতে এবং তোলা ও আনাকে পাউণ্ডে রূপান্তরিত করিতে হয়। কাজেই নম্বরের হিসাব তোলা ও আনায় লাগাইলেই ঠিক হইবে। সমান্য একটু পরিবর্তন করিলেই এই হিসাব পাওয়া যায়। ১ তোলা = ১৮০ গ্রেণ, আর ৭০০০ গ্রেণ = ১ পাউণ্ড। অর্থাৎ $\frac{৭০০০}{১৮০} = ৩৮\frac{৮}{৯}$ বা প্রায় ৩৯ তোলায় ১ পাউণ্ড হয়। কিন্তু হিসাবের সুবিধার জন্য ৪০ তোলায় পাউণ্ড ধরিতে হয় যাহাতে এক তোলা হয় পাউণ্ডের $\frac{১}{৪০}$ ভাগ। ৮৪০ গজের $\frac{১}{৪০}$ অংশ = ২১ গজ; কাজেই এক তোলায় ২১ গজের যতটা লাছি হইবে তাহাই ঐ সুতার নম্বর হইবে। ইহার সূত্র হইবে $\frac{\text{গজ}}{\text{তোলা} \times ২১}$ = নম্বর। এই হিসাব তোলার। আনায় এই হিসাব এই ভাবে দেখান যায়— $\frac{\text{গজ}}{\text{আনা} \times \frac{২১}{১৬}}$ = নম্বর। কারণ এক তোলায় ১৬ আনা; এই জন্য $\frac{২১}{১৬} = ১\frac{৫}{১৬} = ১\frac{১}{৩}$ (স্থূলতঃ)। কিন্তু আনার ভগ্নাংশ সংখ্যার কারণে এই হিসাবও জটিল হইয়া যায়। কাজেই, যদি ভগ্নাংশের ঝঞ্ঝাট দূর করিয়া দেওয়া যায়, তবে নম্বর বাহির করা খুব সহজ হইয়া যাইবে। ৪ ফুট ঘেরের চরকি রাখিলে এই সুবিধা প্রায় লাভ হইয়া যাইবে। চরকির ঘের ৪ ফুট রাখিলে উহাতে জড়ানো তার $১\frac{১}{৩}$ গজ হয়। কাজেই পূর্বোক্ত আনা সংক্রান্ত সূত্রের গজকে তারে রূপান্তরিত করিলে আমরা দেখিতে পাই $\frac{\text{তার} \times \frac{৪}{৩}}{\text{আনা} \times \frac{৪}{৩}}$ = নম্বর অথবা $\frac{\text{তার}}{\text{আনা}}$ = নম্বর। এখানে $১\frac{১}{৩}$ গজ কিন্তু $১\frac{৫}{১৬}$ গজ হইতে কিছু বেশী হয়। কিন্তু ওদিকে পাউণ্ডে এক তোলা বেশী লওয়ায় নম্বরে বিশেষ পার্থক্য হইবে না, কারণ, ওজন বাড়াইবার সাথে সাথে সুতার দৈর্ঘ্য ও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ওজন ও দৈর্ঘ্য সম্পূর্ণ হারাহারি হিসাবে বাড়ে নাই বটে, কিন্তু ইহাতে ওজনের তুলনায় দৈর্ঘ্য বাড়ায় মিলের সুতার তুলনায় হাত কাটাই সুতা কিছু উচ্চ শ্রেণীর মনে হইবে।

এখানে আমরা ওজন কেবল এক তোলা বাড়াইয়াছি, কিন্তু দৈর্ঘ্য প্রতি ফেটিতে $১৩\frac{১}{৩}$ গজ বাড়ানো হইয়াছে। (পূর্বে বলা হইয়াছে যে তকলির সুতা নাটাইয়েতে তোলার সময় ১৬০ তারের ৪ লাছি অর্থাৎ ৬৪০ তারে ফেটি করা হয়।

ফলে ৮৫৩⅓ গজে একহফেটি হয়। এই ভাবে চরকির ঘের চার ফুট রাখার নম্বর বাহির করার পদ্ধতি সহজ হইয়া গিয়াছে। চার ফুটের চরকি তৈরি করার অপর কারণ এই যে, যে তাঁতি খাদি বোনে, সে সহজে হাতের সুতার সহিত মিলের সুতা মিলাইয়া দিতে পারে না। মিলের ফেটির ঘের ৪½ ফুট হওয়ায় উহা ৪ ফুট হাতের সুতার ফেটি হইতে পৃথক পৃথক থাকে। সুতা কাটুনী ও মিলের সুতা হাতের সুতার সহিত ভেঁজাল দিতে পারে না।

সুতার নম্বর বাহির করার জন্য সুতার দৈর্ঘ ৮৪০ গজই কেন লওয়া হইয়াছে, ইহার কোন বিশেষ কারণ দেখা যায় না। সব রকমের সুতার ফেটিও যে ৮৪০ গজেরই হয়, এই কথা নয়। কাপাসের সুতার ফেটি ৮৪০ গজের হয়, উলের পাকানো (worsted) সুতার ফেটি হয় ৫৬০ গজের এবং উহার সাদা সুতার ১৬০০ গজের। শণের সুতার ফেটি তো মাত্র ৩০০ গজেরই হইয়া থাকে। এই মাপ বদলাইয়া ইহার স্থলে সুবিধামত অন্য মাপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমেরিকায় এডুইন. ডি, ফার্ডলী পাউণ্ডে ১০০০ গজের হিসাবে সব সুতার নম্বর বাহির করার পরামর্শ দিয়াছেন এবং আমেরিকার ন্যাশনাল ব্যুরো অব ট্রেডার্স উহা মঞ্জুর ও করিয়াছেন। উহার নম্বর বাহির করিবার সূত্র এই—

$$\frac{\text{গজ} \times ৭০০০}{\text{গ্রেণ} \times ১০০০} = \text{নম্বর}।$$

মিলের ফেটিতে ৭টি লাছি থাকে; ইহারও কোন বিশেষ অর্থ বুঝা যায় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পুঞ্জমের সহিত উহাদের মিল হইযা যায়। ১২০ গজে ১ পুঞ্জম্ অর্থাৎ ১ ফেটিতে ৭টি পুঞ্জম থাকে। ইউরোপের লোকেরা ভারতীয়দের নিকট হইতেই যে বুনন বিদ্যা সোজা বা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গ্রহণ করিয়াছে, ইহাও তাহার একটা প্রমাণ হইতে পারে। নইলে, পুঞ্জম্ ও মিলের লাছি এক সমান হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। আর কিসে এই সামঞ্জস্যের ব্যাপার ঘটিতে পারে? অতীত যুগে (আর কোথাও কোথাও আজও) কাটুনীরা নিজেদের সুতার তানা তৈরি করিয়া লইয়া বাজারে বেচিতে যাইত। উহাদের মাপ ছিল পুঞ্জম্। উহাদের তানা প্রায়ই ৮ গজ থাকিত। এই জন্য উহাদের ১ পুঞ্জম্ তানা অর্থাৎ ফেটি ৯৬০ গজের হইত। আমার মতে, মাপ নির্ধারণের জন্য এই ভিত্তিই ঠিক হইবে। কিন্তু ৭টি লাছি বা পুঞ্জমের ফেটি স্বীকৃত হইয়াছে এই কারণে যে, পাউণ্ডের সহিত ফেটির হিসাব বসানো হইয়াছে। এক পুঞ্জম্ অর্থাৎ ১২০ গজ সুতার ওজন যদি ১০০০ গ্রেণ হয়,

তবে ঐ সুতার নম্বর ১ বলিয়া ধরা হয়; আরম্ভে কেহ হয়তো এই ধরণের হিসাব লাগাইয়া থাকিবে। কিন্তু ১০০০ গ্রেণ এক পাউণ্ডের সপ্তম ভাগ; ইহা দেখিয়াই পাউণ্ডে হিসাব লাগানোর জন্য সে হয়ত ৭ লাছিতে এক ফেটির কথা চিন্তা করিয়া থাকিবে। ভারতীয় পুঞ্জম্ হইতে ইউরোপীয়েরা ১২০ গজী লাছির মাপ গ্রহণ করিয়াছে—এই যুক্তিকে ভিত্তি করিয়া বর্তমান আলোচনা উত্থাপিত হইয়াছে। ফেটি কেন ৮৪০ গজের হইল ইহাতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নম্বর বাহির করার জন্য দেশী ও বিদেশী ওজন এবং গজ ও তার ইত্যাদিকে সর্বদা কজে লাগাইতে হয়; কাজেই উভয় পদ্ধতি জানা থাকা দরকার। তকলিতে কাটা সুতার ফেটি ৬৪০ তারের অর্থাৎ ৮৫৩১/৩ গজের হইলেও হিসাব করার সময় ৮৪০ গজে ফেটি ধরিয়াই হিসাব করা হয়।*

শক্তি বা মজবুতি ঃ—

ওজন ঝটকানি ও ঘর্ষণ বরদাস্ত করিবার সামর্থের উপর সুতার শক্তি মাপা হয়। সুতার প্রকার নির্ধারণের সময় উহার সমানতা বা সাফাই, শক্তি ও নম্বর—এই তিনটি বিষয় দেখা হয়। সুতা যতই মিহি ও এক সমান হোক না কেন, উহা শক্ত না হইলে উহার কাপড় বুনানো মুশকিল। যদি কোনও রকমে উহা বুনিয়াও লওয়া যায়, তবু উহার বুনাইবার মজুরি এত বেশী দিতে হইবে যে তত দামী কাপড় কেহ কিনিতে পারিবে না। এজন্য সুতা শক্ত হওয়া প্রয়োজন। যে সুতা না ছিঁড়িয়া বুনানো যাইতে পারে, তাহাই ভাল সুতা বলা যায়।

সুতা শক্ত কিনা, তাহা দেখার জন্য মিলের সুতা বুনকর তাঁতী ১০ নম্বরী সুতার মধ্য হইতে ১০টি ফেটির একটি বাণ্ডিলকে ঐ সুতার মধ্য হইতে আপন আঙ্গুলে লওয়া একটি ধাগায় উঠাইয়া তোল করে। বাণ্ডিলের ভার সুতার ধাগায় যদি না ছিঁড়ে অথবা ঝটকানি দিলে যদি ছিঁড়ে, তবে ঐ সুতাকে সে টানার উপযোগী মনে করে। অর্থাৎ সুতার শক্তি যাচাই করিবার প্রণালী এই যে, একটি ধাগাকে সেই নম্বরের ১০টি ফেটির ভার তুলিতে হয়।

* বাংলা দেশে পাউণ্ডের ওজন চলে না। সেখানে ৪০ তোলায় আধসের হিসাবে বাটখারা আছে। কাজেই পাউণ্ডের ওজন হইতে আধসেরের ওজনে রূপান্তরিত করিবার জন্য ৮৪০গজকে হারাহারি ভাবে ৮৬৪ গজ ধরিয়া হিসাব করা হয়। অর্থাৎ এখানকার এক একটি ফেটিতে ৮৬৪ গজ থাকে।

$$\left(৮৪০ \div \frac{৭০০০}{১৮০}\right) \times ৪০ = \frac{৮৪০ \times ১৮০}{৭০০০} \times ৪০ = ৮৬৪।$$

মিলে তিনটি প্রণালীতে সুতার শক্তি যাচাই করা হয়।—লাছি (লী), একতারী (সিংগল থ্রেড) এবং ব্যালিষ্টিক টেষ্ট। এই সমস্ত প্রণালীর বর্ণনা এখানে দেওয়া যাইতে পারে না ; কারণ, একে তো উহা খুব বড় হইবে, আর দ্বিতীয়তঃ, এই প্রসঙ্গটি খুব জটিল কষ্ট সাধ্য। হাত কাটাই সুতার শক্তি বাহির করার যে পদ্ধতি চরকা সঙ্ঘে প্রচলিত, তাহাই এখানে লেখা হইতেছে। এই প্রণালীটিও মিলের প্রণালী গুলির মধ্য হইতেই লওয়া হইয়াছে। তথাপি হিসাবের দিক দিয়া উভয় পদ্ধতির মধ্যে অনেক কিছু পার্থক্য আছে। মিলের হিসাবের বেলায় প্রত্যেক নম্বরের সুতার শতকরা একশত শক্তির জন্য কত ওজন উঠাইতে হইবে, কোন বিশেষ নিয়ম সামনে রাখিয়া তাহা নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। হাত-সুতার বেলায় শতকরা একশত শক্তির জন্য প্রত্যেক নম্বরের সুতার কত ওজন উঠাইতে হয়, তাহার হিসাব পরে দেওয়া হইয়াছে। হাত সুতার শক্তি পরীক্ষার এই প্রণালীটির মূল তত্ব এই যে, শতকরা একশত শক্তির জন্য এক নম্বরের আস্ত সুতার দুই ফুট ঘেরযুক্ত ৬টি ধাগার একটি লাছিকে ৩৬০০ তোলা ওজন তুলিতে হইবে। অর্থাৎ সুতার নম্বরের সংখ্যা দিয়া ৩৬০০কে ভাগ দিলে যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে, তত তোলা ওজন সেই নম্বরের (৬ × ২ ফুট অর্থাৎ) ৪ গজী লাছিকে, শতকরা একশত শক্তির জন্য, উঠাইতে হইবে। ইহার সূত্র এইরূপ—$\frac{৩৬০০}{\text{নম্বর}}$ = ১০০ % শক্তির জন্য উঠাইবার ওজন (তোলায়)।

এই সূত্র হইতে জানা যায় যে ১০০% শক্তির জন্য কোন্ নম্বরের সুতার কতখানি ওজন উঠাইতে হয়। ইহা হইতে শতকরা ৮০, ৭৫ ইত্যাদির জন্য আবশ্যক ওজন ও বাহির করা যাইতে পারে। দৃষ্টান্ত যথা—১০০% শক্তির জন্য ১০ নম্বরের সুতার কত ওজন উঠানো উচিত ? উত্তর—$\frac{৩৬০০}{১০}$ = ৩৬০ তোলা শতকরা ৮০ শক্তির জন্য এই নম্বরের কত ওজন উঠানো উচিত ? উত্তর— $\frac{৮০ \times ৩৬০}{১০০}$ = ২৮৮ তোলা। এই ভাবে যে নম্বরের যত শতকরা শক্তি যাচাইয়ের ওজন বাহির করা দরকার, খুসিমত তাহাই করা যাইতে পারে। এই সব হিসাবের একটা নক্শা তৈরি করিয়া রাখা উচিত যেন বারে বারে হিসাব করিবার প্রয়োজন না হয়। তাঁতীর শক্তি যাচাই করিবার পদ্ধতি অপেক্ষা এই পদ্ধতিতে দেড়গুণ বেশী ওজন তুলিতে হয়। তাঁতীর পদ্ধতি একতারী (Single

thread) পরীক্ষা আর উল্লিখিত পদ্ধতি লাছি পরীক্ষা (লী টেষ্ট)। সুতার লাছিকে ঝটকানি দিয়া ছিঁড়িয়া শক্তি যাচাই পদ্ধতির নাম ব্যালিষ্টিক টেস্ট। এই সমস্ত পরীক্ষার মধ্যে লাছি পরীক্ষা সব চেয়ে সহজ এবং তাহাই সর্বত্র কাজে লাগানো হয়।

লাছি-পরীক্ষা :—

শক্তি বাহির করার জন্য তিনটি দ্রব্য প্রয়োজন—নাটাই, ওজন করিবার নিক্তি এবং শক্তি বাহির করার পাল্লা। আরম্ভে চারগজ সুতার নম্বর প্রদর্শক যন্ত্র, শক্তি বাহির করার যন্ত্র—এই দুইটি মূল্যবান যন্ত্র কাজে লাগানো হইত। কিন্তু দামী বলিয়া সাধারণ লোকে ইহা ব্যবহার করিতে পারে না। কাজেই এখন উল্লিখিত সস্তা ও সহজ যন্ত্র পাঁতিতে কাজ চালানো হয়। নম্বর বাহির করার জন্য সোনা ওজন করিবার নিক্তি এবং গ্রেণ, রতি ও আনা ওজনের ছোট ছোট বাটখাড়া কাজে লাগানো হয়। নাটাই সাধারণ ধরণের, কিন্তু উহার উভয় মাথায় তার লাগানো থাকে যাহাতে বাহির করার সময় সুতা কাঠে ঘষা না খায়। শক্তি বাহির করার পাল্লা খুব সাদাসিধা। একটি দড়ির একপ্রান্ত উপরে বাঁধিয়া নীচের প্রান্ত হইতে ১॥ ফুটের ব্যবধানে দড়িতে একটি মোটা তারের আংটা আটকাইয়া দিতে হয় এবং নীচের মাথায় ও ঐরূপই আর একটি কড়া আটকানো হয়। উভয় কড়ার মধ্যে কম পক্ষে ১।০ ফুটের ব্যবধান থাকা উচিত। নীচের কড়ায় পাল্লা লটকানো হয়। ইহা ছাড়া, চার সেরের ছোট বড় বাটখারাও প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে ৭-৮টি বাটখাড়া ছটাকেরই লইতে হয়। শক্তি বাহির করার জন্য এই কয়টি সরঞ্জামই লওয়া দরকার।

যে সুতার শক্তি বাহির করিতে হইবে, তাহার আগার দিকে ২-৩ ইঞ্চি খেই ছিঁড়িয়া ফেলিতে হয়, কারণ উহার পাক খুলিয়া গিয়া থাকে। একটি ফেটির প্রত্যেকটি লাছি হইতে সুতা লওয়া উচিত ; একই জায়গার সুতা যেন না লওয়া হয়। জোড়া না লাগানো সুতাই নাটাইতে তোলা উচিত। ছয় ঘের নাটানোর পর আগার ও গোড়ার খেই মিলাইয়া মাঝখানে পাকা গিঁট দিতে হয়। সুতার মাধ্য মোড়া বা গাঁট যেন না থাকে। এইভাবে চার পাঁচটি লাছি নাটাইয়েতে নাটাইয়া রাখিতে হয়। ইহার চাইতে বেশী পরীক্ষা করার প্রয়োজন নাই। পরে প্রথম লাছিটি নাটাই হইতে খুলিয়া কড়া দুইটির মধ্যে আটকাইয়া দিতে হয়। খোলা বা আটকানোর সময় সুতার যেন কোন ক্ষতি না হয় অথবা

উহাতে মোড়া না পড়ে। কড়ায় লাছিটি আটকানোর পরে কড়া দুইটির মধ্যের দড়ি ঢিলা হইয়া যাইবে এবং পাল্লার ও পাল্লায় রাখা বাটখাড়ার ভার সুতার উপর পড়িবে। ইহার পরে, যে নম্বরের সুতা তাহার শতকরা ৪০-৫০ শক্তির পক্ষে উপযোগী ওজন পাল্লাটিকে হাতে তুলিয়া তাহার উপর আস্তে আস্তে রাখিয়া দিন এবং আবার পাল্লাটিকে ধীরে ধীরে সুতার অবলম্বনের উপর ছাড়িয়া উহার মধ্যে বালি ঢালিতে থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত না সুতা ছিঁড়িয়া যায়। একটা লম্বা বোতলে পুরা ১ সের বালি ভরিয়া উহার গায়ে এক এক তোলার দাগ লাগাইয়া রাখা উচিত। তবেই এই বোতলের মধ্য হইতে কতটা বালি ঢালা হইল, তাহা তাড়াতাড়ি বুঝা যাইবে। সুতা ছিড়িতেই বালি ঢালা বন্ধ করিয়া ইহা টুকিয়া লইতে হইবে যে, কতটা ওজন দেওয়ার পরে সুতা ছিঁড়িয়াছে এবং সাথে সাথে উহা ওজন করিয়া উহার নম্বরও লিখিয়া লইতে হইবে। ঢালা বালি আর ওজন করিবার প্রয়োজন হইবে না। বোতলের গায়ে তোলার দাগ মুখের দিক হইতে তলার দিকে দেওয়া থাকিলে বিয়োগ করারও দরকার হইবে না। বালির বদলে পাঁচ-পাঁচ তোলার পাথরের টুকরাই বেশীর ভাগ কাজে লাগানো হয়। কিন্তু ইহাতে ঠিক কত তোলায় সুতা ছিঁড়িল তাহা বুঝা যায় না ; ৪-৫ তোলার পার্থক্য পড়িয়া যায়। ইহা ছাড়া ৫-৫ তোলার ওজন একদমে বাড়াইলে সুতার উপর ঝটকা লাগে। ওজনের হিসাব করার সময় কড়া ও পাল্লার ওজন ও গণনায় যেন ভুল না হয়। অনুরূপ ভাবে সব কয়টি লাছি পরীক্ষা যন্ত্রে চড়ানোর পরে উহাদের গড় নম্বর ও উঠানো ওজনের গড় বাহির করা দরকার। পরে হিসাব করিয়া শতকরা শক্তি বুঝিয়া লইতে হইবে

যথা :—তিনটি সুতার লাছি পরীক্ষা যন্ত্রে তোলা হইল। প্রত্যেকের উঠানো ওজন ও নম্বর নিম্নলিখিত মত পাওয়া গেল।

লাছি	তোলা	নম্বর
১ম	১৬০	২০
২য়	১৭০	১৯
৩য়	১৫০	১৬
	৪৮০	৫৫

তিনটি লাছি—কাজেই তিন দিয়া ভাগ দিয়া উহাদের গড় নম্বর ১৮ এবং উঠানো ওজনের গড় ১৬০ তোলা পাওয়া গেল।

এখন—

$$\left.\begin{array}{l} ১ : ১৮ \\ ৩৬০০ : ১৬০ \end{array}\right\} ১০০$$

$$\therefore \frac{১৮ \times ১৬০ \times ১০০}{৩৬০০ \times ১} = ৮০ \text{ শতকরা শক্তি।}$$

ইহার সূত্র এইরূপ হইবে :— $\frac{\text{নম্বর} \times \text{তোলা}}{৩৬} = \text{শক্তি}\%$ ইহাতে নম্বর, ওজন ও শক্তি গড় পড়তা, এই কথা মনে রাখা উচিত। যদি একটি লাছিই পরীক্ষা করিতে হয়, তবে গড়ের প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু উহাতে ঠিক শক্তির হিসাব মিলে না। কাজেই কম পক্ষে তিনবার যাচাই করিতে হয়। সুতার শক্তি কম পক্ষে শতকরা ৬০ হওয়া দরকার।

সমতা বা সাফাই :—

শক্তি ও সাফাই পরস্পর জুড়িদার। একটি ব্যতীত অপরটি অসম্পূর্ণ থাকে। পাকানো হইয়াও সুতা এক-সমান না হইলে উহা মজবুত হইতে পারে না। কারণ, দড়ি, শিকল বা সুতার দৃঢ়তা উহার সব চাইতে কাঁচা বা দুর্বল জায়গার দৃঢ়তারই তুল্য হইয়া থাকে। এই জন্য সুতার এক-সমানতা বা পরিচ্ছন্নতা খুব বড় কথা। পাকযুক্ত অ-পরিষ্কার সুতার তুলনায় তাঁতী কিন্তু কিছু কম পাকের অথচ এক-সমান ও সাফ সুতাই বেশী পছন্দ করে। নয়া কাটুনী হয় ফুসফুসা ও এক সমান সুতা কাটে অথবা পাকানো ও অ-পরিষ্কার সুতা কাটে, ইহার অর্থ এই যে, সুতা কেবল পাকানো হইলেই মজবুত বা শক্তিযুক্ত হয় না। কিন্তু শক্তি = পাকযুক্ততা + এক সমানতা। কাজেই এক সমানতা খুব প্রয়োজন।

সুতার সর্বাধিক নম্বরের সংখ্যা হইতে সর্বকম নম্বরের সংখ্যা বিয়োগ করিয়া উভয়ের ব্যবধান ঠিক করুন। এই বিয়োগ ফলকে ১০০ দিয়া গুণ করিয়া গড় নম্বর দিয়া ভাগ দিলে যে ভাগফল পাওয়া যাইবে, তাহাই সেই সুতার সর্বাধিক শতকরা অ-পরিচ্ছন্নতা। ১০০ হইতে এই সংখ্যাটি বিয়োগ করিলে শতকরা সমতা পাওয়া যাইবে। যথা পরীক্ষা যন্ত্রে চড়ানো সুতার নম্বর ১৪, ১৭, ১৮ ও ১৫ ইহাদের যোগ ফল ৬৪। ইহাকে ৪ দিয়া ভাগ দিলে গড় নম্বর ১৬ পাওয়া গেল। সব চেয়ে বেশী নম্বর ১৮ হইতে সব চেয়ে কম নম্বর ১৪ বিয়োগ দিলে বিয়োগ ফল ৪ পাওয়া গেল। $\frac{৪ \times ১০০}{১৬} = ২৫$। এই ২৫ বাহির হইল

শতকরা অপরিচ্ছন্নতা। ১০০হইতে ২৫ বিয়োগ দিলে ৭৫ থাকে। অর্থাৎ ঐ সুতার সমতা শতকরা ৭৫ হইবে। সুতার সমতা যেন শত করা ৮০ র কম না হয়। উহা হইতে কম সাফাই-যুক্ত সুতা উত্তম বলিয়া গণ্য হয় না। সত্য কথা বলিতে কি, গড় পরিচ্ছন্নতার কোন অর্থ নাই। নদীর গড় গভীরতার মত উহা ধোঁকার ফেলানোর বিষয়। কাজেই, প্রতি ইঞ্চিতে, প্রতি লাছিতে এবং প্রতি ফেটিতে যে এক টানা এক-সমানতা থাকে, তাহাই খাঁটি সাফাই বলিয়া মনে করিতে হইবে। এক-সমান অপরিষ্কার সুতা হইলে উহার ও শতকরা একশত সমতা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উহা খাঁটি সমতা নয়। কমপক্ষে একটি ফেটিতে একই নম্বরের সুতা থাকা উচিত।

ফলিত গতি ঃ—

সুতার সহিত ওজন, নম্বর, গজ, ফুট, ইঞ্চি, ও পাক ইত্যাদি বিষয়ের কি সম্পর্ক, একথা যাহারা জানে না, তাহারা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, "আপনি প্রতি ঘণ্টায় কত তোলা সুতা কাটেন ?" অথবা, "প্রতি ঘণ্টায় কত গজ সুতা কাটেন ?" কিন্তু এই ধরণের প্রশ্ন ভ্রমাত্মক। কোন্ নম্বরের সুতা সম্পর্কে এই প্রশ্নটি করা হইতেছে, তাহা না জানিলে এই সমস্ত প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া যাইতে পারে না। মানিয়া লউন যে, এক ব্যক্তি এক ঘণ্টায় দুই তোলা সুতা কাটে ও অপর একজন মাত্র এক তোলা সুতা কাটে। কিন্তু ইহা দ্বারা এই দুই জনের মধ্যে কে বেশী নিপুণ তাহা বলা যায় না। প্রথম ব্যক্তির সুতার নম্বর যদি হয় ১০ এবং অপরের ২০, তবে ওজনে দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্ধেক সুতা কাটিলেও দৈর্ঘ্যে উভয়ের সুতা এক সমান। আর দ্বতীয় ব্যক্তির সুতা প্রথমে ব্যক্তির তুলনায় দ্বিগুণ উঁচু নম্বরের। এজন্য দ্বিতীয় ব্যক্তিকে প্রথম অপেক্ষা উঁচু শ্রেণীর মনে করা হয়। প্রথমের তুলনায় দ্বিতীয়ের দ্রুতিও বেশী। ১০ নম্বরের সুতায় প্রতি ইঞ্চিতে ১১·৮৫ পাক দিতে হয় আর ২০ নম্বরের সুতায় ১৬·৭৭ পাক দিতে হয়। এজন্য কাটাইয়ের দ্রুতি সম্পর্কে প্রশ্নটি এই ভাবে করা উচিত—"আপনি প্রতি ঘণ্টায় কোন্ নম্বরের সুতা কত তার বা গজ কাটেন ? "আর যদি তোলা ও গজের প্রশ্ন একই সাথে করিতে হয়, তবে এই ভাবে করা উচিত—"আপনার প্রতি ঘণ্টার ফলিত গতি কত ?" ফলিত গতি= $\sqrt{\text{নম্বর}}\times$ তার বা গজ। কারণ, যতই নম্বর বাড়িতে থাকে, ততই নম্বরের বর্গমূল হিসাবে প্রতি ইঞ্চিতে বেশী পাক দিতে হয়। এই জন্য নম্বরের বর্গমূল দিয়া

দৈর্ঘ্য (গজ বা তার) কে গুণ করিলে যে গুণফল পাওয়া যায়, উহা নম্বর ও দ্রুতির সাধারণ অঙ্ক হইবে। ইহার সাহায্যে কাটুনীদের পরস্পরের তুলনা করা যাইতে পারে। কাটাইয়ের পরীক্ষায় সব চাইতে বেশী ও সব চাইতে কম নম্বরের সুতা কাটার সীমানা বাঁধিয়া দিয়া প্রতি ঘণ্টার ফলিত গতি নির্ধারণ করিয়া লওয়া উচিত। কাটাইয়ের দ্রুতি যাচাইর ইহাই সুসংগত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুযায়ী একটি প্রশ্ন আলোচনা করুন। একজন লোক যদি প্রতি ঘণ্টায় ১০ নম্বরের ৩২০ তার সুতা কাটে আর অপর এক ব্যক্তি যদি ২০ নম্বরের ১৬০ তার কাটে, তবে উভয়ের মধ্যে কাহার দ্রুতি বেশী? উত্তর—ইহাদের ফলিত গতি হইবে—

(১) $\sqrt{১০} \times ৩২০ = ৩.১৬ \times ৩২০ = ১০১১.২$

(২) $\sqrt{২০} \times ১৬০ = ৪.৪৩ \times ১৬০ = ৭১৫.২$

কাজেই, দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা প্রথম ব্যক্তির দ্রুতি বেশী। এখন, প্রথম জনার দ্রুতি ১০০ মানিয়া লইলে, দ্বিতীয় জনার দ্রুতি হইবে—

$\frac{৭১৫.২ \times ১০০}{১০১১.২}$ = প্রায় ৭০। অর্থাৎ উহাদের দ্রুতির অনুপাত ১০:৭।

সুতা কাটার মজুরি ঃ—

কেহ যদি কোরা কাগজের মূল্যের সহিত লেখার মজুরি জুড়িয়া বাজে কাগজের দাম চাহিতে থাকে, তবে তাহাকে আমরা পাগল বলি। এই কথা সুতার বেলায়ও খাটে, যে ভাবে খুসী কাটা সুতার মূল্য উহার পাঁজের বা তুলার দামের সমানও হয় না; কাটাইয়ের মজুরির কথা তো সম্পূর্ণ আলাদা। উলটা, তুলা খারাপ করার জন্য তাহার নিকট হইতে তুলার দাম উসুল করা উচিত। যাহার সুতার শক্তি ৬০% ও সমতা ৮০%, তাহারই পুরা মজুরি দেওয়া হয়। এইরূপ সুতার মজুরির হার পরে দেওয়া হইয়াছে।

সুতার মজুরি নির্ণয় কালে উহার নম্বর ও মূল্য নিম্নোক্তরূপে নির্ধারিত হয়। ২৫।৩০টি ফেটির কম সুতার মজুরি বাহির করা হয় না। কারণ, অল্প পরিমাণ সুতা যাচাই করিয়া কোন লাভ নাই। ৮০ তোলা সুতা পরীক্ষায় যত সময় লাগে, ১০।১৫ তোলায়ও তত খানিই লাগে। কম সুতা না লইবার রীতি চালু করিলে কাটুনী নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুতা কাটে, বিশ্রাম করে না।

প্রথমে সুতার মধ্য হইতে সব চাইতে মোটা ফেটিটি তুলিয়া লওয়া হয়। সেই ফেটির মধ্য হইতেও সব চেয়ে মোটা লাছিটি পৃথক করিয়া তাহার তারগুলি

গুনিয়া লওয়া হয় এবং উহা ওজন করিয়া নম্বর বাহির হইয়া থাকে। এই নম্বরকেই সমস্ত সুতার নম্বর বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। ফেটিটি ঠিক চার-ফুটি চরকিতে জড়ানো না হইয়া থাকিলে নম্বর বাহির করার জন্য চার ফুটি চরকিতে সুতা তুলিয়া লইতে হয়। সবচেয়ে মোটা লাছির নম্বরের উপর সমস্ত সুতার নম্বর নির্ধারিত হইলে, কাটুনী একই নম্বরের সুতা কাটে এবং সুতা খরিদদারেরও মোটা সুতার জন্য মিহি সুতার মজুরি দিয়া লোকসানে পড়িবার ভয় থাকে না।

মজুরি ফেটি হিসাবে না দিয়া ওজনের হিসাবে দেওয়া হয়। কারণ সব ফেটি ঠিক ৬৪০ তারের এবং প্রত্যেকটি তার বরাবর চার ফুটের আছে কি না, তাহা যাচাই করা সম্ভব হয় না।

যে সুতার শক্তি শতকরা ৩০ হইতে কম, তাহা লওয়া হয় না। শতকরা ৩০—৩৯ শক্তিযুক্ত সুতার জন্য প্রতি টাকায় চার আনা, ৪০—৪৯-এর উপর প্রতি টাকায় দুই আনা মজুরি কাটা হয়। ইহা ছাড়া মোড়াতে কাঁচা মোচড়, দেখিতে খারাপ ইত্যাদি দোষের জন্য প্রতি টাকায় দুই আনা পর্যন্ত মজুরি কাটা হয়।

তৈরী পাঁজের দ্বারা সুতা কাটা হইলে সের প্রতি সুতায় দুই তোলা ঘাটতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ ৮২ তোলা পাঁজে ৮০ তোলা সুতা কাটা দরকার। দুই তোলা হইতে বেশী ঘাটতি হইলে অতিরিক্ত পাঁজের দাম লাগাইয়া মজুরি হইতে কাটিয়া লওয়া হয়। নিজে ধুনিয়া সুতা কাটিয়া থাকিলে তুলার শ্রেণী অনুযায়ী ধুনইাতে প্রতি সেরে ৬ হইতে ১০ তোলা অবধি ঘাটতি দেওয়া হয়।

বিশেষ বিশেষ তুলার বিশেষ নম্বরেরই সুতা কাটিতে হয়। নির্দিষ্ট নম্বর হইতে কম বা বেশী নম্বরের সুতা কাটা হইলেও মজুরি কাটিয়া হওয়া হয়। সব চেয়ে কম নম্বর হইতে নীচু নম্বরের সুতা কাটা হইলেও মজুরি কাটা হয় আবার সব চেয়ে বেশী নম্বর অপেক্ষা উঁচু নম্বরের সুতা কাটা হইলেও সব চেয়ে বেশী নির্দিষ্ট নম্বরের মজুরিই দেওয়া হয়। কোন্ জাতের তুলায় কোন্ নম্বরের সুতা কাটা উচিত এবং মজুরি কি হিসাবে কাটিতে হয়, এই সমস্ত বিষয় বেশীর ভাগ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারাই ঠিক করিয়া লওয়া উচিত।

কাটাই পরীক্ষা ঃ—

কাটাই পরীক্ষায় কাটিবার ক্ষতি, সুতার শ্রেণী ও কাটিবার পদ্ধতি—এই

তিনটি বিষয়ে খেয়াল রাখিতে হয়। স্থতিতে স্থতার দৈর্ঘ্য ও নম্বর, শ্রেণীতে স্থতার শক্তি ও সমতা এবং পদ্ধতিতে বাসিবার রীতি, পরিচ্ছন্নতা, ব্যবস্থা, নীরবতা আসক্তি ও অটুট স্থতা কাটা ইত্যাদি বিষয়গুলি থাকে। ফলিত গতি কিরূপে বাহির করিতে হয়, স্থতার শ্রেণী কি ভাবে নির্ণীত হয় এবং স্থতা কাটিবার খাঁটি পদ্ধতি কোনটি, এ সবের বিবরণ আগেই বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হইয়াছে।

কাটাই পরীক্ষায় ১০০ নম্বর রাখা হইলে উহাদের এই ভাবে ভাগ করা হয়।

ফলিত গতির জন্য	৪০ নম্বর
স্থতার শ্রেণীর জন্য	৪০ নম্বর
কাটাই পদ্ধতির জন্য	২০ নম্বর
	মোট ১০০ নম্বর।

বারবার পরীক্ষণ যন্ত্রে চাপাইয়া স্থতার নম্বর বাহির করা সম্ভব হয় না এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। সেই অবস্থায় পরীক্ষকের উচিত কেবল নজরের উপর নির্ভর করিয়াই স্থতার শ্রেণী নির্ধারণ করা। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়—এই ভাবে স্থতার তিনটি শ্রেণী বিভাগ করিতে হয়। আবার $প^১$, $প^২$, $প^৩$, $দ^১$, $দ^২$, $দ^৩$, $স্থত^১$, $ত^২$, $ত^৩$—এই ভাবে প্রত্যেকটির তিন তিনটি উপ বিভাগ করা যায়। $প^১$ শ্রেণীকে যদি ৪০ নম্বর দেওয়া হয় তবে $প^২$কে ৩৫ দেওয়া উচিত এবং এইভাবে প্রত্যেকটি নীচের শ্রেণীতে ৫—৫ নম্বর কমাইয়া যাইতে হয়। এই ভাবের যাচাইতে পরীক্ষকের উপর খুব দায়িত্ব থাকে। স্থতার শ্রেণী নির্ণয় করার সময় খুব নৈপুণ্যের সহিত কাজ করিতে হয়। নইলে পরীক্ষার্থীর ক্ষতি হয়।

এই সমস্ত বিষয় লক্ষ করিয়াই স্থতার মজুরি লাগানো হয়; কাজেই, প্রায়ই মজুরি দ্বারাই কাটাইয়ের পরীক্ষা লওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু উহাকে ঠিক রীতি সম্মত বলা যায় না।

তকলি কাটাই পরীক্ষার মাপকাঠি পরে দেওয়া হইতেছে। সর্বোৎকৃষ্ট কাটুনীর সীমা এবং কাটাইতে পাস হওয়ার উপযোগী কাটুনীর সীমা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দুই য়ের মাঝখানে আবার অনেক রকমের শ্রেণী বিভাগ করা চলে। কাটু নীর শিক্ষানুযায়ী পরীক্ষক উহা স্থির করিতে পারেন।

তকলি-বিশারদদের পরীক্ষা :—

সময়—৩ ঘণ্টা (নাটানো সমেত)

(১) নম্বর ৮ হইতে ১১ ; প্রতি ঘণ্টায় ফলিত গতি ৭৫০ ; শক্তি ৭৫% ; সমতা ৮০%।

(২) নম্বর ১২ হইতে ১৫ ; প্রতি ঘণ্টায় ফলিত গতি ৮০০ ; শক্তি ৭৫% ; সমতা ৮০%।

(৩) নম্বর ১৬ হইতে ২০ ; প্রতি ঘণ্টায় ফলিত গতি ৮৫০ ; শক্তি ৭৫% ; সমতা ৮০%।

এই তিনটির মধ্য হইতে যে কোন একটি পরীক্ষায় পাস হইলেই তকলি-বিশারদ বলিয়া গণ্য করা যায়। ইহা হইতে অধিক নম্বরের সুতার পরীক্ষার মাপকাঠি দেওয়া হয় নাই। কারণ, উহা একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীই। উহার জন্য পেঁজানো পাঁজ কাজে লাগাইতে হয়। এখানে সাধারণ ভালো তুলা ও ধুনাই গ্রহণ করা হইয়াছে।

তকলি-প্রবেশিকা পরীক্ষা :—

সময় ১ ঘণ্টা (নাটানো সমেত)

যে কোন নম্বরের ১২০ তার ; শক্তি ৪০% ; সমতা ৬০%। এই সামান্য পরীক্ষায়ও যে পাস হইবে না, তাহার তকলিতে সুতা-কাটা আসে না, এরূপ মনে করা উচিত। এই পরীক্ষায় যে পাস হইবে, তাহাকে কেবল একজন সাধারণ কাটুনী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

বুনন সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়।

কাপড়ের জমি (পোত) :—

কাপড় টানা প'ড়েন অর্থাৎ লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি ধাগায় বোনা হয়। লম্বালম্বি ধাগাকে টানা ও আড়াআড়ি ধাগাকে প'ড়েন বলে। এক বর্গ ইঞ্চিতে টানা ও প'ড়েনের যতটা ধাগা থাকে, উহাই সেই কাপড়ের পোত বা (জমি)। কাপড়ের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে যতটা লম্বালম্বি ধাগা থাকে, ততটাই যদি আড়া আড়িতেও থাকে, তবে উহাকে চৌরস পোত বা জমি বলা হয়। চৌরস পোত-যুক্ত কাপড় বেশী টেকসই হয়। স্বাস্থ্যের খাতিরেও চৌরস পোতের

কাপড় ভালো মনে করা হয়। সংস্কৃত "প্রোত" হইতে হিন্দুস্থানী 'পোত' শব্দ উদ্ভূত। প্রোত শব্দের অর্থ—গ্রথিত। পোত চৌরস না হইলে টানা ও প'ড়েনের ধাগার সংখ্যা পৃথক পৃথক দেওয়া উচিত অথবা ঘন ঝাঁঝরা বা পাতলা বুনট দেখানোর জন্য পোতের নম্বরের সামনে যোগ বা বিয়োগের চিহ্ন লাগানো উচিত। কাপড়ের পোত ৩৬ দেওয়া থাকিলে, কাপড়ের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৩৬ টানার ও ততটাই প'ড়েনের ধাগা আছে, এরূপ মনে করিতে হইবে। সুতার নম্বর ও কাপড়ের পোত জানা থাকিলে সেই কাপড়ের জন্য কতটা সুতা লাগিবে, তাহা বাহির করা যাইতে পারে। মধ্যপ্রান্ত চরকাসঙ্ঘ সুতার নম্বরের পরে পোতের অঙ্ক বসাইয়া খাদিতে নম্বর দেয়। যেমন পোত নম্বর ১২৪০, ইহার অর্থ এই যে, ১২ নম্বরের সুতার প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৪০টি টানা এবং ৪০টি প'ড়েনে যুক্ত খাদি। এখন দেখিতে হইবে যে, এই পোত-যুক্ত ৪৫ ইঞ্চি বহরের ১০ গজ কাপড়ে কত সুতা লাগিবে। ৪৫ ইঞ্চি বহর ×৪০ প্রতি ইঞ্চি টানার ধাগা = ১৮০০ ধাগা। ১৮০০কে দশ গজ দিয়া গুণ করিলে ১৮০০০গজ হইবে। এই ১৮০০০ গজ টানার সুতা হইল। এই পরিমাণ সুতাই প'ড়েন লাগিবে। কাজেই মোট সুতা দরকার ৩৬০০০ গজ অর্থাৎ $\frac{৩৬০০০}{৮৪০}$ = ৪২$\frac{৬}{৭}$ ফেটি। হিসাবে এই ঠিক হইল। আসলে কিন্তু ইহা হইতে বেশী সুতা লাগিবে। কারণ প্রত্যেকটি থানে আধ গজ টানা বেশী রাখিতে হয়। এজন্য যত গজ কাপড় হইবে, তাহা হইতে আধ গজ বেশী টানা হিসাবে লইতে হইবে। ইহা ছাড়া কতক সুতা ছিঁড়িয়া যায় এবং পাড় ইত্যাদির জন্যও দেহারা সুতা দিতে হয়। সেই জন্য ও হিসাবে ব্যবস্থা রাখিতে হয়। অনুরূপ ভাবে বহরে ও বেশীই রাখিতে হয়। কারণ, তাঁত হইতে খুলিয়া আনার পর এবং ধোলাই করা হইলে কাপড় খানিকটা কমিয়া যায়। দেখা গিয়াছে যে, দৈর্ঘ ও প্রস্থে কাপড় সাধারণতঃ $\frac{১}{১০}$ কমে। ইহার অর্থ এই যে, তাঁতের দশ বর্গ গজ-কাপড় ধোলাইয়ের পরে ৯ বর্গ গজ থাকিয়া যাইবে। এই জন্য সুতাও বেশী লওয়া উচিত। ইহার অর্থ এই যে যত গজ কাপড় দরকার, তাহা বুনাইয়ের জন্য উহার এক গজ টানার সুতা বেশী লাগিবে। উপরের কাপড়ের এক গজ টানা অর্থাৎ (১×৪৫××৪০ গজ) অর্থাৎ ১৮০০ গজ সুতা হইল ১৫ পুঞ্জম। ৭ পুঞ্জমে একটি ফেটি হয়, কাজেই ১৫ পুঞ্জমে ২$\frac{১}{৭}$ ফেটি সুতা হইবে। এই হিসাব অনুযায়ী উল্লিখিত কাপড়ে ৪২$\frac{৬}{৭}$ + ২$\frac{১}{৭}$ = ৪৫ ফেটি সুতা লাগিবে। এই হিসাবের সূত্র এইরূপ হইবে—

$$\frac{(\text{পুঞ্জম্} \times \text{গজ} \times ২) + \text{পুঞ্জম্}}{৭} = \text{সেই কাপড়ের পক্ষে}$$

আবশ্যক ফেটির সংখ্যা। এই সূত্রানুযায়ী হিসাবে—

$$\frac{(\text{১৫ পুঞ্জম্} \times \text{১০ গজ} \times ২) + \text{১৫ পুঞ্জম্}}{৭} = \frac{৩০০ + ১৫}{৭} = \text{৪৫ ফেটি}$$

(৮৬৪ গজের ফেটি হইলে ৪৩$\frac{৩}{৪}$ লাগিবে)। অর্থাৎ ১২৪০ নম্বর, ১০ গজ লম্বা ও ৪৫ ইঞ্চি বহরের থানের সম্পূর্ণ টানা পোড়েনে মিলিয়া মোট ৪৫ ফেটি লাগিবে।

সূত্রটির ব্যাখ্যা :—পুঞ্জম্ অর্থাৎ বহরের ধাগার সংখ্যাকে লম্বাই অর্থাৎ দৈর্ঘের গজ দিয়া গুণ করিলে সমস্ত টানা বাহির হইবে। পোত চৌরস হইলে টানার সমানই প'ড়েন হইবে। কাজেই উহাকে দ্বিগুণ করিতে হইবে। ইহাই টানা প'ড়েনের সমস্ত সুতা ইহাতে এক গজ টানার সুতা অর্থাৎ পুঞ্জম্ বেশী লাগিবে। কাজেই উহাতে ততটা পুঞ্জম যোগ দিতে হইবে। ইহাই সমগ্র কাপড়টির জন্য আবশ্যক পুঞ্জম্। ৭ পুঞ্জমে এক ফেটি। কাজেই ইহাকে ৭ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ভাগ দিলে কাপড়ের জন্য আবশ্যক ফেটির সংখ্যা বাহির হইবে।

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনার পরে পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, পুঞ্জমের তিনগুণ ফেটি ১০ গজ থান তৈরীর জন্য প্রয়োজন। ১২০ তানার ধাগা = ১ পুঞ্জম্। কাজেই উল্লিখিত কাপড়ের জন্য $\frac{১৮০০}{১২০}$ = ১৫ পুঞ্জম লাগিবে। ১৫-এর তিনগুণ অর্থাৎ ৪৫ ফেটি এই কাপড়ের জন্য দরকার হইবে।*

---

* বাংলা দেশের চরকা সঙ্ঘে একটু স্বতন্ত্র পদ্ধতি প্রচলিত। কাপড় বুনানোর সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চৌরস পোত হয় না। টানা ও প'ড়েনের প্রতি ইঞ্চিতে ধাগার সংখ্যায় প্রায়ই পার্থক্য থাকে। কাজেই এখানকার কাপড়ের টিকেটে এইরূপ চিহ্ন থাকে। $\frac{\text{ট} \times \text{প}}{\text{নং}}$। ট = প্রতি ইঞ্চিতে বা আধ ইঞ্চিতে টানার ধাগার সংখ্যা ; প = প্রতি ইঞ্চিতে বা আধ ইঞ্চিতে প'ড়েনের ধাগার সংখ্যা। নং = সুতার নম্বর। টানা ও প'ড়েনে পার্থক্য থাকিলে কাপড়ের মোট সুতার পরিমাণ নিম্নোক্ত নিয়মে বাহির করা যাইতে পারে। টানার সুতার পরিমাণ—বহর (ইঞ্চিতে) × টানার ধাগার সংখ্যা প্রতি ইঞ্চিতে × দৈর্ঘ্য (গজে) = ব × ট × দ (গজে)

এখন কোন নম্বরের সুতার কত পোত রাখা উচিত, তাহাই দেখা যাউক। কোন্ কাজের জন্য কাপড়টি প্রয়োজন, প্রথমে তাহাই দেখিতে হইবে। কোটের কাপড়ের বুনট ঘন হইবে, সার্টের কাপড় উহা হইতে পাতলা এবং ধুতি, সাড়ী ইত্যাদি উহার চাইতেও হালকা হওয়া দরকার। কাজেই এই বিষয়ে কোন পাকা নিয়ম করিয়া দেওয়া মুশকিল। কিন্তু পরীক্ষিত সত্য এই যে, কোন নম্বরের সুতা এক ইঞ্চিতে পরস্পরের গায়ে সাঁটিয়া যত তার বসে, তাহাদিগকে ২।, ২॥, ২৸ ও ৩॥ দিয়া ভাগ দিলে যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে, সেই পোতই যথাক্রমে কোট ; কামিজ ; ধুতিও সাধারণ সাড়ী ; মিহি সাড়ী ও ব্লাউজের কাপড়ের জন্য রাখিতে হয়। প্রত্যেক নম্বরের সুতা খুসীমত সব কাপড়ের কাজে লাগিতে পারে না। সাধারণ মোটা ও খাপী কাপড়ের জন্য ৬ হইতে ১২

প'ড়েনের সুতার পরিমাণ—বহর × প'ড়েনের ধাগার সংখ্যা প্রতি ইঞ্চিতে × দৈর্ঘ্য (গজ) = ব × দ × প (গজ)

∴ মোট সুতার পরিমাণ—ব × ট × দ + ব × দ × প

= ব × দ × (ট + প) গজ।

দৃষ্টান্ত :— $\frac{৩৬ \times ৩২}{১০}$ এই পোত যুক্ত ৪৫ ইঞ্চি বহরের ১০ গজী কাপড়ে কত সুতা লাগিবে।

এখানে ব = ৪৫, দ = ১০, ট = ৩৬, প = ৩২ ;

কাজেই, ৪৫ × ১০ × (৩৬ + ৩২) গজ = ৪৫০ × ৬৮ গজ = ৩০৬০০ গজ

$\frac{৩০৬০০}{৮৪০}$ ফেটি = ৩৬$\frac{৩}{৭}$ ফেটি

ঘাটতির জন্য এই কাপড়ে প্রায় ২ ফেটি সুতা অতিরিক্ত লাগিবে। কাজেই মোট সুতা দরকার ৩৮$\frac{৩}{৭}$ ফেটি দরকার হইবে। ৮৬৪ গজের ফেটি হইলে ৩৭$\frac{১}{২}$ ফেঠি দরকার হইবে।

একথা এখানে উল্লেখনীয় যে যেমন কাপড়ের দৈর্ঘ্য; প্রস্থ ও টানা-প'ড়েনে প্রতি ইঞ্চিতে ধাগার সংখ্যা জানা থাকিলে কাপড়ে কতখানি সুতা লাগিয়াছে, তাহা পাওয়া যায়। সেইরূপ কাপড়ের ওজন জানা থাকিলে উপরোক্ত সংখ্যাদির সাহায্যে সুতার নম্বর ও বাহির করা যায়। যথা—উল্লিখিত ৩৭$\frac{৩}{৭}$ ফেটির ওজন যদি ১৫০ তোলা হইয়া থাকে, তবে কাপড়ের সুতার নম্বর হইবে ১০। কারণ তখন ১০ ফেটির ওজন হইবে ৪০ তোলা।

নম্বরের ; কামিজ, ধুতি ইত্যাদির জন্য ১২ হইতে ১৮ নম্বর পর্য্যন্ত ; এবং সাড়ী ইত্যাদির জন্য ইহাদের চাইতে উঁচু নম্বরের সুতা কাজে লাগানো হয়।

সুতার মোটাই ব্যাস :—

এখন দেখিতে হইবে যে, প্রত্যেক নম্বরের সুতার এক এক ইঞ্চিতে কত তার বসে। সুতার একটি তারের মোটাই মাপা মুসকিল। কাজেই এক ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের মধ্যে পরস্পরের গায়ে সাঁটিয়া যতটি ধাগা বসে, তাহা হইতেই সেই সুতার ব্যাস নির্ণীত হয়। এক (১) নম্বরের সুতার ২৭॥ টি ধাগা এক ইঞ্চি পরিমিত স্থানে বসে, দুই নম্বরের বসে ৩৯টি ধাগা। কাজেই এক নম্বর সুতার ব্যাস $\frac{১}{২৭\cdot৫}$ ইঞ্চি আর ২ নম্বরের $\frac{১}{৩৯}$ ইঞ্চি হইবে। কিন্তু কিন্তু সাধারণতঃ এক নম্বরের ২৭॥, ২ নম্বরের ৩৯ এই ভাবেই বলা হইয়া থাকে।

নম্বরগুলির পরস্পরের সঙ্গে যে সম্পর্ক, তাহাই উহাদের দৈর্ঘ্য এবং ওজনেও থাকে। দৈর্ঘ্যের সহিত নম্বর সম্পর্ক সোজা, আর ওজনের সহিত উল্টা। যেমন, দশ নম্বরের এক পাউণ্ড সুতার দৈর্ঘ্য ৮৪০×১০=৮৪০০ গজ; আর ২০ নম্বরের ঐ পপিমাণ সুতার দৈর্ঘ্য ৮৪০×২০=১৬৮০০ গজ, অর্থাৎ দ্বিগুণ নম্বরের বেলায় দৈর্ঘ্যও ঠিক সোজা দ্বিগুণ। কিন্তু দশ নম্বরের দশ ফেটির ওজন ৪০ তোলা আর ১০ নম্বরের ১০ ফেটির ওজন ইহার ঠিক আধা অর্থাৎ ২০ তোলা। এখানে নম্বরের সহিত ওজনের সম্পর্ক ঠিক উল্টা। কিন্তু ব্যাসের বেলায় এই হিসাব চলে না। এক নম্বরের সুতার প্রতি ইঞ্চিতে ২৭॥ ধাগা থাকে, কিন্তু চার নম্বরের সুতার উহা হইতে ৪ গুণ অর্থাৎ প্রতি ইঞ্চিতে ১১০ ধাগা বসে না। নম্বরের হিসাবে সুতার বেধ কমে না, পক্ষান্তরে নম্বরের বর্গমূলের হিসাবে সুতার ব্যাস কমে। অথবা অন্য কথায় এরূপ বলা যাইতে পারে যে, সুতার নম্বরগুলির পরস্পরের মধ্যে যে হিসাবী সম্পর্ক আছে, তাহাই উহাদের ধাগার সংখ্যার বর্গের মধ্যে বিদ্যমান। যেমন ২ ও ৮ নম্বরের সুতা লউন। আট দুইয়ের চারগুণ। দুই নম্বরের সুতার প্রতি ইঞ্চিতে ৩৯ টি ধাগা থাকে ; ইহার বর্গ ৩৯×৩৯=১৫২১। আট নম্বরের প্রতি ইঞ্চিতে ৭৮টি ধাগা থাকে, ইহার বর্গ ৭৮×৭৮=৬০৮৪ অর্থাৎ ১৫২১-এর চার গুণ। আর একটি প্রশ্ন ধরুন। ১৬ নম্বরের সুতার প্রতি ইঞ্চিতে যদি ১১০ ধাগা বসে

তবে ৮ নম্বরের কত বসিবে? ১৬ : ৮ : : $১১০^২$: ? $\therefore \frac{১১০ \times ১১০ \times ৮}{১৬} = ৬০৫০$
কাজেই প্রতি ইঞ্চিতে ধাগার সংখ্যা $\sqrt{৬০৫০} = ৭৭.৫৫ = ৭৮$ (স্থূলতঃ।

কিন্তু ব্যাস বা মোটাই বাহির করার ইহা হইতেও সহজ পদ্ধতি এই যে, যে নম্বরের সুতার প্রতি ইঞ্চি ধাগা বাহির করিতে হয়, সেই নম্বরের বর্গমূলকে ২৭৷৷ দিয়া গুণ করিলেও চলে। যেমন, ৯ নম্বরের বর্গমূল ৩। কাজেই এক ইঞ্চিতে ৯ নম্বরের সুতার ৩ × ২৭৷৷ = ৮১৷৷ ৮২ (স্থূলতঃ) ধাগা বসিবে। নম্বরের বর্গমূল জানার পর যে কোনও নম্বরের সুতার ব্যাস এই ভাবে সহজে বাহির করা যাইতে পারে। ১ হইতে ৫০ পর্যন্ত বর্গমূলের তালিকা দশম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ব্যাস সুতার প্রতি ইঞ্চি পাক এবং ফলিত গতি নির্ণয়ে এই তালিকাটি খুব কাজ দেয়।

তকলি সম্বন্ধে যন্ত্র শাস্ত্র সম্পর্কিত প্রশ্ন :—

প্রথম প্রশ্নঃ—তকলিতে বেশী সুতা গুটাইলে উহার দ্রুতি কেন কমে?

উত্তর ঃ—তকলিতে সুতা যতই বাড়িতে থাকে, তভই উহার ওজনও বাড়িতে থাকে; ফলে, ঘুরিতে থাকা ধুরা বা অক্ষদণ্ডের চারিদিকে তকলির জাড্য ভ্রামক (Moment of Inertia) অনেক কিছু বাড়িয়া যায়। কাজেই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া না ঘুরাইলে তকলির দ্রুতি কমিয়া যায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন :— তকলিতে সুতা ঢিলা করিয়া জড়াইতে উহার দ্রুতি কেন কম হয়?

উত্তর :—তকলিতে গুটানো সুতার আকার শঙ্কুর মতন হওয়া উচিত। শঙ্কুর আকার ব্যতীত অন্য যে কোন আকারেই ঘূর্ণনের অর (Radius of Gyration) বাড়িয়া যাব, ফলে ঘুরিতে থাকা ধুরার চারিদিকে উহার জাড্য-ভ্রামক বাড়িয়া যাইবে। তকলির দ্রুতিতে ইহার উলটা ফল ফলিবে। সুতা ঢিলা করিয়া জড়াইলে কুণ্ডলীর আকার ঠিক শঙ্কুর মত হইবে না। তকলি ঘুরিলে কুণ্ডলিটি ফুলিয়া যায় এবং উহার আকৃতি বে-ঢপ হইয়া যায়।

ইহা ছাড়া, কড়া কুণ্ডলীর তুলনায় ফাঁপা কুণ্ডলী মোটা হওয়ায় উহার **হওয়ার-মধ্যে-ঘষা-খাওয়া-স্তর** ও বেশী হইবে, ফলে হাওয়ার প্রতিরোধ বাড়িয়া যাইবে এবং তকলির দ্রুতি কমিয়া যাইবে। ঢিলা জড়ানো সুতা চারিদিকে এক সমান ভাবে গুটানো যায় না। কুণ্ডলিটি কোথাও চাপা হইয়া থাকে,

আর কোথাও উহার সুতা খানিকটা বাহির হইয়া আসে। এই সামনে বাহির হইয়া অংশটী তকলির দ্রুতিতে বাধা জন্মায়, কারণ সামনে বাহির হইয়া অংশের অর (Radius) অনুযায়ী তকলিকে ঘুরার সময় হওয়া কাটিতে হয়।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ—তকলির দ্রুতি বাড়ানোর জন্য কেন ছাই লাগানো হয় ?

উত্তর ঃ—ধুরার চারিদিকে ঘুরানোর জন্য তকলিতে মোচড়ের (Torque) রূপে জোর দিতে হয়। ডাঁটের গায়ে নাগানো আঙুলগুলির অথবা শরীরের চাপের উপর তকলি ঘুরানোর সামর্থ্য নির্ভর করে। তকলি ঘুরানোর সময় ডাঁট পিছলাইলে চাপ অনর্থক নষ্ট হয়। ছাই লাগাইলে ডাঁট পিছলাইতে পারে না এবং ডাঁটের সহিত শরীরের ঘর্ষণ বাড়াইবার সহায়তা মিলে।

সাধারণতঃ মানুষের চামড়া মসৃণ। মসৃণতাহেতু আঙ্গুলগুলি ডাঁটকে শক্ত করিয়া ধরিতে পারে না। ছাই লাগাইল মসৃণতা দূর হয় এবং চামড়া খরখরে হইয়া যায়। কাজ করিলে আঙ্গুল ঘামিয়া উঠে এবং ডাঁটের উপর আঙ্গুল পিছলাইতে থাকে। ছাই ঘাম শুষিয়া লয় ফলে পিছলান বন্ধ হয়।

চতুর্থ প্রশ্ন ঃ—লোহার বদলে কাঠ দিয়া তকলির ডাঁট তৈরি করিলে সুতার নম্বর ও কাটাইর দ্রুতির উপর উহার কি প্রতিক্রিয়া হইবে ?

উত্তর ঃ—তকলির ডাঁট কাঠের হইলে উহার মোটাই বাড়াইতে হইবে। কারণ, কাঠের সরু ডাঁট মজবুত হইবে না। ডাঁটের ব্যাস বাড়াইলে তকলির কোণাত্মকত্বরণ (angular accelertion) কমিয়া যায় এবং উহাতে সুতায় পাক কম মিলে। কাটার দ্রুতিও কম হইয়া যায়। পাক কম মিলিলে সুতা সাধারণতঃ মোটা হইবে, কারণ মিহি সুতাকে বেশী পাক ও মোটা সুতাকে কম পাক দিতে হয়।

পঞ্চম প্রশ্ন ঃ—তকলির চাকতি হালকা বা ভারী রাখিলে কাটাইর দ্রুতির উপর উহার কি প্রতিক্রিয়া হইবে ?

উত্তর ঃ—তকলির চাকতি বড় গতিচক্রের (fly wheel) কাজ দেয়। চলন্ত যন্ত্রে কার্যশক্তি (energy) কম বেশী হইতে থাকে, ফলে যন্ত্রের দ্রুতিও কম বেশী হয়। গতিচক্রে এই তারতম্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং যন্ত্রের দ্রুতিকে বশে রাখে।

চাকতি ভারী হইলে উহার মধ্যে তকলির দ্রুতিকে বশে রাখার সামর্থ্য বেশী থাকে। আরম্ভকালিন দ্রুতি হাত দিয়া দেওয়া মোচড়ের সামর্থ্যের উপর এবং চাকতির কম বেশী ওজনের উপর নির্ভর করে।

ষষ্ঠ প্রশ্ন ঃ—আকার ও দৈর্ঘ্য বিষয়ে ডাঁট ও চাকতির কি সম্বন্ধ আর উহাদের পরস্পরের সম্পর্কই বা কি ?

উত্তর ঃ—সুতা কাটার যাহাতে সুবিধা হয়, ডাঁটের দৈর্ঘ্য ততখানিই রাখা উচিত। কাপাসের সুতা কাটার জন্য ডাঁটের দৈর্ঘ্য ৬॥—৭ ইঞ্চি হওয়াই ঠিক।

চাকতি যত কম ব্যাস-বিশিষ্ট ও পাতলা হইবে ততই উহা ভালো কাজ দিবে। কিন্তু চাকতির ব্যাস এক ইঞ্চি অপেক্ষা কম রাখিলে সুতা খুব কম গুটানো যায়। কাজেই এক ইঞ্চি ব্যাসের অর্ধ-গোলকাকার (Haif spherical) চাকতি উত্তম বলিয়া গণ্য হয়।

চাকতির ওজন সুবিধা মতন হওয়া উচিত। চাকতির ওজন যত বেশী রাখা হইবে, ততই উহাতে ভরবেগ (Momentum) বেশী সৃষ্টি হইবে। অথচ ইহাতে তকলি ঘুরানোর জন্য বেশী জোর লাগাইতে হইবে। কাজেই কম সামর্থ্য খাটাইয়া বেশী ভরবেগ যাহাতে পাওয়া যায়, চাকতির ওজন সেইরূপই রাখিতে হয়। পরীক্ষানুযায়ী এই ওজন ১।০—১॥০ তোলা হইলেই ঠিক হয়।

ডাঁটটি আঙুলে ধরিয়া সহজে ঘুরানো যাইতে পারে, ডাঁটের মোটাই যেন একরূপ হয়। ৩/১৬ ইঞ্চি ব্যাসই ঠিক। ডাঁটের ওজন চাকতির ওজনের ১/৫ হইতে ১/৬ অবধি হইয়া দরকার। ইহাই সব চাইতে বেশী ওজন ইহার চেয়ে কম ওজন হইলে আরও উত্তম। এই জন্য ডাঁটের দৈর্ঘ্য যতদূর সম্ভব কম হওয়া উচিত এবং যে জিনিষ দিয়া উহা তৈরী হইয়া থাকে, তাহার হালকা হওয়া উচিত। অথচ ডাঁট আবার মজবুত হওয়া দরকার। কাজেই কাঠের বদলে ধাতুর ডাঁট তৈরা করিতে হয়। কিন্তু উহার ওজন চাকতির ওজনের ১/৬ অপেক্ষা অর্থাৎ ৪ আনা পরিমাণের চাইতে বেশী হইতে দেওয়া উচিত নয়।

ইহার অর্থ এই যে, ডাঁটের দৈর্ঘ্য চাকতির ব্যাসের ৬—৭ গুণ এবং চাকতির ওজন ডাঁটের ওজনের ৫—৬ গুণ হাওয়া উচিত।

সপ্তম প্রশ্ন ঃ—ডাঁটের উপর চাকতি কোথায় লাগানো উচিত ?

উত্তর ঃ—চাকতির ভার নীচের প্রান্তের যত কাছে হইবে তকলিটি ততই সোজা ঘুরিবে। কিন্তু ডাঁটের নীচের প্রান্ত হইতে চাকতির দূরত্ব চাকতির অর অপেক্ষা কোন অবস্থারই কম হওয়া উচিত নয়। কারণ তখন সুতা গুটানো কালে ভূমির সহিত ডাঁটের ৪৫°র কোণ তৈরি করা যাইবে না। ৪৫°র কোণ ব্যতীত চাকতির সহিত সাঁটিয়া সুতা গুটানো যায় না। কাজেই নীচের প্রান্ত হইতে চাকতির অরের সমান বা তাহা অপেক্ষা দুই এক সুতা ব্যবধান রাখিয়া ডাটের উপর চাকতিটি লাগানো উচিত।

তকলি সারানো।

তকলির কাজ করিবার ক্ষমতা উহার সরলতার উপর নির্ভরশীল। ডাঁটটি যদি সামান্য একটুও বাঁকা হইয়া যায়, তবেই কাটাইর উপরে উহার ফল খারাপ হয়। কাজেই সুতা কাটার সময় তকলি খুব সাবধানে চালাইতে হয় এবং কাজ শেষ হইয়া গেলে উহা সযত্নে রাখিয়া দেওয়া উচিত। ডাঁটের উপর চাপ বা ভার পড়িলে অথবা কাটার সময় তকলিটি ফরাসের উপর আছাড় খাইলে অথবা কোন কারণে ডাঁটটি তেড়চা হইয়া গেলে উহা সোজা করিয়া লইতে হয়। শিল্পী যদি আপন যন্ত্র আপন হাতে তৈরি করিতে না ও পারে, তাহাতে কোন দোষ নাই ; কিন্তু উহা সারাই করা তো উহার আবশ্যই শিখিতে হইবে।

তকলি সারাইবার জন্য আবশ্যক সরঞ্জাম—(১)

কাঠের ঘোড়া, (২) ছোট নেহাই (৩) ছোট হাতুড়ি, (৪) নল (৫) রেতি ও (৬) খড়ির ডেলা।

ঘোড়া ঃ—৯ ইঞ্চি × ১৫ ইঞ্চি × ১ ইঞ্চি মাপের একটি তক্তার উপর দুইটি ত্রিকোণ আকৃতির কাঠের গোঁজ ঠুকিয়া বসাইয়া দেওয়া হয়। ঐ গোঁজ দুইটির উচ্চতা সাধারণতঃ ৪ ইঞ্চি এবং মোটাই ৩৷৷০ ইঞ্চি থাকে। ইহাদের মধ্যবর্তী ব্যবধান ৪ ইঞ্চি ও আগার দিকে মধ্যের ফাঁক ১০ ইঞ্চি। বসিয়া বসিয়া তকলির ডাঁট সিধা করিতে হইলে এই ঘোড়াকে ১ফুট উচুঁ টুলের উপর এবং

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সারাই করিতে হইলে ইহাকে টেবিলের উপর স্ক্রু দিয়া আঁটিয়া দিতে হয়।

খড়ির ডেলাটি পাথরের উপর ঘসিয়া উভয় পাশে সমতল করিয়া লইতে হয়। ডাঁটটি সিধা করার জন্যঃতকলিটি ত্রিকোণ কাঠের গোঁজ দুইটির মধ্যে আড়া-আড়ি রাখিয়া দিতে হয় এবং বাম হাতের মুঠ গোঁজের উপর রাখিয়া আঙ্গুল দিয়া তকলি সোজা দিকে গড়াইতে হয়। পরে ডান হাতে খড়ির টুকরাটি লইয়া গড়ানো তকলির এক মাথা হইতে অপর মাথা পর্যন্ত ধীরে ধীরে ছোঁয়াইতে থাকা উচিত। ডাঁটের যে অংশ টুকু বাহিরের দিকে আগাইয়া থাকিবে তাহার উপর খড়ি লাগিয়া যাইবে আর ভিতরের দিকে ঝুঁকানো অংশে লাগিবে না। ইহার পরে গোঁজের উপর হইতে তকলি সরাইয়া নেহাইর উপর রাখিতে হয় এবং যে অংশে খড়ি লাগিয়াছে, তাহা উপরে রাখিয়া হাতুড়ি দিয়া ঠুকিতে হয়। বাঁকন যত কম বা বেশী থাকে, সেই অনুপাতে হাতুড়ির চোট হাল্‌কা ভাবে বা জোরে লাগানো উচিত। পরে তকলিটি হাতের তালুর উপর ঘুরাইয়া দেখা উচিত যে, ডাট সিধা হইয়াছে কি না? তকলির আগা যদি না হেলিয়া দুলিয়া সোজা হইয়া ঘোরে, তবে বুঝা উচিত যে, ডাটটি সিধা হইয়াছে। কিন্তু উহা যদি ঘুরিতে ঘুরিতে কাঁপিতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, উহা এখনও আড় আছে। অভ্যাস হইলে কেবল দেখিয়া বা ছুঁইয়াই এই বিষয়টি বুঝা যাইতে পারে।

তকলির ডাট সিধা করার জন্য ঘোড়াটির বিশেষ প্রয়োজন নাই। কেবল আঙ্গুল গুলির দ্বারা ঘুরাইয়া ও কাজ আদায় করা যাইতে পারে। তকলিটি দফতির উপর বা তক্তার উপর ঘুরান এবং উপরের ডগায় বাম হাতের আঙুল রাখুন। সাথে সাথেই ডান হাতে খড়ি লইয়া উহা দিয়া আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত চিহ্ন লাগাইতে থাকুন। চিহ্ন লাগানোর পর ডাটও উল্লিখিত পদ্ধতিতে সিধা করিয়া লউন।

ডাটটি সিধা হওয়ার পর অন্যান্য বিষয় সারানো উচিত। ডাট তেরচা থাকিলে বার বার তকলির চাকতি ঢিলা হইয়া বাহিরে পড়িয়া যায়। এরূপ অবস্থায় ডাটটিকে এক জায়গায় ঠুকিয়া খানিক চ্যাপটা করিয়া লইতে হয় এবং পরে উহা শিকঞ্জে (Press) চাপিয়া চাকতিটি পরাইয়া দিতে হয়। ইহার পরে ডাটের উপর নল পরাইয়া সে নলের উপরের মাথা ঠুকিয়া চাকতিটি পাকাপাকি বসাইয়া দিতে হয়। চাকতির উপর হাতুড়ির ঘা মারা উচিত নয়।

চাকতিটি বসানোর সময় এ কথা মনে রাখা উচিত যে, উহা যেন বরাবর ও সমতুল হইয়া বসে।

তকলির অনি ভোঁতা হইলে ডাঁটটি গড়াইয়া গড়াইয়া রেতি দিয়া ঘষিয়া উহা চোখা করিয়া লইতে হয়। ডাঁটটি স্থির করিয়া রাখিয়া ঘষা উচিত নয়, কারণ এরূপ করিলে অনির আগাটি ঠিক মাঝখানে বাহির হইতে পারে না। ডাঁটার সিধা করায় পর অনিও ঘষিতে হয়, যাহাতে আগাটি ডাঁটার ঠিক মাঝামাঝি বাহির হইতে পারে।

নবম অধ্যায়

কতকগুলি জানিবার মত হিসাব।

নয়া শিক্ষার্থীদের উন্নতি (১)

১৫ জন বিদ্যার্থীর ক্লাস। যন্ত্র তকলি। ডান হাত। ১, ২১ ও ২৩নং পদ্ধতি। দৈনিক আধ ঘণ্টার দ্রুতি। ১১ই এপ্রিল হইতে ১১ই মে, ১৯৩৮। পরিশ্রমালয়, নালবাড়ী।

	প্রথম সপ্তাহ							দ্বিতীয় সপ্তাহ
তারিখ	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
আম্বেদকর	...	...	৪২	...	৫১	...	...	৫৯
দয়ারাম	৫৪	৬০	৬২	...	...	...	...	৬৪
গোলাপ	...	...	...	...	...	৪২	৪৪	৫৩
বাপুরাও	৪২	৫০	৫১	...	...	...	...	৬৪
গঙ্গারাম	৪৫	৫৫	৪৫	...	...	...	...	৬০
ছিদামীলাল	৩০	৪০	৫০	...	৬০	...	৬৭	...
অম্বাদাস	...	...	...	...	...	...	...	...
বাজীরাও	...	...	...	৪৪	৪৪	৪৬	৪৮	...
রামাজী	৪০	৪৪	৪৮	...	...	...	...	৪৮
নারায়ণ	৪৫	...	৪৫	...	৫৫	৫৫	৫৬	৫৭
মতিরাম	২৫	৩০	৪০	৪৫	৪০	৫০	৪৬	৬১
রামচন্দ্র	২৭	২৫	৪০	৪৬	৪৬	...	৪৫	৫৬
মানিকচন্দ্র	৪০	৫০	৫১	৫০	...	৬০	২৩	৬৪
পাণ্ডুরঙ্গ	৪০	৪৪	৪২	...	...	....	...	৪৮
শিবলোচন	৩৫	...	৪০	৪৫	৪৫	৪৬	৫০	...
হাজির বিদ্যার্থী	১১	৯	১২	৫	৭	৬	৮	১১
মোট তার	৪২৩	৩৯৮	৫৬৪	২৩০	৩৪১	২৯৯	৪১৯	৬২৪
গড় তার	৩৮'৪	৪৪'২	৪৭'০	৪৬'০	৪৮'৭	৪৯'৯	৫০'৩	৫৬'৭

	দ্বিতীয় সপ্তাহ							তৃতীয় সপ্তাহ		
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯
৭০	৬১	৬৬	৬০	৭৪	...	৭০	৮০	৮৬	৮৭	৮৬
৬৭	৬৯	৮২	৮১	৮৩	৮২	৮৭	৮৮	৯১	৯৪	৯৯
৫২	৬২	৬৬	৬৮	৭৫	৭৯	৮৫	৮০	৮৫	৯০	৯৪
৬৭	৭৫	৭০	৭০	৮০	৮২	...	৯৮	৮৭	৯৭	৯৩
৫৫	৮০	৮০	৭৫	৮৫	...	৯০	১০০	১০০	১০৮	১০২
...	৭৪	...	৮৪	...	...	৯৪	...	...	৯৪	...
...	৪০	৬০	৫৩	৬০	...	৬৫	৭০	৮০	৭৫	৮৪
৪৭	৪৬	৪৮	৪৮	৬৫	৬৭	....	...	...	৬৮	৭৩
৫২	৬৪	...	৭২	৭০	৭১	৭০	৮৪	৮৬	৮৭	৯০
...	...	...	৬১	৫৫	৬৭	৬৯	৮৫	১০০	...	৮৫
৪৯	৫৩	৫৫	৬৩	৬১	৬৫	৬৫	৬৮	৬৭	৭৫	৫৮
৫৪	৬৩	৬৪	৬৮	৬৬	৬৩	৬৮	৭৫	৭৫	৭৬	৭৯
৬৫	৬০	...	৭৬	...	...	...	...	...	...	...
৪৬	৪৯	৫০	৪৪	৫০	...	৬৫	৫৭	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
১১	১৩	১০	১৪	১৩	৯	১২	১২	১১	১২	১২
৬২৪	৭৯৬	৬৪১	৯২৩	৮২৪	৫৭৬	৮২৮	৮৮৫	৮৫৭	৯৪৬	৯৪৩
৫৬·৭	৬১·২	৬৪১	৬৫·৯	৬৩·৩	৬৪·০	৬৯·০	৭৬·৭	৭৭·৯	৭৮·৮	৭৮·৫

তৃতীয় সপ্তাহ	চতুর্থ সপ্তাল								পঞ্চম নপ্তাহ		
৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
...	৯০	৯২	৯০	১০৮	১০৭	১০৫	১০০	...	...	৯৬	১০১
...	...	১০১	১০৮	১০৬	১১০	১০৮	১০৯	...	১১০	১১৪	১১৫
...	...	১০৫	১১০	১১০	১১১	১০৯	...	...	১০০	১১৫	১১৮
...	...	৯০	৯১	১০২	...	১০১	১০২	...	৯০	১০৭	১০৭
...	...	১০০	১০০	১০৮	...	১১৬	১২০	...	১০২	১১৮	১১৬
...	...	১০০	...	...	১১১	১০৭	১১২	১০৫	১১৪	১১৭	১১৮
...	...	...	...	৯৮	১০২	১০০	৯৭	...	৯৭	১০০	৯৯
...	৮২	...	৮৫	৮৭	৮৮	৯৮	১০০	১০৫	১০৪	১০৫	১০৮
...	...	৯৬	১০০	১০৮	১০৪	১০০	১০২	...	...	৯৫	১০০
...	৮৫	৮৭	৮৯	৯৫	১০৩	...	৯৯	৯৭	১০২	১০৭	১১১
...	৬৫	৭৪	৭০	৭২	৭৪	৮৫	৮৩	৯১	৯০	৮৩	৯৩
...	৭৬	৮০	৮৩	৮৬	৮০	৯৫	১০০	১০০	১০৪	১০৭	১০৬
...	...	৭৬	৭৪	৮৩	৮৭	৯১	৯৩	৮৯	১০২	১০২	১০২
...	...	...	...	৫১	৬০	৫৬	৫৫	...	৫৮	...	৬৮
...	...	৭০	৭৩	৭৭	৯০	...	৯৫	১০০	১০৩	১০৫	১১০
...	৫	১২	১২	১৪	১৩	১৪	১৪	৭	১৩	১৪	১৫
...	৩৭৮	১০৭১	১০৬৩	১২৯১	১২২৭	১৩৬৭	১৩৬৭	৫৮৭	১২৭৬	১৪৭১	১৫৭২
...	৭৫ ৬	৮৯.২	৮৮.৫	৯২.২	৯৪.৩	৯৭.৬	৯৭.৬	৯৮ ১	৯৮.২	১০৫.০	১০৪.৮

নয়া শিক্ষার্থীর উন্নতি (২)

দুই মাসে দুই হাত তৈরী।

একজন সাধারণ লোক রোজ ৪ ঘণ্টা অভ্যাস করিয়া দুই মাসে তকলিতে কতটা দ্রুতি লাভ করিতে পারে, তাহার হিসাব। ঠিক বলিতে গেলে এই দ্রুতি এক মাসেই লাভ হয়। ইহাতে বাম হাত ডান হাতের প্রতিযোগিতা করিতে পারে, ইহাও দেখাইয়া দেওয়া হইবে।

পরিশ্রমালয়, নালবাড়ী। তকলির পরিক্ষা। পদ্ধতি ২১।২৪, সময়, ৩ ঘণ্টা—নাটানো সমেত।

		ডান হাত			বাম হাত		
সংখ্যা	নাম	তার	নম্বর	মজুরি	তার	নম্বর	মজুরি
১	নাইকওয়াড়ে	৪৮৮	৯৵	৲১৭॥	৪২৮	৮	৲১৫
২	নিস্তানে	৪৩০	১১	৲১৭	৩৮৭	৮৵	৲১৩
৩	বারস্কর	৪১০	১১॥	৲১৭	৪১২	৯।	৲১৫॥
৪	দেশমুখ	৪২৬	৯৵	৲১৭	৪১৬	৮॥	৲১৫
৫	বসু	৫২৬	১০	৲১৮	৩১৯	৯৵	৲১৩
৬	দাদা	৫২৩	৯৵	৲১৮	৪৪০	১০৵	১৫
৭	যোশী	৪৯০	৯৵	৲১৭॥	৪০০	৭	৲১২
৮	বারাপাত্রে	৪৯০	১৪	৴০	৪৪০	১২॥	৲১৬
৯	নাগোরাও	৪২৮	১২॥	৲১৭।	৩৯৭	১০	৲১৪
১০	শিব লোচন	৪৪৭	১০॥	৲১৬।	৪১৩	৯৵	৲১৫
১১	মোতি রাম	৩৭৫	১৫	৲১৫	৩৮২	১৩।	৲১৩॥
১২	বাজীরাও	৫১৮	১২॥	৴০	৪৭৭	১১৵	৲১৩॥

		ডান হাত			বাম হাত		
সংখ্যা	নাম	তার	নম্বর	মজুরি	তার	নম্বর	মজুরি
১৩	বাপুরাও	৪৯৩	১৪	৴১৮	৪১৪	১১॥	৴১৫
১৪	রামচন্দ্র	৪২০	১৭	৴১৬।	৪২৫	১৭	৴১৭
১৫	থামন কর	৪১০	২০	৴১৭।	৩৯১	১৪॥	৴১৫
১৬	বংশীলাল	৩৫৩	২২॥	৴১৭	৩৭০	১৮॥	৴১৬॥
১৭	বেদব্রত	৪১৪	১১	৴১৫॥	৩৫৭	৮।	৴১১।
১৮	মানিকরাও	৩৩৭	১৫	৴১৫	৩৯৬	১৩৵	৴১৩
১৯	রামচন্দ্ররাও	৩৭২	১৪	৴১৫	৩৯৫	১০	৴১২
২০	গজানন	৫১০	১১	⁄০	৫০০	১২	৴১৯
২১	দয়ারাম	৬০০	১৬	⁄৪	৫৫৬	১১।	⁄১
২২	ডোমা	৫৭৩	১২॥	⁄২	৫১৮	১০॥	⁄১৮
২৩	রামা	৫১৫	১২।	⁄০	৪৭৫	১৩	৴১৬।
২৪	গোলাপ	৪৯২	১৪।	৴১৮।	৪৩১	১২৵	৴১৬॥
২৫	ছিদামীলাল	৪৯৫	১৩॥	⁄০	৪৮২	১৪॥	৴১৮।
২৬	হলকুপ্রসাদ	৪৯৫	১২৵	৴১৮	৪৫২	১০৵	৴১৬॥
২৭	পঞ্চরাম	৪৫৮	১২॥	৴১৭॥	৪২০	১০	৴১৫
২৮	অম্বাদাস	৪২০	১২	৴১৬।	৩৬৯	১৫।	৴১৪॥
২৯	বাহাদুর সিং	৩৬৩	১৭	৴১৪।	৪০৭	১২॥	৴১৬
৩০	নিরঞ্জন সিং	৪২৫	১৩	৴১৭।	৩৮৫	১১	৴১৩॥
	মোট	১৩৭০৭	৩৯৬।	১॥৵১৫	১২৬৪৪	৩৪৬।	১।৵১৮
	গড়	৪৫৭	১৩·২	৴১৬॥	৪২১৵	১১॥	৴১৬

* মজুরির হার "দিল্লী দরে'র" দ্বিগুণ।

কাটাইর অন্তর্ভুক্ত একটি নমুনা

স্থান—নীলবাড়ী আশ্রম। সময়—আধ ঘণ্টা ; ১২টা হইতে ১২॥টা পর্য্যন্ত

তকলি কাটাই—জুন, ১৯৩৫, প্রথম পনর দিন।

নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১। বল্লভ ভাই	১১৫	১১৪	১১৫	১২২	...	...	...	১০১	১২৩	১৩০	১২২	১২৫	১১৫	১২৫	১০৭
২। নাম দেও	১৫৭	১২৮	১৪১	১৩৯	১৩৫	১৫৫	১৩৫	১৫৬	১৪০	১৫৫	১৫৪	১২৯	১৬০	১৩৩	১৪৩
৩। পণ্ডরী নাথ	১১০	১১৫	১১০	১০৮	১১৯	১২৬	১১৫	১২৭	১১২	১০৯	১২৬	১২২	১১৬	১১৮	১২০
৪। শিবরাম পন্ত	৯৪	৯২	৯৪	১০১	১০৪	১০৪	১০৫	১০২	...	১০০	৯৯	৯৭	৯৮	৯৭	১০২
৫। সত্যব্রত	১৪২	১৪০	১৪৩	১৩৫	১৩৩	১৬১	...	১৬৫	১৪৯	১৬৫	১৭২	...	১৩৪	১৩৪	১৩৬
৬। বুদ্ধ সেন	১৪০	১৫০	১৫০	১৪০	১৫০	১৩৫	...	১৪০	...	...	...	১৫০	১৬০	১৬৮	২০৫
৭। যুগল কিশোর	১৩৯	১৪০	১৫০	১৪০	১৩৫	...	...	...	...	১৪৯	...	১৬৯	১৭১	১৯৩	১৮০
৮। সথারাম	১২৭	১৩০	১৩৩	১৩৩	১৩৪	১৪০	১৪৩	১৪৬	১৫০	১৫৩	১৬২	১৬৪	১৬৬	১৭১	১৬৮
৯। কেলকর	১৩৫	১২৫	১৩৭	১৪৪	১৫০	১৫৩	১৬২	১৭০	১৭০	১৩৮	১৭৮	১৬০	...	১৮৯	১৯৫
১০। শেবণ্ডী ভাই	১২৭	১২০	১২০	১২৫	১২০	১৩০	১৩০	১২৫	...	১২২	...	১১৮	...	১৩২	১২০

সংখ্যা	নাম	মোট তার	দিন	গড়
১	বল্লভ ভাই	১৪১৭	১২	১১৮
২	নামদেও	২১৬০	১৫	১৪৪
৩	পণ্ডরী নাথ	১৭৪৭	১৫	১১৬॥
৪	শিবরাম পন্ত	১৩৮৮	১৪	০৯
৫	সত্যব্রত	১৯০৯	১৩	১৪৭
৬	বুদ্ধ সেন	১৬৮৮	১১	১৫৩॥
৭	যুগল কিশোর	১৭০৬	১১	১৫৫
৮	সখারাম	২২১৯	১৫	১৪৮
৯	কেলকর	২২০৯	১৪	১৫৭॥
১০	শেচণ্ডী তাই	১৪৮৯	১২	১২৪

স্ত্রী পুরুষ, বয়স, ও ফলিত গতি।

আজ পর্য্যন্ত ওয়ার্ধা আশ্রমে আধ ঘণ্টা তকলি কাটার সব চাইতে বেশী দ্রুতি।

পুরুষ—বর্গ				স্ত্রী-বর্গ			
বয়স	তার	নম্বর	ফলিত-গতি	বয়স	তার	নম্বর	ফলিত গতি
৮	৭৮	১২	২৬৯	৮	৭৭	১২	২৬৬
১৬	২০২	১২	৬৯৯	১০	১৩০	১২	৪৫০
১৯	২২৩	১১৸০	৭৬০	১৭	১৮৭	২০	৮৩৬
২১	২০৬	১৯	৮৯৮	১৯	১৭৮	১৬	৭১২
২৩	১৭৫	২৯	৯৪৫	২৮	১৩০	১৪	৪৮৫
৩৩	১৪৯	১৩	৫৩৬				
৬৫	১৩৫	১৪	৫০৩				

অভ্যাসের সামর্থ্য :—

অভ্যাসী—শ্রীসীতারাম কারে মোরে তুমসর (ভাণ্ডারা) সময়—দৈনিক আধঘণ্টা ।

তাং	জানুয়ারী ১৯৩৯ তার	ফেব্রুয়ারী তার	মোট তার	এপ্রিল তার	মে তার	জুন তার
১	১৫৭	১৩৩	১৪৯	১৫২	১৩১	১৪৭
২	১৪৭	১৪৮	১৪৬	১৬৪	১৩৩	১৫৪
৩	১৪৯	১৩২	১৩৬	১৫০	১৩৬	১৩৮
৪	১৪৭	১৬০	১৪৭	১৫১	১৪০	১৪০
৫	১৪৮	১৫৭	১৪৩	১৫৫	১৪৮	১৫২
৬	১৫৮	১৫৭	১৪৬	১৪৬	১২৮	১৩১
৭	১৩৯	১৫৮	১৬০	১৪৮	১৪৫	১৫২
৮	১৩১	১৫৪	১৬৪	১৫১	১৪০	১৫৩
৯	১৪৮	১৫৫	১৫১	১৫৩	১৪৫	১৫৯
১০	১৪১	১৩৪	১৪৩	১৫৭	১৪৩	১৪৬
১১	১৫০	১৬২	১৪৬	১৫১	১৪৭	১৫২
১২	১৪১	১৬১	১৪৪	১৫১	১৩৪	১৪৩
১৩	১৫০	১৬০	১৫৩	১৬৫	১৩১	—
১৪	১৩৫	১৫৯	১৪৪	১৫৬	১৩৪	১৪৪
১৫	১৪৬	১৫৪	১৪০	১৪৮	১৪১	১৪৭
১৬	১৪৩	১৫৮	১৪৯	১৪৬	১৪৯	১৫৩
১৭	১৪৫	১৪৭	১৪০	১৪৬	১৪৭	১৫৬
১৮	১৫৫	১৫৬	১৩৯	১৪২	১৪৬	১৪২

তাং	জানুয়ারী ১৯৩৯ তার	ফেব্রুয়ারী তার	মার্চ তার	এপ্রিল তার	মে তার	জুন তার
১৯	১৩৮	১৫০	১৫৬	১৫৯	১৪৯	১৪২
২০	১৫২	১৪৯	১৫৫	১৪৭	১৩৩	১৫৫
২১	১১৬	১৪৬	১৩৫	১৪৬	১৩৮	১৪২
২২	১৪২	১৬০	১৪১	১৫৬	১৩৯	১৫০
২৩	১২৭	১৫৪	১৪৪	১৫৩	১৪১	১৪৭
২৪	১৪৫	১৪২	১৫৬	১৪৮	১৪৮	১৪৫
২৫	১৫২	১২৮	১৪৫	১৫৩	১৩৮	১৫১
২৬	১৪৮	১৫২	১৩৯	১৫৬	১৫০	১৫২
২৭	১৪৫	১৬১	১৪৯	১৪৯	১৪০	১৪৫
২৮	১৪৯	১৬০	১৪৭	১৪৩	১৪১	১৪৪
২৯	১৪২	—	—	১৪২	১৫৩	১৫৪
৩০	১৪২	—	১৪৬	১৫৩	১৪৪	১৩৮
৩১	১৩৭	—	১৪৭	—	১২৩	—
মোট	৪৪৫৮	৪২৫৭	৪৩৯৭	৪৫৩৪	৪৩৩৭	৪২৭২

৪৪৫৮ — জানুয়ারী
৪২৫৭ — ফেব্রুয়ারী
৪৩৯৭ — মার্চ
৪৫৩৪ — এপ্রিল
৪৩৩৭ — মে
৪২৭২ — জুন
২৬২৫৫

মোট তার ২৬২৫৫ অর্থাৎ ৩৫০০০৬ গজ। শ্রীসীতারামের ছয় মাসের অভ্যাসেরই এই সুতা। এই ছয় মাসে মোট দিন ১৮১। তিনি দুই দিন তারের হিসাব লিখিয়া রাখেন নাই। কিন্তু সুতা কাটিয়াছেন নিশ্চয়ই। অর্থাৎ এই সুতা ১৭৯ দিনে ৮৯½ ঘণ্টায় কাটা হইয়াছে। কাজেই এখানে গড়ে দৈনিক আধ ঘণ্টায় দ্রুতি ১৯৪ গজ।

৩৫০০০ গজে ১০ নং সুতায় প্রায় ৫১ ফেটি হয়। কাজেই তকলি ৯০ ঘণ্টায় তৈরী এই ৩৫০০০ গজ সুতায় পোত নং ১০৩৬-এর ১৩½ পুঞ্জমে কাপড় তৈরী হইবে ১০ গজ × ৪৫ ইঞ্চি। অর্থাৎ ১০×১¼=১২½ বর্গ গজ কাপড় প্রস্তুত হইবে। ইহা আধ ঘণ্টায় ছয় মাসের প্রস্তুতি। অর্থাৎ এক বছরে ২৫ বর্গ গজ কাপড় তৈরী হইবে। প্রথম অধ্যায়ে ভারতবর্ষের বার্ষিক কাপড়ের ব্যয় গড়ে প্রতি লোক পিছু ১২ বর্গ গজ বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই হিসাব পুরানো হইয়া গিয়াছে। বর্তমানের হিসাব মাথা পিছু ১৫·১৪ বর্গ গজ। ১৯৩১ হইতে ১৯৩৬ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরের প্রতি লোকের কাপড়ের ব্যয়ের ইহাই গড়। এই হিসাব মতে দৈনিক আধ ঘণ্টা (আনুসঙ্গিক কাজে আর ও এতটা সময়ই লাগিবে—ইহা মানিয়া লইলে এক ঘণ্টা) কাটাইর বিনিময়ে তকলি আমাদের সারা বছরের কাপড় যোগায়। শুধু তাই নয়, বরং যতটা দরকার, তাহার চাইতে ১০ গজ কাপড় বেশীই দিয়া দেয়। তকলি যে কাপড়ের চাহিদা মিটাইতে পারে, এসম্পর্কে আর কি কোন প্রমাণের দরকার আছে ?

অবিরাম কাটার হিসাব।

কাটুনী— সত্যব্রত যন্ত্র—তকলি

তারিখ— ১৬-৮-৩৫

প্রাতে… … বাম হাত

তার… …	সময় মিনিট কাটাই	…	নাটানো
১২৫ …	৩০	…	৮
১৪২ …	৩০	…	৮
১৩২ …	৩০	…	৭
১৩০ …	৩০	…	৭
১১৬ …	৩০	…	৬
৬৪৫	১৫০		৩৬

দুপুরে…… ডান হাত

তার… …	সময় মিনিট কাটাই	…	নাটানো
১৭৪ …	৩০	…	৮
১৫৬ ….	৩০	…	৮
১৫৩ …	৩০	…	৭
১৬৩ …	৩০	…	৮
৬৪৬	১২০		৩১

তারিখ— ১৭-৮-৩৫

প্রাতে…… বাম হাত তার… …	সময় মিনিট কাটাই	… নাটানো	দুপুরে…… ডান হাত তার… …	সময় মিনিট কাটাই	… নাটানো
১৪৮ …	৩১ …	৮	১৬০ …	৩০ …	৮
১২০ …	৩০ ….	১০	১২৫ …	২৩ …	৭
১২৬ …	৩০ …	৮	১৯৫ …	৪২ …	১০
১২৮ …	২৯ …	৮	৬০০	১২৫	৩৫
১২০ …	২৭ …	৭			
৬৪২	১৪৭	৪১			

তারিখ—১৮-৮-৩৫

প্রাতে…… বাম হাত তার… …	সময় মিনিট কাটাই	… নাটানো	দুপুরে…… ডান হাত তার… …	সময় মিনিট কাটাই	… নাটানো
১৩৮ …	৩০ …	৯			
১৪০ …	৩০ …	৮	৪৮০ …	৩৫ ৬০ }	২৪
১২৬ …	৩০ …	৮			
৫২ …	১৫ …	৫	১৬০ …	৩২	৯
১২৮ …	৩০ …	৯	৬৪০	১২৭	৩৩
৫৮ …	১৫ …	৪			
৬৪২	১৫০	৪৩			

তারিখ—১৯-৮-৪৫

প্রাতে…… বাম হাত তার	সময় মিনিট কাটাই	নাটানো	দুপুরে…… ডান হাত তার	সময় মিনিট কাটাই	নাটানো
২৪৮	৬০	১৬	১৬২	৩৫	১০
১৯৩	৪৫	১১	৪৬৮	৩০	
৬৯	১৫	৪		৩০	২৫
১০	৩০	৭		৩৫	
৬৪০	১৫০	৩৮	৬৩০	১৩০	৩৫

মোট তার—৫১২৫। কাটাই…১১২৯ মিনিট। নাটানো—২৯৮ মিঃ। ঘণ্টা পিছু কাটিবার গড় দ্রুতি ২৭২ তার। প্রতি মিনিটে নাটানোর গড় দ্রুতি—১৭ তার।

কাটুনী—নামদেব। যন্ত্র—তকলি।

তাং—১

প্রাতে…… বাম হাত তার	কাটাই ঘণ্টা	নাটানো মিনিট	ছেঁড়া	দুপুরে…… ডান হাত তার	কাটাই ঘণ্টা	নাটানো মিনিট	ছেঁড়া
১২৫	১/২	৮	৪ বার				
১২৫	১/২	৯	৬ বার	২৮৫	১	১৩	—
১১৮	১/২	৮	৫ ,,	৩০১	১	১৪	—
১২১	১/২	৮	—	১৯৫	১	৯	—
১১৯	১/২	৭	৪ ,,	৭১৮	৩	৩৬	
১২৪	১/২	৮	১ ,,				
৭৩২	৩	৪৮	২০ ,,				

তাং- ২

প্রাতে······ তার	কাটাই ঘণ্টা	ডান হাত নাটানো মিনিট	ছেঁড়া	দুপুরে······ তার	কাটাই ঘণ্টা	বাম হাত নাটানো মিনিট	ছেঁড়া
২৬৮	১	১৩	—	২৯৫	১	১৩	৫
২৮২	১	১৫	—	২৮৫	১	১৪	৭
৬০	$\frac{১}{৪}$	২	—	৩০৫	১	১৪	২
৬১১	$২\frac{১}{৪}$	৩০		২০০	$\frac{৩}{৪}$	১০	৪
				১০৮৫	$৩\frac{৩}{৪}$	৫১	১৮

তাং—৩

প্রাতে ··· তার	কাটাই ঘণ্টা	ডান হাত নাটানো মিঃ	ছেঁড়া	দুপুরে ··· তার	কাটাই ঘণ্টা	বাম হাত নাটানো মিঃ	ছেঁড়া
২৯৮	১	১৫	৮	২৭৫	১	১৪	৭
২৯০	১	১৪	৬	২৬২	১	১৩	৮
২৮৮	১	১৩	৪	১১৩	$\frac{১}{২}$	৬	৩
১৫৭	$\frac{১}{২}$	৮	৪				
				৬৫০	$২\frac{১}{২}$	৩৩	১৮
১০৩৩	$৩\frac{১}{২}$	৫০	২২				

তাং—৪

প্রাতে ··· তার	কাটাই ঘণ্টা	ডান হাত মাটানো মিঃ	ছেঁড়া	দুপুরে ··· তার	কাটাই ঘণ্টা	বাম হাত নাটানো মিঃ	ছেঁড়া
২৫৪	১	১২	৭	২৬৯	১	১৩	—
২৫৪	১	১৩	৪	২৮৭	১	১৩	—
				২৭৩	১	১৪	—
৫০৮	৮	২৫	১১	২৭৫	১	১৩	—
				১১০৪	৪	৫৩	×

মোট তার—৬৫০৪। কাটাই ঘণ্টা—২৪। নাটানো—৫ ঘণ্টা ২৬ মিঃ। কাটাইর গড় দ্রুতি প্রতি ঘণ্টায়—২৭১ তার। প্রতি মিনিটে—নাটানো ২০ তার।

এক নাগাড়ে কাটাইর হিসাব

স্থান—পরিশ্রমালয়, নালবাড়ী। যন্ত্র—তকলি।

কাটুনী—হায়দর।

সময়—প্রাতে ৭-১১ ; দুপুরে—১-৫টা।

নভেম্বর—১৯৩৭

তারিখ	ঘণ্টা	লাছি (১৬০ তার)
১	—	—
২	—	—
৩	—	—
৪	৮	৮
৫	৮	৭
৬	৮	৬৷৷
৭	৪	৪
৮	৮	৭৷৷
৯	৮	৭৷
১০	৮	৭৷৷
১১	—	—
১২	—	—
১৩	৪	৪৷৷
১৪	৪	৪৷৷
১৫	৮	৯
১৬	৮	৮
১৭	৮	৮
১৮	৮	৮
১৯	৮	৮
২০	৮	৭৷৷
২১	৪	৪৷৷
২২	৮	৮
২৩	৮	৮

ডিসেম্বর—১৯৩৭

তারিখ	ঘণ্টা	লাছি (১৬০ তার)
১	৭	৭
২	৮	৮
৩	৮	৭৷৷
৪	৬৷৷	৭৷৷
৫	৩৷৷	৪
৬	৮	৮
৭	৭	৪
৮	৭	৪
৯	৮	৯
১০	৮	৮
১১	৮	৯
১২	৩৷৷	৪
১৩	৭৸	৮৷
১৪	৮	৮৷৷
১৫	৭৷৷	৯
১৬	৭৷৷	৮৸
১৭	৮৷৷	৭৷৷
১৮	৭৷৷	৮
১৯	৪	৪
২০	৭৷৷	৮৷৷
২১	৮	৮
২২	৮	৬৷৷
২৩	৮	৭

তারিখ	ঘণ্টা	লাছি (১৬০ তার)	তারিখ	ঘণ্টা	লাছি (১৬০ তার)
২৪	৮	৭	২৪	৬	৭
২৫	৮	৮	২৫	৮	৮
২৬	৮	৯	২৬	৪	৫
২৭	৭	৭॥	২৭	৮	৯
২৮	৩	৫	২৮	৮	৬
২৯	৮	৮॥	২৯	৮	৬
৩০	৮	৮	৩০	—	—
মোট	——	——	৩১	—	—
	১৭৮	১৭৮৸		——	——
				২০৬৸	২০৫

ধুনাই, কাটাই ও নাটাই করা এই তিনটি কাজের এই হিসাব। সব কাজ সমেত প্রতি ঘণ্টায় একটি লাছি হয়। সুতার নম্বর প্রায় ১৫। (১ লাছি =১৬০ তার ; ১ তার=৪ফুট।)

উল্লিখিত তিনজন কাটুনীর বয়স ১৮ হইতে ২৪-এর মধ্যে।

নাল বাড়ী :—গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে চরকা প্রতিযোগিতার দিন তকলিতে ছয় ঘণ্টা সুতা কাটার প্রোগ্রাম হইয়াছিল। মোট ১৯ জন ছয় ঘণ্টা সুতা কাটে। ৪ জন পুরা সময় কাটে নাই। মোট সুতা ১৩৫ লাছি (১৬০ তার=১ লাছি) অর্থাৎ ২৮৮০০ গজ সুতা কাটা হয়। মোট সময় ১৩২ ঘণ্ট ২৭$\frac{১}{২}$ মিনিট সুতার মোট ওজন ১২৮ তোলা। সুতার নম্বর ১০$\frac{১}{২}$।

সত্যব্রতের দ্রুতি ছিল সব চেয়ে বেশী। সে ৬$\frac{৩}{৪}$ ঘণ্টায় ৬ নম্বরের ১০ লাছি ২ তার অর্থাৎ ২২৪২$\frac{২}{৩}$ গজ সুতা কাটে ৬$\frac{৩}{৪}$ ঘণ্টার মধ্যে ১ ঘণ্টা ৩২ মিনিট নাটাইতে লাগে। সব চাইতে বেশী ও সব চাইতে কম আধ ঘণ্টার দ্রুতি ছিল যথা ক্রমে ১৭১ ও ৪০ তার। আধ ঘণ্টার নাটানো সমেত কাটিবার গড় দ্রুতি ১প্র৩$\frac{১}{২}$ তার।

উপরোক্ত সুতায় ৮$\frac{১}{৪}$ × ২৭ ইঞ্চি কাপড় তৈরী হইয়াছে। খানিকটা সুতা মিহি হওয়ায় কাজে লাগানো হয় নাই।

আশ্রম বৃত্ত—৮-এর অঙ্ক

তা—১৫-১০-৩৪

কন্যাশ্রম ঃ—

গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে ৩টি চরকা ও ৩টি তকলি এক নাগাড়ে ২২ ঘণ্টা চালানো হয়। তকলিতে আধ আধ ঘণ্টা পরে কাটুনী বদল হয়। মোট ২২জন ৩৬ ঘণ্টায় ৭২০০ তার সুতা কাটে। আধ ঘণ্টার গড় দ্রুতি ছিল ১০০ তার।

বৎসলা দিদি ও অনুসূয়া দিদি নাটাই করা সমেত ৩ তকলিতে এক নাগাড়ে ১০ ঘণ্টা সুতা কাটে। অনুসূয়া দিদি ১০ ঘণ্টায় ১৬ নম্বরের ২২৪০ তার কাটে আর বৎসলা দিদি ৯ ঘণ্টা ১০ মিনিটে ১৩ নম্বরের ২০৫৫ তার কাটে।

আশ্রমবৃত্ত—৮-এর অঙ্ক

সোমবার-তাং ১৫-১০-৩৪

হিন্দু পঞ্জিকা মতে ১২-১০-৩৫ তারিখে গান্ধী জয়ন্তী দিবসে নালবাড়ীতে ৪ ঘণ্টা তকলি কাটাই হয়। উহার হিসাব নিম্নরূপ ঃ—

	ঘণ্টা	লাছি – তার	নম্বর
সত্যব্রত	৪	৫---৬৫	২০
ভাঁউ	৪	৬	১১
কুন্দন	৪	৫—১১৫	৯
সুরজ মল	৪	৩—৮০	১০
তাত্যা	৪	৩—২৬	১০

এই কাটাই সম্পর্কে বিনোবাজী লিখিতেছেন—"এই গান্ধী জয়ন্তীতে সত্যব্রত বাম হাতে সুতা কাটে—ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। নাটাইবার সময় ও এই হিসাবে ধরা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, একই তকলিতে আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত কাটিবার নিয়ম ও এখানে রক্ষিত হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি বলিতে পারি যে, দুই হাত ব্যবহার করিয়া নাটানো সমেত ২০ নম্বরের ১২ লাছি সুতা ৮ ঘণ্টায় কাটানো যাইতে পারিবে। এই ফলের দ্বারা তকলির যোগ্যতা ভালো ভাবেই জাহির হইতেছে।

আমি গত সন সারা বৎসর বাম হাতে তকলি কাটিয়াছি। আমার ডান ও বাম হাতের সর্বাধিক দ্রুতির মধ্যে মাত্র ৯ তারের পার্থক্য ছিল। এই অভ্যাসের অর্থ এই যে, উভয় হাতে মিলিয়া তকলিতে আট ঘণ্টা সম্ভব হইতে পারে।"

আশ্রম বৃত্ত ৩০-১০-৩৬

দশম অধ্যায়

তালিকা

সুতা কাটার কাজে লাগিতে পারে, এরূপ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ তালিকা দেওয়া হইতেছে। ক্লাসে ব্যবহারের জন্য, কাপাস, তুলা, বীজ ও পাঁজ ইত্যাদি মালপত্রের জন্য ; দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক কাটাইবার পৃথক-পৃথক ও অন্তর্ভুক্ত হিসাবের জন্য যথেষ্ট তালিকা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উহাতে পুস্তক বাড়িয়া যাইবে।

বর্গমূল—১ ইতে ৫০ পর্যন্ত।

সংখ্যা ···	বর্গমূল	সংখ্যা ···	বর্গমূল	সংখ্যা ···	বর্গমূল
১	··· ১·০০	১৭	··· ৪·১২	৩৪	··· ৫০·৮৩
২	··· ১·৪১	১৮	··· ৪·২৩	৩৫	··· ৫·৯২
৩	··· ১·৭৩	১৯	··· ৪ ৩৬	৩৮	··· ৬·০০
৪	··· ২·০০	২০	··· ৪·৪৭	৩৭	··· ৬·০৮
৫	··· ২·২৪	২১	··· ৪ ৫৭	৩৮	··· ৬ ১৬
৬	···· ২ ৪৪	২২	··· ৪·৬৬	৩৯	··· ৬·২৪
৭	··· ২·৬৪	২৩	·· ৪·৭৯	৪০	··· ৬·৩২
৮	··· ২·৮২	২৪	··· ৪·৯০	৪১	··· ৬·৪০
৯	··· ৩·০০	২৪	··· ৫·০০	৪২	··· ৬ ৪৮
১০	··· ৩ ১৬	২৬	··· ৫ ০৮	৪৩	··· ৬·৫৫
১১	··· ৩·৩১	২৭	··· ৫ ১৯	৪৪	··· ৬ ৩৬
১২	··· ৩·৪৬	২৮	··· ৫·২৮	৪৫	··· ৬·৭২
১৩	··· ৩·৬০	২৯	··· ৫·৩৮	৪৬	··· ৬·৭৮
১৪	··· ৩·৭৬	৩০	··· ৫ ৪৩	৪৭	··· ৬·৮৫
১৫	··· ৩·৮৫	৩১	··· ৫·৫৩	৪৮	··· ৬·৯২
১৬	··· ৪·০০	৩২	··· ৫·৬৪	৪৯	··· ৭·০০
		৩৩	··· ৫·৭৪	৫০	··· ৭·০৫

সুতার ব্যাস

এক ইঞ্চিতে কোন্ নম্বরের কতটা ধাগা বসে, ইহা দেখানোর তালিকা।
সূত্র — √ নম্বর × ২৭½ = সেই নম্বরের এক ইঞ্চিতে ধাগার সংখ্যা।

নম্বর	প্রতিইঞ্চিতে ধাগা	নম্বর	প্রতিইঞ্চিতে ধাগা	নম্বর	প্রতিইঞ্চিতে ধাগা	নম্বর	প্রতিইঞ্চিতে ধাগা
১	২৭½	২১	১২৬	৫৬	২০৬	৯৬	২৭০
২	৩৯	২২	১২৯½	৫৮	২১০	৯৮	২৭২½
৩	৪৭½	২৩	১৩২	৬০	২১৩	১০০	২৭৫½
৪	৫৫½	২৪	১৩৫	৬২	২১৬½	১০৫	২৮২
৫	৬২	২৫	১৩৮	৬৪	২২০½	১০০	২৮৯
৬	৬৭½	২৬	১৪০½	৬৬	২২৪	১১৫	২৯৫½
৭	৭৩	২৭	১৪৫½	৬৮	২২৭	১২০	৩০২
৮	৭৮	৩০	১৫১	৭০	২৩০½	১২৫	৩০৮
৯	৮২½	৩২	১৫৬	৭২	২৩৩	১৩০	৩১৪
১০	৮৭½	৩৪	১৬০½	৭৪	২৩৭	১৩৫	৩২০
১১	৯১	৩৬	১৬৫	৭৬	২৪০½	১৪০	৩২৬
১২	৯৫	৩৮	১৬৮	৭৮	২৪৩	১৪৫	৩৩১½
১৩	৯৯	৪০	১৭৪½	৮০	২৪৬	১৫০	৩৩৭
১৪	১০৩	৪২	১৭৮	৮২	২৪৯	১৬০	৩৪৯
১৫	১০৬½	৪৪	১৮৩	৮৪	২৫২	১৭০	৩৫৯
১৬	১১০	৪৬	১৮৭	৮৬	২৫৬½	১৮০	৩৬৯
১৭	১১৩	৪৮	১৯১	৮৮	২৫৮½	১৯০	৩৮০
১৮	১১৭	৫০	১৯৫	৯০	২৬১	২০০	৩৯০
১৯	১২০	৫২	১৯৮	৯২	২৬৪		
২০	১২৩½	৫৪	২০২	৯৪	২৬৭		

পাকের তালিকা

কোন নম্বরের সুতায় প্রতি ইঞ্চিতে কতটা পাক হওয়া উচিত, তাহার তালিকা।

(১) সূত্র— √নম্বর × ৩·৭৫ = সেই নম্বরের তানার সুতার প্রতি ইঞ্চিতে পাকের সংখ্যা।

(২) সূত্র— √নম্বর × ৩·৫০ = সেই নম্বরের প'ড়েনের সুতার প্রতি ইঞ্চিতে পাকের সংখ্যা।

	পাক			পাক			পাক	
নম্বর	তানা	প'ড়েন	নম্বর	তানা	প'ড়েন	নম্বর	তানা	প'ড়েন
১	৩·৭৫	৩ ৫০	২২	১৭·৫৮	১৬·৪২	৬০	২৯·০৪	২৭·১১
২	৫·৩০	৪ ৯০	২৪	১৮ ৩৭	১৭ ১৫	৬২	২৯ ৫২	২৭·৫৬
৩	৬·৪৯	৬·০৫	২৬	১৯ ১১	১৭·৮৪	৬৪	৩০ ০৯	২৮ ০০
৪	৭·৫০	৭·০০	১৮	১৯·৮৪	১৮ ৫২	৬৮	৩০ ৯০	২৮·৮৭
৫	৮ ৩৮	৭ ৮৪	৩০	২০·৫৪	১৯·১৮	৭২	৩১·৮০	২৯·৬৮
৬	৯·১৮	৮·৫৪	৩২	২১·২১	১৯·৮০	৭৬	৩২·৭০	৩০ ৫২
৭	৯·৯২	৯·২৬	৩৪	২১ ৮৬	২০ ৪০	৮০	৩৩ ৫১	৩১·৮২
৮	১০·৬০	৯·৯০	৩৬	২২·৫০	২১·০০	৮৪	৩৪ ৩৫	৩২·০৬
৯	১১·২৫	১০·৫০	৩৮	২৩·১১	২১·৫৪	৮৮	৩৫ ২৬	৩২ ৮৮
১০	১১·৮৫	১১ ০৬	৪০	২৩·৭১	২২ ৩৪	৯২	৩৫·৯৪	৩৩·৫৫
১১	১২·৪৩	১১ ৬০	৪২	২৪·৩০	২২·৬৮	৯৬	৩৬·৭৫	৩৪·৩০
১২	১২·৯৯	১২ ১৩	৪৪	২৪·৮৭	২৩ ২১	১০৩	৩৭·৫০	৩৫·০০
১৩	১৩ ৫২	১২ ৬২	৪৬	২৫·৪৩	২৩·৭৪			
১৪	১৪·০৩	১৩ ১০	৪৮	২৫·৯৮	২৪·০৫			
১৫	১৪ ৫২	১৩·৫৬	৫০	২০·৫১	২৪·৭৫			
১৬	১৫·০০	১৪ ০০	৫২	২৭ ০৪	২৫ ২৪			
১৭	১৫·৪৬	১৪·৪৩	৫৪	২৭ ৫৫	২৫ ৭৩			
১৮	১৫·৯০	১৪·৮৪	৫৬	১৮ ০৬	২৬ ২১			
১৯	১৬·৩৪	১৫·২৫	৫৮	২৮·৫৫	২৬·৬৫			
২০	১৬·৭৭	১৫·৬৫						

শক্তির তালিকা

সুতার শক্তি বাহির করিতে চরকা সঙ্ঘের নূতন পদ্ধতি মতে শতকরা একশত শক্তির জন্য দুই ফুট ঘেরের ৬ তারের (১২ ফুট বা ৪ গজের) একটি লাছির কত তোলা ওজন উঠানো প্রয়োজন, তাহার তালিকা।

সুতার নং	তোলা	সুতার নং	তোলা	সুতার নং	তোলা	সুতার নং	তোলা
১	২৯৩৪	২১	১৭৫	৫৫	৯১॥		
২	১৪৮২	২২	১৭১	৬০	৮৩		
৩	১০১১	২৩	১৬৫	৬৫	৭৬॥		
৪	৭৬৮	২৪	১৫৯	৭০	৭৩		
৫	৬২৪	২৫	১৫৪	৭৫	৬৮৸০		
৬	৪৮০	২৬	১৫০	৮০	৬৬		
৭	৪৫০	২৭	১৪৪	৮৫	৬০৸০		
৮	৩৯০	২৮	১৩৮	৯০	৫৮॥০		
৯	৩৫৪	২৯	১৩৫	৯৫	৫৫।০		
১০	৩২৪	৩০	১৩২	১০০	৫৪৸০		
১১	২৮৫	৩২	১২৮॥				
১২	২৬৪	৩৪	১২৫				
১৩	২৪৯	৩৬	১২১৸				
১৪	২৩৪	৩৮	১১৯				
১৫	২২৫	৪০	১১৬৸০				
১৬	২১৬	৪২	১১৩।০				
১৭	২০৪	৪৪	১০৬৸০				
১৮	১৯৫	৪৬	১০১॥০				
১৯	১৮৯	৪৮	৯৮॥০				
২০	১৮০	৫০	৯৬॥০				

বুনাইর তালিকা (১)

(বিশেষ ভাবে ধুতির জন্য)

আবশ্যক মত ও সারের জন্য কোন্ নম্বরের সুতা সাধারণত কত পুঞ্জমে বুনা যাইতে পারে, তাহার তালিকা।

ওসার	২৭ ইঞ্চি	৩৬ ইঞ্চি	৪৫ ইঞ্চি	৫০ ইঞ্চি	৫৪ ইঞ্চি
নম্বর	পুঞ্জম্	পুঞ্জম্	পুঞ্জম্	পুঞ্জম্	পুঞ্জম্
৮ হইতে ১০	৮	১০	১৩	১৪	১৫
১১—১২	৮½	১১	১৪	১৫	১৭
১৩—১৬	৯	১২	১৫	১৭	১৮
১৭—১৯	৯½	১৩	১৬	১৮	২০
২০—২৪	১০½	১৪	১৮	২০	২১
২৫—৩০	১১	১৫	১৯	২১	২২
৩১—৩৬	১২	১৬	২০	২২	২৪

কত সুতা লাগিবে ?

দশ গজ কাপড়ের জন্য পুঞ্জমের তিনগুণ ফেটি লাগে। দৃষ্টান্ত যথা—আপনার নিকট ১০ নম্বরের সুতা আছে আর ২৭ ইঞ্চি বহরের ১০ গজ কাপড় প্রয়োজন। তালিকা অনুযায়ী এই কাপড় ৮ পুঞ্জমে হইবে এবং ইহার জন্য পুঞ্জমের তিনগুণ অর্থাৎ ৮×৩=২৪ টি ফেটি লাগিবে। ইহার সূত্র :—

$\frac{(\text{পুঞ্জম} \times \text{গজ} \times ২) \times \text{পুঞ্জম}}{৭}$ = প্রয়োজনীয় সুতা ফেটিতে (এই সূত্রানুসারে উল্লিখিত প্রশ্নের সমাধান এইরূপ) :—

$\frac{(৮ \cdot ১০ \times ২) \times ৮}{৭} = \frac{১৬৮}{৭} = ২৪$ ফেটি

বুনাইর তালিকা (২)

জ্ঞাতব্য :—কাপড় বুনাইর জন্য প্রথমেই যাহা জানা প্রয়োজন, এই তালিকায় তাহাই অঙ্কে লিখিয়া দিবার চেষ্টা করা যাইয়াছে।

এই তালিকা দ্বারা এই বিষয়টি বুঝা সহজ হইবে যে, কোন এক নম্বরের সুতায় বিভিন্ন ওসারের ১০ গজ কাপড় তৈরি করিতে হইলে (১) উহার পোত তথা পুঞ্জম্ [পুঞ্জম = $\frac{\text{পোত} \times \text{ও সার}}{১২০}$] কতটা প্রয়োজন ; (২) উহাতে কত ফেটি সুতা লাগিবে বা (৩) উহার ওজন কত হওয়া উচিত।

ব্যাখ্যা :— (১) মাথার দিকে প্রথম আড়াআড়ি ঘরে কাপড়ের ওসার ইঞ্চিতে বলা হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় আড়াআড়ি ঘরে ১০ গজ কাপড়ের জন্য প্রয়োজনীয় সূতার ফেটির সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই সংখ্যাটি তৃতীয় আড়াআড়ি ঘরে বর্ণিত পুঞ্জমের সংখ্যার সর্বদাই তিন গুণ।

(৩) তৃতীয় আড়াআড়ি ঘরে পুঞ্জমের সংখ্যা দেখানো হইয়াছে।

(৪) চতুর্থ আড়াআড়ি ঘরে কাপড়ের পোত বর্ণিত হইয়াছে। পোতের অর্থ—কাপড়ের এক ইঞ্চিতে ধাগার সংখ্যা।

(৫) প্রথম খাড়া ঘরে ১ ফেটির (৬৪৮ তার=৮৬৪ গজ), ওজন তোলায় দেওয়া হইয়াছে।

(৬) দ্বিতীয় খাড়া ঘরে সেই সুতার নম্বর বলা হইয়াছে। উহারই এক ফেটির ওজন প্রথম খাড়া ঘরে দেওয়া হইয়াছে।

(৭) সব শেষের খাড়া ঘরে ১ সের সুতার মূল্য কত তাহাই বলা হইয়াছে।

(৮) ভিন্ন ভিন্ন নম্বরের সুতায় একই ওসার বা পোতের কাপড় বুনাইলে

১০ গজ কাপড়ে কত তোলা সুতা আবশ্যক হইবে, বাকী খাড়া ঘর গুলিতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এক ফেটির ওজনকে ১০ গজ কাপড়ের জন্য আবশ্যক ফেটির সংখ্যা দিয়া গুণ করিয়া এই ওজন বাহির করা হইয়াছে।

একই ওসার বা পোতে ভিন্ন ভিন্ন নম্বরের সুতা লাগাইয়া ঠাস বা জাল বুনটের কাপড় তৈরী করিয়া বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে। সাটিং-এর জন্য যতটা ঠাস বুনটের দরকার মনে করা যায়, শাড়ীর জন্য ততটা প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হয় না। শাড়ীর ওজনে হালকা হউক এবং উহার বুনট ঝর ঝরে থাকুক, ইহাই ঠিক মনে করা হয়। এই ব্যাপারটি একই ওসার ও পোতে ভিন্ন ভিন্ন নম্বরের সুতা ব্যবহার করিয়া সমাধা করা যাইতে পারে। ইহাতেও কায়দা-কানুন প্রয়োজন। সেই রীতি নীতির কথা মনে রাখিয়াই সংশ্লিষ্ট হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

(৯) নীচের শেষ আড়াআড়ি ঘরে ভাল সুতার ১০ গজ কাপড়ের জন্য আবশ্যক বুনাই-মজুরির কথা দেওয়া হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন রকমের কাপড়ের যে ওজন বলা হইয়াছে—তাহা কেবল হিসাব মাফিক অঙ্ক। পাড়ের ধাগা দোহর দিতে হইলে এবং কাপড় ধোয়ার পরে খাপিয়া যাওয়ার ভয় (বিশেষ করিয়া পাতলা কাপড়ে) থাকিলে, কোরা কাপড় সাধারণ অপেক্ষা একটু বেশী লম্বা করিয়া তৈরি করিতে হয়। এই সমস্ত কারণে প্রকৃত ও হিসাবী অঙ্কে কিছু পার্থক্য থাকে। কজেই সংশ্লিষ্ট তালিকায় বর্ণিত ওজন অপেক্ষা প্রতি থানে ১০ তোলা পর্য্যন্ত সুতা বেশী লাগিতে পারে।

১০ গজ কাপড়ের হিসাব ওসার—৫০″ ইঞ্চি।

ফেটির সংখ্যা		৪৫	৫১	৫৪	৫৭	৬০	৬৬	৭২	৭৮
পুঞ্জম		১৫	১৭	১৮	১৯	২০	২২	২৪	২৬
কাপড়ের পোড়		৩৬	৪০	৪৩	৪৫	৪৮	৫৩	৫৯	৬২
এক ফেটির ওজন তোলা	সুতার নম্বর	তোলা	তোলা	তোলা	তোলা	তোলা	তোলা	তোলা	তোলা
৪	১০	১৮০							
৩$\frac{১}{৩}$	১২	১৫০	১৭০						
২$\frac{৬}{৭}$	১৪		১৪৬	১৫৪					
২$\frac{১}{২}$	১৬		১২৭$\frac{১}{২}$	১৩৫	১৪২$\frac{১}{২}$				
২$\frac{২}{৯}$	১৮		১১৩	১২০	১২৭				
২	২০			১০৮	১১৪	১২০			
১$\frac{৯}{১১}$	২২			৯৮	১০৪	১১০			
১$\frac{২}{৩}$	২৪					১০০	১১০		
১$\frac{৩}{৭}$	২৮					৮৬	৯৫	১০৩	
১$\frac{১}{৪}$	৩২						৮২$\frac{১}{২}$	৯০	
১$\frac{১}{৯}$	৩৬							৮০	
১	৪০								৭৮
$\frac{৪}{৫}$	৫০								৬২$\frac{১}{২}$
বুনাইর দর ১০ গজ কাপড়		১০/০	১৷/০	১৷০	১৷০	১৷৶০	১৸৶০	২৶০	৩৲

তুলার মূল্যের সওয়া গুণ + কাটাই + ধুনাই = এক সের সুতার মূল্য।

১০ গজের হিসাব]

	ওসার ৪৫″								৪২″		
ফেঃ সং	৪০॥	৪৫	৪৮	৫১	৫৪	৫৭	৬০	৬৬	৩৯	৪২	৪৮
পুঞ্জম	১৩॥	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২২	১৩	১৪	১৬
কাঃপোত	৩৬	৪০	৪২	৪৫	৪৮	৫০	৫৩	৫৯	৩৬	৪০	৪৫
সুতার নং	তোলা	তোলা	তোলা	তোলা	তোলা	তোলা	তোলা	তোলা	তোলা	তোলা	তোলা
১০	১৬২								১৫৬		
১২		১৫০							১৩০	১৪০	
১৪		১২৮	১৩৭							১২০	
১৬		১১২½	১২০	১২৬½						১০৫	১২০
১৮		১০০	১০৭	১১৩						৯৪	১০৭
২০			৯৬	১০২	১০৮						৯৬
২২			৮৮	৯৩	৯৮	১০৪					৮৮
২৪					৯০	৯৫	১০০				
২৮					৭৭	৮২	৮৬				
৩২							৭৫	৯৪			
৩৬								৮২½			
৪০								৭৪			
৫০											
বুনাইর দর	১৲	১/০	১৶০	১।/০	১॥০	১॥৶০	১৸/০	২৶০	॥৶০	১৲	১৶০